মোহাম্মদ আবু জাফর
আহমদ কামাল
সাঈদ-উর রহমান
স্নেহভাজনেষু

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই

অন্বেষণ/দ্বিতীয় ভুবন/নিরাশ্রয় গৃহী (প্রবন্ধ)
কাব্যের স্বভাব/বুনোহাঁস/এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব (অনুবাদ)
তাকিয়ে দেখি (ব্যক্তিগত প্রবন্ধ)
Introducing Nazrul Islam
The Moral Imagination of Joseph Conrad

উদ্যানবিহারী অভদ্রতা

উদারনীতি ভদ্রলোকদের নীতি বটে, কিন্তু নীতি হিসাবে ভদ্র নয় মোটেই। যেমন উদ্যানবিহার ভদ্রলোকেরাই করেন বটে, ভদ্রভাবেই করেন, কিন্তু কাজটা আদৌ ভদ্র কাজ হয় না তেমন দেশে যেখানে ফল ও ফসল কোনটাই নেই প্রচুর, যেখানে অধিকাংশ মানুষ অরণ্যে থাকে অধিকাংশ সময়; প্রায়ই নিরন্ন থাকে, শুধু চীৎকার করে যন্ত্রণায়।

আমাদের ভদ্রলোকেরাই সাধারণত উদারনীতির কথা প্রচার করেন। তাঁরা বলেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চাই, চাই সহনশীলতা, চাই ব্যক্তির মর্যাদা। কিন্তু যে-সমাজে তাঁরা বাস করেন সেখানে না আছে গণতন্ত্র, না সহনশীলতা। সেখানে বেশীরভাগ মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে অল্প-কিছু লোকের ভদ্রতার আবরণ-আভরণ তৈরী হয়। উদ্যানচর্চা আপত্তিকর কিছু নয়, কিন্তু উদ্যান যদি গড়ে উঠতে চায় অত্যাবশ্যকীয় কৃষি-কার্যকে ব্যাহত করে, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির অপচয়-অপব্যয় ঘটিয়ে তবে সেই উদ্যানচর্চার বিরোধিতা অবশ্যই কর্তব্য।

ভদ্রলোকদের সামাজিক আচরণ, অস্তিত্ব ও বিকাশ সকল ক্ষেত্রেই একটা অভদ্রতা আছে প্রচণ্ড। "ভদ্রলোক কাকে বলে জানো?" মানিক বন্দোপাধ্যায়ের এক নায়িকা, যশোদা, বলছে, "চাষা-মজুরকে যারা ঘৃণা করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধ-পেটা খেয়ে দামী দামী জামাকাপড় পরে, আরাম চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান-অপমান বোধটা থাকে টনটনে, কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়—আর বলব?" আর বলেনি, কিন্তু যথেষ্ট বলেছে। মানিক নিজে প্রশ্ন করেছেন "ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামী, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ-মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্রজীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ?" (লেখকের কথা)। প্রশ্রয় কেন পায় তার কারণ সোজা, কেননা লেখকেরা সবাই ভদ্রলোক, ভদ্রলোকেরা ভদ্র-জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করে আঁকেন আত্মপ্রেমের কারণে। যশোদারা যদি লেখক হত, তবে ভিন্ন কথা বলত, যেমন বলেছে উপরে। এই

ভদ্রলোকদের ভিত্তিটা টাকা। মানিকেরই এক তরুণ নায়ক, পাকা, জেলে-বাগদী-চাষী-মাঝিদের সঙ্গে অকাতরে মিলে জেনেছে এই সত্যটি যে, "বিকৃত শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা-ভব্যতার ভারি বোঝা নামিয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রামের সুযোগ দিতে হলে ভদ্রত্ব বাবুত্ব ছাঁটলেই শুধু চলে না, পয়সাওয়ালত্বটাও ছাঁটতে হয়।" ঐটেই প্রধান, ঐ পয়সাওয়ালত্ব; পয়সা চলে গেলে ভদ্রতাও যায়, সঙ্গে সঙ্গে। •

ভদ্রতা অর্জনের পথটা কেমন তার স্মরণীয় বর্ণনা আছে রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা গল্পে'। "নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজ-রাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম-চালনা দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; আরো দুর্গমতর সম্মান পথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্তী রাজ-খেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাব-বর্জিত-লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে, নাশ নাই—চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।" এই ওঠা-পড়ার মধ্যেই বেড়ে-ওঠা, ভদ্রলোকদের। এক সাহেব চলে যান, অন্য সাহেব আসেন, কিন্তু মস্তকের অবিশ্রাম ওঠা-পড়ায় বিরতি ঘটে না।

এই ভদ্রলোকেরা শ্রমজীবী মানুষকে, যারা আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন, যারা ঠকায় না, শোষণ করে না অন্যকে—তাদেরকে বলে অভদ্র। কৃষককে বলে চাষা, তাঁতীকে জোলা। এবং শ্রমজীবীরা অকপটে মনের ভাব প্রকাশ করে দেখে ভদ্রলোকরা মুচকি হাসেন, প্রমাণ করেন ভদ্রতার আর-এক অর্থ মনের ভাব গোপন করা।

ভদ্র উপায়ে পয়সা তৈরী হয়নি এদেশে। তাই যত বেশী ভদ্রতা সেখানে সেখানে তত বেশী অভদ্রতা। হয় নিজে করেছে অভদ্রতা, নয়ত বাপ-দাদারা করে গেছেন। বিবেকের সঙ্গে সন্ধি করা, আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া, প্রতারণা করা লোকের সঙ্গে, নয়ত জুলুম করা সরাসরি—এই সকল পথকে ভদ্রলোকেরাও ভদ্র বলে স্বীকার করতে চাইবেন না, বিপদে পড়বেন অন্তত। কিন্তু এই সকল অভদ্র পথেই ভদ্রতা এসেছে আমাদের

সমাজে। অনেকদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, জমিদার বাবুদের সম্বন্ধে—"যতক্ষণ জমিদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিত রঙ্গিল সীসাপ্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী-কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্রসহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থি-চর্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম নির্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে....।" ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে—আজ থেকে নয়, শত শত বছর ধরে। আর প্রাণ-দিয়ে উৎপন্ন ফসলেই ভদ্রতা তৈরী হয়েছে, চর্চা হয়েছে উদ্যানের।

অস্তিত্ব ও বিকাশের এই অতিপ্রচণ্ড ও মূলগত অভদ্রতাটিকে অবগুণ্ঠিত, লুক্কায়িত রাখবার একটি চেষ্টা আছে উদারনীতিতে। সেই জন্যই উদারনীতি আরো বেশী নিন্দনীয়। আমাদের দেশে অনেককাল ধরে চলে আসছে চরমের স্বেচ্ছাচার। এখানে চরম দারিদ্র্য আছে, আছে চরম ধনবৈষম্য। চরম অজ্ঞতা আছে, আছে চরমতম উদাসীনতা, অসহিষ্ণুতা ও স্থবিরত্ব। এই চরমের দেশে উদারনীতি নরম কথা বলে, বলে সহনশীলতার কথা। ফলে চরম আরো চরম হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। সংশোধিত হয়ে আরো বিক্রমশালী হয়ে ওঠে জীবনের সকল প্রকার অন্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার বাবুদের কথা বলছিলেন। জমিদার বাবুরা সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে থাকতেন। যাঁরা জমিদার নন, এমনি বাবু, সাধারণ বাবু, তাঁরা অতদূর পারেন না, সাধ আছে, সাধ্য নেই, সেই জন্য তাঁরা উদ্যানে আসেন, পুত্র-কন্যার হাত ধরে বিহার করেন উদ্যানে। এই সাধারণ বাঙালী বাবুদের বর্ণনাও বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গেছেন, এমন ভাষায় দিয়েছেন যা ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব কর্ম। তিনি বলেছেন, এই বাবুরা অতিশয় পলায়নদক্ষ, অত্যন্ত বিলাসী এবং সম্পূর্ণ লক্ষ্যবিহীন। এই দাসানুদাস, বাক্-সর্বস্ব, ক্লীব, শক্তিবিহীন বাবুদের পেশা ভিন্ন ভিন্ন—কেউ কেরানী, কেউ মাস্টার, কেউবা ডাক্তার, উকিল অথবা হাকিম, কেউ নিষ্কর্মা—কিন্তু সকলেই, সর্বক্ষেত্রে, নিপীড়নকারী। যে যেখানে সুযোগ পায়, বাগে পায় মানুষকে, সেখানেই নিপীড়ন করে চরমরূপে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও অবশ্যি বাবু না-হোক ভদ্রলোকই ছিলেন একজন। সাম্যবাদের কথা বাঙলা ভাষায় অত্যন্ত সুন্দর করে লিখেছিলেন তিনি 'সাম্য' নামক রচনায়; কিন্তু পরে নিজেই বলেছেন, ভুল কথা লিখে-ছিলেন তিনি ঐ রচনায়, প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি সাম্যবাদ। তিনি চলে গেছেন ধর্মে; এবং ভক্তিতে। এটাই স্বাভাবিক ভদ্রলোকদের পক্ষে।

তবু বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকবিদ্বেষী ছিলেন না পুরোপুরি। পরাণ মণ্ডল ও হাসিম শেখের প্রতি তার মমতা ছিল অকৃপণ। কিন্তু অতিবড় মানবদরদী যে শরৎচন্দ্র তাঁর অতিমানুষ সব্যসাচীকে দেখি সরাসরি অবজ্ঞা করছেন চাষীকে। চাষীকে চাষা বলেই দেখছেন এই বিপ্লবী, তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে বলছেন, "চাষারা রাজা হোক, তাদের ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আশা করিনে।" দেশকে তিনি স্বাধীন করবেন, কিন্তু সাহায্য নেবেন না দেশের বেশীর ভাগ মানুষের, তাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করবেন না, নির্ভর করবেন নিজের ঐন্দ্র-জালিক ক্ষমতার উপর। আপাতদৃষ্টিতে সব্যসাচী বাবু নন কোন বিচারেই, বাবুর ক্লীবত্বের ও দাসত্বের বিরুদ্ধে উগ্র ও প্রচণ্ড একটি প্রতিবাদ তিনি। কিন্তু বাবুর চাইতেও এক কাঠি উপরে তিনি, তিনি বড়বাবু একজন। তিনিও যে বাক্‌সর্বস্ব এবং ভক্তিতে বিশ্বাসী এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করা যায়, বলা যায় তিনিও সামন্তবাদী, মানসিকতার দিক থেকে—বাঙালী বাবুদের মতই! কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই যে, বাবুরা যেমন দূরে থাকেন কৃষকদের কাছ থেকে, শুধু দূরে থাকেন না, থাকেন উদাসীন, সব্যসাচীও তেমনি দূরবর্তী, তেমনি উদাসীন। বরং তিনি এগিয়ে গেছেন আরো একধাপ। তিনি একজন বড় জাতীয়তাবাদী, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য পণ করেছেন মন ও প্রাণ, কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা কি, কাদের নিয়ে গঠিত তাঁর এই জাতি? তিনি নিজেই বলছেন, 'এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাংলাদেশে আর নেই।' অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের পরাণ মণ্ডল ও হাসিম শেখকে নিয়ে নয়, তার জাতি বাবু অপূর্বকুমার এম. এস. সি. ও শ্রীমতি মেরী ভারতী যোসেফকে নিয়েই। তাঁর জাতীয়তা সর্বভারতীয় নয়, সর্ব বাঙালীও নয়, সর্বভদ্রলোকীয়। যে-কোন খাঁটি বাবুকে জিজ্ঞেস করুন, একই কথা বলবেন, সব্যসাচীর মুখের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঘৃণ্য বাবু ইংরেজকে ভালোবাসে, শরৎচন্দ্রের নমস্য সব্যসাচী ইংরেজকে ঘৃণা করেন, কিন্তু ভয় করেন না। সব্যসাচী ভয় করেন যদি কাউকে তবে ঐ কৃষককে। সেই জন্যই তিনি কৃষকের সাহায্য নেবেন না। পাছে তাঁর আন্দোলন কৃষকের আন্দোলনে পরিণত হয় শেষ পর্যন্ত, পাছে তাঁর নেতৃত্ব অবিচলিত না থাকে চূড়ান্ত সংগ্রামে। স্পষ্ট করেই বলেছেন সব্যসাচী, তিনি ইংরেজ বিতাড়ন চান, কিন্তু চান না সামাজিক বিপ্লব। অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন তিনি, "বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্বনাশ নিয়ে আসছে তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্য? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল—স্নেহের বাঁধন শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্য জানো? তোমাদের দু-দশজনের দোষে—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে।" অর্থাৎ বাবুর বিরুদ্ধে বাবুর অভিযানে।

ভালোবাসার বিপরীত ঘৃণা নয়, বিপরীত উদাসীনতা। বাঙালী বাবু ইংরেজকে ভালোবাসে, সব্যসাচী করেন ঘৃণা, কিন্তু তাঁরা কেউই উদাসীন নয় ইংরেজ সম্পর্কে, ইংরেজ তাঁদের চিন্তার মধ্যমণি, তাঁরা উদাসীন কৃষক সম্পর্কে। সব্যসাচীকে বড়বাবু বলেছি আমরা, তাঁর বড়বাবুত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় অপূর্বকুমারের সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে। চলনে-বলনে অপূর্ব একজন খাঁটি বাঙালী বাবু, সে সংস্কারাচ্ছন্ন, আপনভাবে বিব্রত, সে কেরানী ও সামান্য, কিন্তু এমন কি অপূর্বও কৃষকের কথা ভাবে—অপূর্ব গ্রামে যাবে কাজ করবে কৃষকদের জন্য। সব্যসাচী বড়বাবু, তিনি গ্রামে যাবেন না, তিনি লড়াই করবেন ইংরেজের সঙ্গে। ইংরেজকে তিনি ডরান না, ডরান আসলে কৃষককে।

অবশ্য একথাও সত্য যে, অপূর্বদের কর্মে কৃষকদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন আসবে না। প্রথমত, অপূর্বরা ভালোবাসে না কৃষককে, করুণা করে কিছুটা। কৃষকের কাছে তারা যায় ভদ্রলোক হিসাবে, কৃষকদের একজন হিসাবে নয়। দ্বিতীয়ত, ইংরেজকে শাসক ও শোষক হিসাবে রেখে কৃষকের ভাগ্যে বড় রকমের উন্নতি আনয়ন করা সম্ভব নয়। সব্যসাচীর কর্ম খণ্ডিত, তিনি শুধু শাসকেরই বদল চান, অপূর্বদের কর্মও খণ্ডিত হতে বাধ্য, তারা শুধুই সমাজের অভ্যন্তরে তাকায়, বাইরের যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করছে সমাজকে, তাকে অতিশয় অল্প গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সব্যসাচী কেন শাসকদের বদল চান সেটাই প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা আমাদের।

সব্যসাচীরা শাসকদের বদল চান নিজেরাই শাসক হতে চান বলে, নিজেদের ভদ্রলোকত্বকে পাকা করবেন এমনটা কামনা করেন বলে। এই দিক থেকে সব্যসাচীরা বাবু ভিন্ন অন্য কিছু নন। বাবুদের মত তাঁর দৃষ্টিও বাইরের দিকে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে হয় ইংরেজের দিকেই।

তাছাড়া এমন দেখা গেছে যে উদারনীতিই হচ্ছে সূতিকাগৃহ চরমপন্থার। উদারনীতির কোমলতাই জন্ম দেয় বিপরীত উগ্রতার। বাবুরা আছে বলেই সব্যসাচীদের উদ্ভব হয়—প্রতিবাদ হিসাবে। একই পরিবারের সদস্য এরা, ভাই ভাই : এক ভাই সংশোধন, সহনশীলতা, বিবর্তন ইত্যাদির কথা বলে; অন্য ভাই এই সব নরম নীতিতে কাজ হচ্ছে না বলে ক্ষিপ্ত, প্রায় উন্মত্ত হয়ে এর সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরে। কিন্তু উভয়েই থাকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আস্থা রাখে না জনসাধারণে, সন্দেহ করে, ভয়ও করে ভেতরে ভেতরে। উদারনীতি উগ্রপন্থাকে অনিবার্য করে তোলে, কেননা মানুষের মনের মধ্যে যে আবেগ আছে, যে তীব্র কামনা আছে পরিবর্তনের, সেই আবেগ বা কামনা কোনটাকেই তৃপ্ত করতে পারে না উদারনীতি। তাই সহনশীলতায় অস্থির হয়ে মানুষ ছুটে যায় তাদের কাছে যারা চীৎকার করতে পারে উগ্র কণ্ঠে, নয়ত যারা অস্ত্র তুলে নিতে পারে হাতে। ভদ্রলোকেরা অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে গান করেন যেহেতু, সেই জন্য দেখা যায় সাধারণ লোকেরা জোরে-শোরে মাইক্রোফোন বাজায়, উঁচুগলা হিন্দি-উর্দু গান শোনে রেকর্ডে ও বেতারে। উদারনীতি এমন কি উদারনীতিরও শত্রু।

উদারনীতি ক্ষতিকর যেমন, তেমনি আবার অচলও বটে। একজন প্রবীণ কবি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নবীন এক কবি বলেছেন প্রশংসাচ্ছলে, যে ঐ কবি, প্রবীণ কবি, বাগান গড়েছিলেন একটি—বাক্যের। শুধু ঐ কবি বা তাঁর গুণমুগ্ধ কবি বলে নয় ভদ্রলোক যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই বাগানে বাস করেন—বাক্যের, অথবা বলা যায়, শব্দের। সহনশীলতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উদারনীতির এই সকল মুখ্য স্তম্ভ শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু নয়, আমাদের দেশে। এরা দেশী শব্দও নয় বিদেশী শব্দ, বিদেশী শব্দের বাঙলা অনুবাদ মাত্র। যে দেশ উন্নত উৎপাদনের দিক থেকে, যেখানে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে কল্যাণ রাষ্ট্রের, কিছুটা ঐতিহ্য আছে আইনের শাসনের ও ন্যায় বিচারের—স্তম্ভগুলো সেখানেই টিকতে পারে। আমাদের দেশে সহ্য করার কোন অভ্যাস নেই। আবহাওয়ার কথা বাদ

দিলাম, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটা আবহাওয়ার চেয়ে কম বড় সত্য নয়; এবং তার চেয়েও বড় সত্য সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা। শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য ইত্যাকার বিষয়ের উপর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্ভর করতে হয়, সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাতেও এসব বিষয় বাসস্থান খুঁজে পায় খুব প্রশস্ত ও নির্ভরযোগ্য। প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে না যতদিন না মানুষে-মানুষে বৈষম্যটা খাটো হয়ে আসে। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা; অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দূরের ব্যাপার, মানুষের জীবনের জৈবিক নিরাপত্তাও নেই এদেশে। এদেশে ব্যক্তি নেই আছে প্রভু ও ভৃত্য। সেইজন্য গণতন্ত্রের মূল কথা যেটা, সকলের অংশ-গ্রহণ, সেটা জীবনে সম্ভব হবে না, মনেও নয়। কুটিরবাসীর মানসিকতা নিয়ে গণতন্ত্র গড়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাসী মানুষ, সে সন্দেহকে জানে কিন্তু সংশয়কে জানতে চায় না। সংশয় নেই বলেই এদেশে বিজ্ঞান আসতে পারেনি, বাধা পেয়েছে প্রবল।

উদারনীতির আপসপন্থার দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। উদারনীতিক নিজে ঘুষ খান না বটে, কিন্তু অন্যের ঘুষ-খাওয়া বন্ধ করতে পারেন না। বলেন, ব্যক্তিগত সততা তো অক্ষুণ্ন রইল। কিন্তু উদারনীতিকের নিজের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান যে একটা অন্যায়-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা খেয়াল করেন না। এবং অন্যায়কে তিনি আক্রমণ করেন শুধু নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই, করতে চান না সামাজিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তদুপরি ব্যক্তিগতভাবে, নৈতিক বিচারে, যাকে অন্যায় বলে মনে করেন তাকেও পরিত্যাগ করতে পারেন না। যেমন, ধরা যাক, কবি উইলিয়াম কুপারের না-পারার কথা। তিনি ভদ্রলোক ছিলেন, তাই ইংরেজ যে ভারতবর্ষে এসে অত্যাচার করছে সেটা অপছন্দ করতেন। তুমি ইংরেজ, স্বাধীনতার দুগ্ধে পুষ্ট, তুমি মুঘলদের স্বৈরাচারের অবসান ঘটালে ভারতবর্ষে গিয়ে, তারপর আবার, তুমিই কিনা স্থান দখল করলে অত্যাচারী মুঘলের? এই রকম ভাষায় নিন্দা করেছেন ভারতবর্ষে অন্যায়-আচরণকারী ইংরেজের। কিন্তু তিনি বর্জন করতে পারেননি ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ, যে হেস্টিংস ঐ অন্যায়ের নায়ক ছিলেন একজন। হেস্টিংস বীরই রয়ে গেছেন কুপারের কাছে। বলা যায় এ হচ্ছে স্ববিরোধিতা, যার আরেক নাম আপসপন্থা।

আপসপন্থীরা সহ-অবস্থান চান। কিন্তু ঝড় ও ভঙ্গুর-বৃক্ষ সহ-অবস্থান করবে কি করে? কনফুসিয়াস বলেছেন, ধনী লোকেরা হচ্ছেন বাতাস এবং সাধারণ মানুষ ঘাস, বাতাস বইলে ঘাসকে নুইয়ে পড়তে হবেই। আপসপন্থীরা সেটাই চান, ঘাস চিরকাল ঘাস থাকুক, নুইয়ে নুইয়ে পড়ুক বাতাসের সামনে।

"পাপকে বিগলিত করতে হবে," তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমার সাহিত্য জীবন' (২য় পর্ব) বইতে। "Elimination নয়, Sublimation। আড়াই হাজার বছর ধরে এই সাধনা চলছে ভারতবর্ষে। বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মাজী জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন ভারতের এই সাধনার অব্যাহত প্রবহমানতা।" নাকি প্রমাণ করে গেলেন এই সাধনার অব্যর্থ ব্যর্থতা? পাপ যে অনেকাংশেই সামাজিক এই সত্যকে মান্য করেন না তারাশঙ্করেরা, ধরে নেন পাপ-পুণ্যের বোধ সম্পূর্ণত ব্যক্তিগত। সেইজন্য হাজার হাজার বছরের সাধনাতেও পাপ মোটেই বিগলিত বা বিচলিত হয় না। তারাশঙ্করের আশাবাদও ভদ্রস্বভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই বইতেই উল্লেখ আছে একদিন গভীর রাতে তাঁর মেয়ের জীবন সংশয় দেখা দিয়েছিল, ঘরে পয়সা ছিল না বললেই চলে। সেই সময়ে প্রতিবেশী এসেছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, সাহায্য করতে। তারাশঙ্কর লিখছেন, "কিন্তু সংসারে মন্দের থেকে ভালই বেশি; মহাপ্রকৃতি নিজেই বোধ করি অসৎ থেকে সতের দিকে চলেছেন, সারা সৃষ্টি জুড়ে চলেছে সেই সাধনা, এই পৃথিবীতে মহাসৃষ্টির এক কণার তুল্য এই গ্রহে মানুষের মধ্যে সেই সাধনার রূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তাই আর্তের কণ্ঠস্বর শুনলে গৃহদ্বার আপনি খুলে যায়, করুণায় বিগলিত মানুষ অযাচিত সেবা এবং সাহায্য নিয়ে ছুটে আসে।" এই মন্তব্যে শুধু অতিশয়োক্তিই নেই, মস্ত বড় ভ্রান্তি আছে। নিষ্পাপ বালিকা যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছিল সেটাই বড় সত্য। যেখানে ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত এমন নিঃসহায় যে সন্তানের চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন না সেই সমাজে ইতরজনের অবস্থা কল্পনা করলে আশাবাদের মঞ্চ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। আর ঐযে প্রতিবেশী এসেছেন তিনিও ভদ্রলোকের বিপদ দেখেই এসেছেন, পথের ভিখিরীদের এমন বিপদ অহরহ ঘটছে, সেখানে কেউ যান না ছুটে অযাচিত সেবা এবং সাহায্য নিয়ে। তাদের আর্তকণ্ঠস্বর পেঁৗছায় না ভদ্রলোকদের কানে। এই ধরনের ভ্রান্ত সাধারণীকরণই নিয়ম, এরই সদম্ভ প্রচার অবিরাম চলছে।

তারাশঙ্করকে শিল্পী যামিনী রায়, বলেছিলেন, "ভায়া বিয়োগান্ত রচনা আর করবেন না। সংসারে দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। সে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন নিংড়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে আনন্দের কথা বলুন, আশার কথা বলুন। তারপরই হেসে বলতেন, দোহাই, তা বলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ, করো মন রক্তারক্তি, কুড়ুল হাতে জাগো পরশুরাম এসব বলতে বলছি না।" তারাশঙ্করের রচনাবলী সাক্ষী, এই মনোভাব তারাশঙ্করেরও। সমাজ-পরিবর্তন চাইব না, অথচ আশাবাদ চাইব। কিন্তু এ আশার ভিত্তি কি? ভিত্তি কি তা আগের উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে—ভিত্তি বায়বীয়। প্রতিবেশী যদি দরজা খুলে প্রতিবেশীর খোঁজ নেয় মনে করব দেবতা এসেছেন মানুষের ছদ্মবেশে, রূপকথায় যেমন আসে।

উদারনীতির একটি বড় দুর্বলতা তার নিজস্ব কোন সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। সে আপস করে, নম্র স্বরে সমালোচনা করে। কিন্তু একটা স্থির মানদণ্ড তুলে ধরে না। সেই জন্যে প্রবল ভালোবাসা বা প্রচণ্ড ঘৃণা কোনটাই আসে না। বাঙলা ভাষায় যে বড় ইউটোপিয়া বা ব্যঙ্গ রচনা কোনটাই নেই তার কারণ মানদণ্ডের বিষয়ে অনুৎসাহ। দিনে দিনে নিস্পৃহতাই শুধু জমে উঠেছে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে।

উদ্যানবাস এই মনোভাবকে বিশেষভাবে পুষ্ট করে। বার্নিয়ার তাঁর মুঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ-কাহিনীতে বলেছেন পৃথিবীর সব দেশের খাদ্যাভ্যাস বহুমুখী, কিন্তু বাঙালীর নয়, বাঙালী নানা প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে না, শুধু ভাত খায় আর মাছ। এই বৈচিত্র্যহীনতা সন্তুষ্টচিত্ত উদ্যানবাসীর পক্ষেই সম্ভবপর। বাগানের বাইরে যে জগৎ আছে উদ্যানবাসী সে-খবর রাখতে চায় না; পার্শ্ববর্তী অরণ্যকেও ভয় করে, সেই জন্য অবজ্ঞা। অরণ্য উদ্যানবিলাসীর চেতনায় আবাসস্থান খুঁজে পায় না, তাই দেখা যায় বাঙলা সাহিত্যে অশুভের চিত্র নেই তেমন। অথচ সমাজে অরণ্য আছে, আছে অমঙ্গল ও অশুভ এবং অরণ্যনিহিত সম্পদ ও সম্ভাবনা—যাদের সন্ধান না-করায় জীবনের দারিদ্র্য ঘোচেনি। উদ্যানে আগ্রহ স্বর্গের যে-স্বপ্ন আমরা আজন্ম দেখি তার হাতে লালিত, কিন্তু উদ্যান স্বর্গ নয় আদৌ, স্বর্গ যদি হয় তবে সে মূর্খের। ময়নামতিতে যে-প্রাচীন তাম্রলিপিসমূহ পাওয়া গেছে তার একটিতে লিপিবদ্ধ আছে রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কথা, বলা হয়েছে তিনি ছিলেন "সমগ্র পৃথিবীর নেতা"। পৃথিবী ছিল সমতটের সমান বড়, সেই পৃথিবীতে রাজা নিজেই ছিলেন নিজের মানদণ্ড। উচ্চতর

কোন মানদণ্ড যখন আনা হয়, স্থাপন করা হয় এর পাশে, তখন রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উচ্চতা কমে আসে, আর তিনি নেতা থাকেন না. সমগ্র পৃথিবীর।

উদারনীতির নিজের মধ্যেই নিহিত আছে রক্ষণশীলতা। উদারনীতি পরিবর্তন-ভীরু। এই নীতির একজন প্রকৃষ্ট সেবক ছিলেন এডমণ্ড বার্ক। তিনি সামান্য লোক ছিলেন না। রক্ষণশীল ছিলেন বলা যাবে না তাঁকে। আমেরিকানদের ও ভারতবাসীদের পক্ষে তিনি বলেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে, কিন্তু যখন বিপ্লব শুরু হয়েছিল ফরাসী দেশে তখন সেই বিপ্লবের নৈকট্য দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন খুব, বিপ্লবের বিপক্ষে বলেছিলেন সেই একই বার্ক যাঁকে মনে হয়েছিল নিপীড়িতের নির্ভীক সমর্থক। উদারনীতির নিয়ম এই, সে দয়া, দান, দক্ষিণা, সংশোধন—সবকিছুই সমর্থন করতে পারে, সমর্থন করতে পারে না বিপ্লবকে। বিপ্লবকে সে বরং চায় ঠেকিয়ে রাখতে। এডমণ্ড বার্ক উপনিবেশবাদীই ছিলেন, আমেরিকানদের সঙ্গে সমঝোতা চেয়েছিলেন আমেরিকাকে উপনিবেশ হিসেবে রাখার জন্যই, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ধ্বংস করবার জন্য নয়। বাংলাদেশে আমরা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই—এ দাবি যদি সত্য হয় তবে উদারনীতির বাগানে কাজ হবে না, শক্তি যেটুকু আছে তাকে উদ্যানচর্চায় ক্ষয় করলে অমঙ্গলই হবে শেষ পর্যন্ত। আজ প্রয়োজন উদার আয়োজনের ফলের ও ফসলের, শিল্পের ও কৃষির। প্রয়োজন প্রদর্শনীর নয়, সৃষ্টির।

এই উদ্যান নকল উদ্যান। এর সমুদয় ফুল বিদেশ থেকে এসেছে। শীতের দেশ থেকে। এদেশের মাটিতে তার চাষ হবে না, চাষ করতে গেলে অপব্যয় ঘটবে বড় রকমের। এমনকি উদারনীতিকে যথার্থ রূপে বুঝবার পথেও অন্তরায় আছে বড় রকমের। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট লেখক ই. এম. ফস্টার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন, পরাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ছিল ফস্টারের। অন্য এক উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, বৈশ্যসভ্যতার এক অতিদুর্বল জায়গায় নির্মম আঙুল প্রবেশ করিয়েছেন ফস্টার। ফস্টার উদারনীতিক ছিলেন একজন, তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে গুণের সন্ধান পেয়েছিলেন বটে কিছু কিছু, কিন্তু 'গভীর শ্রদ্ধা' তাঁর ছিল না আদপেই। বৈশ্যসভ্যতার সমালোচনাও তিনি করেছেন ঠিকই, কিন্তু নির্মমতা তাঁর অঙ্গুলিতে ছিল না, থাকতে পারে না, শুধু তাঁর নয়, কোন উদারনীতিকেরই অঙ্গুলিতেই নয়। গভীর শ্রদ্ধা ও নির্মম

নিষ্ঠুরতা আমাদের ব্যাপার, আমাদের, তথাকথিত অনুদার সমাজের।— এই উদাহরণ থেকে একটি সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। সেটি এই যে, আমাদের মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে উদারনীতিকে উদারনীতি হিসাবে চেনা সম্ভব নয়, উদারনীতিও অনেক সময় এখানে চরমপন্থা হিসাবেই আসে, বাধ্য হয় আসতে, সে ভাবে না এলে তার স্থান হয় না—যতই না উদারনীতিক হই না কেন আমরা।

বাগান তাই ক্ষতিকরই শুধু নয়, অচলও বটে। এই উদ্যানবিহার আমাদের জন্য নয়।

ধ্বনিই শুধু, এবং প্রতিধ্বনি

প্রতিষ্ঠিত কবি একজন অধিকতর প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাব বিস্তারকারী আরেক জন কবির কথা লিখেছেন সম্প্রতি সশ্রদ্ধচিত্তে। তিনি বলেছেন, আমরা যারা প্রেমে পড়েছিলাম অল্প-বয়সে 'শব্দ, শব্দ, শব্দের' তারা পাগল ছিলাম ঐ কবিকে নিয়ে। ঐ 'শব্দ শব্দ শব্দ, ইংরেজীর অনুবাদ, ইংরেজী নাটক থেকে উদ্ধৃতি। সেই নাটকে শব্দের' কথা বলা হয়েছে ঠাট্টা করে, বক্তা শব্দপ্রেমিক সেজেছিলেন বলা যায় ব্যঙ্গ করবার জন্য। কিন্তু আমাদের কবিদের শব্দ-প্রেমে, বলাই বাহুল্য, প্রহসন নেই, ঠাট্টা করে কেউ বলেন না। এখানে যে তিনি পাগল হয়েছেন 'শব্দ, শব্দ ও শব্দ' নিয়ে। তিনি শব্দ-প্রেমিক যখন বলেন নিজেকে তখন প্রাণস্পর্শী আন্তরিকতা ও প্রবল সততা নিয়েই বলেন সে কথা।

সকলেই অবশ্যি কবি নন, কেউ কেউ কবি। কিন্তু সকলেই ভাষা-প্রেমিক আমরা বাঙালীরা--মোটামুটি হিসাবে। হয়ত বলা যায় কবিও সবাই আমরা, নীরব-কবি হয়ত, স্বভাব-কবি নিশ্চয়ই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাব্যই হচ্ছে প্রধান বিষয়। স্থাপত্য ও চিত্রে আমাদের অবদান সামান্য, সেটা স্বাভাবিক কারণে। কেননা পলিমাটির দেশে এমন নির্মাণ সামগ্রী পাওয়া দুষ্কর যা টিকবে অনেক কাল ধরে। টেকে না, টেকানো যায় না। কিন্তু শব্দরা টিকে থাকে, লোকের মুখে মুখে, জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতিতে। ধ্বনিকেই সেই জন্য অবলম্বন করতে হয় সৌন্দর্যবোধ ও হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশিত করবার জন্য। এবং ধ্বনিকে নিয়েই সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যে গদ্যের তুলনায় কাব্য অনেক বেশী প্রাচীন। গদ্য অর্বাচীন বাংলাদেশে, সেই অল্প-বয়সের গদ্যের প্রকাশ শক্তির মধ্যে কাব্য থাকা স্বাভাবিক এবং তা' আছেও। অন্যদিকে কাব্যে যেহেতু ধ্বনির স্থান গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য কাব্য বিকশিত হয়েছে গদ্যের তুলনায় অনেক বেশী। কাব্য-প্রেম সর্বত্র বিস্তৃত। কবিরাই প্রেমিক হন বেশী এবং তাঁরা প্রেমিক সাধারণত ঐ 'শব্দ, শব্দ এবং শব্দের'। মন্ত্রের শক্তিতে আমরা সকলেই কম-বেশী পরিমাণ আস্থা রাখি, রাখতে বাধ্য হই। আত্মশক্তিতে আস্থা

স্বপ্ন বলে। কবিরা শব্দকে ব্রহ্ম জ্ঞান করেন এবং সমালোচনা যাঁরা লেখেন পত্র ও পত্রিকায় তাঁরাও কাব্যপ্রেমিক। কবিতা লিখে বাংলাদেশে যত সহজে ও যত দ্রুত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে তেমনটা ঘটে না অন্য কোন ক্ষেত্রে, অন্য কোন ব্যবসায়ে তো নয়ই, এমনকি সাহিত্যের অন্য কোন শাখাতেও নয়। অত্যন্ত তরুণ যে কবি তাঁর কাব্য, এমনকি উপমা নিয়েও, মস্ত মস্ত প্রবন্ধ দেখা যায় সংবাদপত্রে, অত্যন্ত প্রবীণ যে গদ্য লেখক তাঁর ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধের কথা স্মরণ করতে হলে স্মৃতি হাতড়ানো আবশ্যক হয় অনেকক্ষণ ধরে। আরো এক ঘটনা এই যে, কাব্য-সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই শব্দ গোণায় পর্যবসিত হয়--প্রবীণ সমালোচকেরা ছন্দের হিসাব করেন নিবিষ্ট চিত্তে, নবীন সমালোচক কোন বিশেষ্য বা বিশেষণ কতবার কোন কবি ব্যবহার করেন তার তালিকাটা তৈরী করেন আদর্শ নিষ্ঠায়। এবং আমরা বলি সাধু, অবশ্যই অবশ্যই, কবিতা তো ধ্বনির ব্যাপার, শব্দেই তো সে শুধু।

উদাহরণ দেয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধ্বনি-ব্যবহার স্মরণীয়, কিন্তু তাই থেকে যদি কোন সমালোচক সিদ্ধান্ত করেন, যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধ্বনিই আছে অন্যসব কিছুকে ছাপিয়ে তবে সেই মালার্মে-ধর্মী সিদ্ধান্তে ত্রুটি থাকে নিশ্চয়ই। এবং যদি সেই সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করা যায় সমালোচনায়, যেমন কোন কোন রবীন্দ্র-সমালোচক করেছেন, তখন দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ কেবলি, থেকে থেকে, একটি স্থির অবিচল জগতের শান্ত নাগরিকে পরিণত হতে চান; তাঁর প্রতিভার সবল চলমানতা মর্যাদা পায় না প্রাপ্য। ধ্বনির দিকটা প্রধান হয়ে পড়ে, গৌণ হয়ে দাঁড়ায় বক্তব্য ও চিত্র। এবং যে সকল শব্দ সমালোচক বার বার ব্যবহার করেন তারা এমন একটা ব্যস্ততা সৃষ্টি করে বিবেচ্য কবির সৃষ্টিকে ঘিরে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আড়ালে পড়ে যায় পাঠক-দৃষ্টির। সময়ের সঙ্গে ধ্বনির একটা বিরোধ আছে। সময় চলমান, ধ্বনি স্থির, তার চঞ্চলতা পরিধিতে, কেন্দ্র সে সুস্থির। ধ্বনি চায় চলমানকে সময় থেকে ছিনিয়ে নেবে, তাকে ধরে রাখবে নিজের স্থিরতার মধ্যে। আমরা জানি, প্রাচ্য দেশ সময়জ্ঞানী নয়। আমরা কালের হিসাব করি না। করি মহাকালের। সেই জন্য দৈনন্দিন সামাজিক জীবনেও দেখা যায় সময়ানুবর্তিতা আসতে চায় না কখনো, Punctuality ব্যাপারটা নিতান্তই পশ্চিমা। ধ্বনির হিসাব করে কবির বিচার করলে সময়হীনতা না-এসে পারে না।

আর সময়ের বাইরে যায় যখন মানুষ তখন সে প্রকৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের কথা বলতে গিয়ে ধ্বনি-বিচারের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিচারে আগ্রহী একজন বিশিষ্ট সমালোচক লিখে-ছেন, "সৃষ্টির এই যে শোভা, এই শোভার মধ্যে মানুষের একটি অংশ আছে—মানুষ এই শোভার সঙ্গে সংযুক্ত, সে এই শোভাকে অবলোকন করে এবং তার মাধুর্য নির্ণয় করে, এই শোভায় শোভমান হয়ে সে তার জীবনকে পরিদৃশ্যমান করে"। এই বিচারে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারায়, সে হয়ে পড়ে প্রকৃতির অংশ।

ধ্বনিকে নিরিখ করলে বস্তুকে যে-ভাবে অবজ্ঞা করতে হয় তার বিপত্তি অনেক, স্বভাবতই। যেমন সংস্কৃতে মহাকাব্য আছে, বাঙলায় নেই, এর একমাত্র কারণ হিসাবে উপরোক্ত সমালোচক বলছেন, "সংস্কৃত কাব্যে শব্দ ও ছন্দ ধ্বনি-গৌরবে পরিপূর্ণ।" এ নিশ্চয়ই একমাত্র কারণ নয়, ধ্বনিগত কারণের বাইরে বস্তুগত কারণও নিশ্চয়ই আছে একাধিক, কিন্তু সেটা চোখে পড়েনি, ঐ ধ্বনির প্রতি একান্ত মনোনিবেশের কারণে।

এটা উদাহরণ মাত্র। এ ব্যাপার সর্বত্র ঘটছে। শব্দের একটা অর্থগত দিক আছে তাকে অবজ্ঞা করে ধ্বনিগত দিকটাকেই চরম বলে জ্ঞান করা হচ্ছে। অথচ শব্দ-ব্যবহারের ব্যাপারে প্রায় তুলনা-বিরহিত ছিল যাঁর মনোযোগ সেই শিল্পী, ফ্লবেয়র, বলেছিলেন এক চিঠিতে যে, তিনি স্বাপ্নিক নন, তাঁর আসল দক্ষতা 'একটি ভালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা'।

শব্দ নিয়ে এই খেলা, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'শব্দ-মদ বেচা', এ কবিদের একচেটিয়া কিছু নয়। আমরা সকলেই, শিক্ষিত মানুষেরা সকলেই, খেলছি এই খেলা। এমনকি যখন ভাষার প্রশ্ন আসে, তখনো আমরা ধ্বনির কথাই ভাবি প্রধানত ধ্বনির পেছনের অর্থের কথাটা অনেকাংশে বাদ দিয়ে। ধ্বনির প্রচণ্ডতায় অর্থ হারিয়ে যায় বার বার। এবং অনেক সময় ধ্বনিই সত্য হয়ে ওঠে, অর্থকে পেছনে ফেলে। অতিশয়োক্তিতে ও অযথার্থ প্রয়োগ ভাষার যে অপব্যয় প্রতিনিয়ত ঘটে তা আতঙ্কজনক। অপব্যয় অবশ্যি আমাদের জাতীয় ক্রীড়া। বাংলাদেশে সময়ের, যৌবনের, ধনের, জনশক্তির—সব কিছুরই অপচয় চলছে, কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অপব্যয় বোধ করি শব্দের। কেননা শব্দের ঐ অপব্যবহারের দিকে তাকাই যদি তবে অন্য সকল অপব্যয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারি, ধ্বনির অপব্যয় শুধু ধ্বনিরই নয়, সে অপব্যয় জীবনের সামগ্রিক ও সাধারণ অপচয়েরই প্রতিলিপি। সেই জন্যই ব্যাপারটা দুর্ভাবনার।

বয়স্ক ছেলে যদি অর্থোৎপাদন বাদ দিয়ে শুধু ধ্বনি উৎপাদন করে তবে পরিবারের দৈন্য যে ঘুচবে কখনো এমন আশা করবার কারণ দেখি না। অথবা যদি উপমাকে বদলে দিই, পূর্বোল্লিখিত কবির ঐ উপমাকে স্মরণ করি, বলি আমরা পাগল হয়েছি শব্দ নিয়ে তবে সে অবস্থাটাও আশা-ব্যঞ্জক নয়। আর যদি এমন হয় যে আশা করছি শব্দ নিয়েই জীবন চলবে তবে সে বিশ্বাস স্বাস্থ্যবর্ধক হবে না।

ভাষার এই অপচয় ও অপব্যবহারের কারণ ভাষার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিলাসী ও শ্রমবিমুখ শ্রেণীর দ্বারা, যারা উৎপাদন করে না, অপচয় ও অপব্যবহার করে। কৃষক-শ্রমিক শব্দের অপচয় জানে না। যাকে বলা হয় সাধু ভাষা সেই ভাষায় আড়ম্বর অধিক, কর্মের তুলনায়; শব্দেরা সেখানে যত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তত পরিশ্রম করে না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা একে ব্রাহ্মণ ছিলেন তায় পণ্ডিত, সাধারণ মানুষ থেকে তাঁদের শ্রেণী-দূরত্ব তাঁদের হাতের গদ্যকেও 'অসাধারণ' করে তুলেছিল। দলিল-দস্তাবেজের ভাষায় যে-একটা সরল যাথার্থ্য ছিল তা এ ভাষায় পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগর যখন ক্রুদ্ধ হয়েছেন তখন তাঁর ভাষার মধ্যে যে একটা জীবন-সংলগ্নতা তথা স্বাভাবিকতা এসেছে তা অন্য সময়ে আসেনি। পরবর্তী কালে সুধীন দত্ত যখন গদ্যকে কঠিন করেছেন সযত্নে তখন বোঝা গেছে তিনি এবং তাঁর অনুকারীরা সাধারণ মানুষ থেকে যে দূরে অবস্থান করছেন সেই দূরত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট আছেন, এবং দূরত্ব বৃদ্ধিকে ঈপ্সিত জ্ঞান করছেন। বুদ্ধদেব বসুর সরলতায় অপব্যয় আছে ভাষার, আছে বাসনা জীবন থেকে পলায়নের। বিষ্ণু দে'র শ্রেণী-দূরত্ব মার্কসিজমে তাঁর আস্থা সত্ত্বেও ঘোচেনি। অন্যদিকের সাহিত্যে শব্দ নিয়ে যে ছুতমার্গ প্রকাশ পেয়েছে সেও সামাজিক ব্যাধির প্রকাশ মাত্র। 'খুন' শব্দ চলবে কি চলবে না এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জল ও পানির বিরোধ বঙ্গবিভাগের অপরিহার্যতারই স্মারক-চিহ্ন। (জলপানি কিন্তু দিব্যি চলে গেছে, স্কলারশিপ অর্থে; প্রাপ্তিযোগের কারণেই হয়ত-বা)। বাংলাদেশে সংস্কৃত, ফার্সী, ইংরাজী দরবারী ভাষা ছিল; সেই থাকা এই কথাটা জানিয়ে দিয়েছে যে জন-সাধারণ ও রাজদরবারের মধ্যে পরিখা ছিল গভীর। এমনকি যখন বাঙলাভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তখনও সেই পরিখা ভরাট হয়নি, কেননা পরিখা ভাষার নয়, অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার, ভাষা তার বহিপ্রকাশ

মাত্র। আর শব্দ নিয়ে যে হট্টগোল সেটা সৃষ্টি হয়েছে গভীরতর বিষয়ে প্রবেশ করতে অসামর্থ্যের দরুন।

আমরা অভিযোগ করি যে বাঙলা ভাষার যথেষ্ট প্রচলন হচ্ছে না। এ কিছু নতুন অভিযোগ নয়। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাংলাভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই ; বাংলায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সমাজের বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু যে-প্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব নেই এই উক্তিতে তা হল, সকল বাঙালী কি এক? ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদাভেদ কি নেই? বাঙলায় বললেই কি সব বাঙালী বুঝবে? সমানভাবে বুঝবে? দ্বিতীয় কথা, সমাজের উন্নতি মানে কি সকল বাঙালীর উন্নতি বোঝান হচ্ছে? তাই যদি হয় তবে তো ভাষার ব্যবধান কমানোর আগে কমানো দরকার সামাজিক ব্যবধান, সেই ব্যবধান না গেলে ভাষার দূরত্ব থাকবেই, বাঙলা ভাষা সকলে ব্যবহার করলেও থাকবে; ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল বাঙালীর ভাষা এক হবে না কিছুতেই।

বাঙলা প্রচলন না হওয়াটা অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু অধিকতর মর্মান্তিক হচ্ছে না হওয়ার কারণটা। কারণটা নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক ও সামাজিক। দেশের অধিকাংশ মানুষ নির্বাক —আগেও ছিল, এখনো আছে, তার কারণ তাদের অর্থনৈতিক দৈন্য ও অশিক্ষা। ধ্বনি যেটুকু আছে তা আর্তনাদের, শোকের ও অভিযোগের। সেই শব্দগুলো একে অপরের সঙ্গে মিলে থাকে, আলাদা করা যায় না, তারা প্রায়-মৃত। তাদের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্যপূর্ণ, শিক্ষিত, জীবন্ত ভাষা প্রয়োগ করবার কথা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। কেননা, সেখানে কিছুটা জীবন আছে, আর কিছুটা দক্ষতা। ভাষা ঐখানে বন্দী হয়ে আছে, ঐ ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজে। এটা একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুহা। এবং গুহার ভেতর আমরা ধ্বনি তুলছি এবং কিছু প্রতিধ্বনি। অনেক সময় ধ্বনিকে ছড়িয়ে যায় প্রতিধ্বনি, ছাপিয়ে ছড়িয়ে ওঠে সত্যকে। কিন্তু শোনে না, কেউ কারো কথা শোনে না, সকলেই শব্দ করে। গুহার মধ্যেও গুহা আছে আসলে, আত্মকেন্দ্রিকতার গুহা।

ভাষা যে বেরিয়ে পড়বে এই গুহা থেকে তা' হয়নি। তার কারণ অর্থনীতির অনগ্রসরতা, ভাষার ডাক পড়েনি নানা ক্ষেত্র থেকে, চ্যালেঞ্জ আসেনি বিচিত্র ও বহুমুখী। জীবনে যে বৈচিত্র্য নেই, কর্মের যে উদ্যোগ নেই বিপুল ও প্রবল তার ফলেই ভাষার এই বন্দীদশা। আমরা বলছি সাধারণ মানুষকে টেনে আনতে হবে, আন্দোলন গড়তে হবে সাংস্কৃতিক। কিন্তু এ সকল কথাও গুহার মধ্য থেকেই বলা। আমরাই বলি, আমরাই শুনি অথবা শুনি না। সাধারণ মানুষ শোনে না, শুনলে বুঝে না, নয়ত ভয় পায় (টানাটানি ভয়েরই ব্যাপার, জবরদস্তি এক প্রকার।) আসল কথা, ভেঙে ফেলা আবশ্যক এই গুহা। তবে, এবং শুধু তবেই, ভাষা সুযোগ পাবে যথার্থ প্রসার লাভের, নইলে নয়, তার আগে নয়।

বাঙলা প্রচলনের একটা উপায় শিক্ষাকে বিস্তৃত করা। কিন্তু শিক্ষা-বিস্তারটাও একটা সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা। বাঙলা ভাষায় উচচ-স্তরে শিক্ষা দানের জন্য পুস্তক দরকার লক্ষ লক্ষ, আমরা পুস্তক প্রকাশ করতে পারছি না এমনকি শত শত। সর্বোপরি শিক্ষাও সীমাবদ্ধ হয়ে আছে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মানুষদের এলাকায়। গুহার আয়তন কিছুটা বিস্তৃত হচ্ছে শুধু, বাড়ছে সংখ্যা নব্যাগন্তুকের, কিন্তু গুহার ভেতরই সমস্ত বিত্ত আটক আছে পুরোপুরি। এবং সকলেই জানেন যে, যে-শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে দেশে তা' অনেকাংশে সামন্ততান্ত্রিক ও কিয়দংশে পুঁজিবাদী মান-সিকতার সৃষ্টি করে, সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা সৃষ্টি না-করে। এই শিক্ষা গুহা-ভাঙার শিক্ষা নয় কোন দিক দিয়েই, গুহাকে অক্ষয় রাখার শিক্ষাই আসলে।

ব্যাপক হারে বাঙলা চালু না হওয়ার কারণ হিসাবে অনেক সময় উল্লেখ করা হয় পরিভাষার অভাবকে। পরিভাষার দুর্বল ঘাড়ে এই প্রবল বোঝা চাপানোর চেষ্টাটা হাস্যকর নিশ্চয়ই, আবার করুণও। কেননা, এর মধ্যে দিয়ে আবার ধরা পড়ছে ঐ ধ্বনিপ্রেম, ধ্বনির কাছে যাচ্ছি ছুটে বার বার। পরিভাষা একেকজন একেক প্রকার তৈরী কর-ছেন। স্মরণীয় যে, বাঙলা ভাষা সংস্কারের চেষ্টাও হয়েছে অনেকবার। সকলে যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করেছেন তাও বোধ হয় নয়, অনেকে হয়ত ভেবেছেন ভাষার সেবাই করছেন সংস্কার করতে চেয়ে। সাহিত্যে যখন কেউ বলেন তাঁর নিজের এলাকার ভাষা চালু করবেন, অথবা বিধান দেন

পুঁথির ভাষা গ্রহণের তখনো সেবার মানসিকতাই হয়ত প্রকাশ পায়। কিন্তু মূল কথা গুহাবাসী মানসিকতা, অর্থাৎ কিনা আত্মকেন্দ্রিকতা, অর্থাৎ এই রকম ভাবা যে আমিই মানদণ্ড, আদর্শ আমিই। অন্যেরা শুধু অনুকরণ করবে, নয়ত অনুসরণ।

আমাদের কাব্যপ্রেম বোধ করি সঙ্গীতপ্রেম থেকেই উৎসারিত। সঙ্গীতই প্রধান সাংস্কৃতিক সত্য বাংলাদেশে। গীতিপ্রবণতায় আনন্দের দিক যেমন আছে তেমনি আছে দুঃখের দিকও। গান স্থিতির ব্যাপার, কর্মের নয়, নাটকের সঙ্গে গানের বড় তফাৎ এইখানে যে নাটকে দ্বন্দ্বটাই প্রধান সত্য, গান দ্বন্দ্বকে পরিহার করে, আবেশকে, মুহূর্তকে বা অনুভূতিকে সে গ্রহণ করে বিষয় হিসাবে। নাটকের অভাব জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি। এবং সকলেই জানেন নাটক যখন লেখা হয়েছে এ দেশে তখন কৌতুকের দিকেই তাকানো হয়েছে, ট্র্যাজেডির দিকটাকে অবজ্ঞা করে। ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্ব গভীরতর, কমেডির তুলনায়। হালে যখন অত্যাধুনিক নাটক লেখেন তরুণ লেখকেরা তখন দেখি তাতে কাব্যময়তা তথা গীতিময়তাই বড় হয়ে উঠেছে কর্মের তুলনায়। নাটকের যে সংলাপ, অর্থাৎ চরিত্রে-চরিত্রে আদান-প্রদান মতামতের তার অভাব জীবনে আছে, সাহিত্যেও আছে। অন্যদিকে গানের মধ্যে যে অতিশয়োক্তি ও কোমলতা থাকে তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে উচ্চমূল্য লাভ করে আসছে।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের জীবনাভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি সঙ্গীত আছে। সেই সঙ্গীত সংঘর্ষের নয়, সমঝোতার কথা বলে। সে আলস্যের পরিপোষকতা করে, প্রবণতা আনে নিদ্রার। কে না জানে এই দেশে অধিকাংশ সময়ই আমরা নিদ্রিত থাকি; এবং যখন জাগ্রত তখন প্রায়ই সদ্যস্বপ্নোত্থিত বা নিদ্রাব্যগ্র। আমাদের আউল বাউল সহজিয়া দেহতত্ত্ব প্রভৃতি আধা বা পুরোপুরি পাগলামির গান জীবনবিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়, জীবনাভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু থেকেই তারা উৎসারিত। শ্রুতি ও স্মৃতি যে আমাদের ধর্মে এবং শিক্ষায় প্রাধান্য পায় তার কারণও আমাদের ধ্বনি-প্রিয়তা। মন্ত্রে আস্থা ধ্বনিতে আস্থাই। এবং মননের সঙ্গে মন্ত্রের একটা স্বভাবগত বিরোধ আছে, যার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা আছে 'অচলায়তন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে, "মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্য অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মত মননের

বাধা আর কী হইতে পারে। কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে।" আমরা পড়েছি, অনেক কাল ধরে পড়ে আছি, এই ফাঁদে।

আমাদের গান গাওয়ার মধ্যে একটা অপেশাদারিত্ব থাকে। সেটা দুই অর্থে : এক, গান আমরা পেশা হিসাবে গ্রহণ করি কম এবং দুই, গানের জন্য যে শ্রম ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক তার উপর নির্ভর না-করে নির্ভর করি স্বাভাবিক প্রতিভার উপর। সেই জন্য গান শোনা হয় না তত যত গাওয়া হয়। গান শিখি না, নিজে নিজে গাইতে শিখি। কেউ কাউকে শেখাতে চায় না, নিজে নিজে শিখে নেয়। এই বৈশিষ্ট্যটাও সাংস্কৃতিক, অর্থাৎ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা' উপস্থিত।

আরো একটা সত্য এই যে, গান ঐক্য আনেনি দেশের মানুষের মধ্যে। পল্লীর সঙ্গীত ও শহরের সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত একই ধরনের গান পছন্দ করে না। মূলগত যে বিচ্ছিন্নতা মানুষে মানুষে, গ্রামে গ্রামে, প্রাচীনকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত আছে এই ভূমিতে সেই বিচ্ছিন্নতা দূর হয়নি গানের মধ্য দিয়ে, বরং বলা যায় স্বীকৃত ও সমর্থিতই হয়েছে নতুন করে।

আমাদের ভাষা-চর্চার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো এসে গেছে অনায়াসে। সেখানেও ভাবালুতা, অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ আছে সুবিস্তৃত ও সুগভীর হয়ে। কর্মের তুলনায় আলস্য ও মেদবাহুল্যেরই আধিক্য। অশিক্ষিত-পটুত্বই প্রধান ভরসা আমাদের। ভাষা সর্বত্র বিস্তৃত হতে পারেনি। বহু মানুষের কর্ম, সম্মিলিত উদ্যম ও পরিশ্রমে বহুলব্যবহৃত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। ভাষার মাধ্যমে ঐক্য সেও গড়ে ওঠেনি।

গানের জগৎটা স্থিরজগৎ। এবং আমরা যখন চর্চা করি কি বিজ্ঞানের, কি দর্শনের, কি মানবিক বিদ্যার তখন ধরে নিই, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষ রূপে ধরে নিই, যে পৃথিবীটা স্থির হয়ে আছে। স্থিরত্ব অর্থ মৃত্যু। জ্ঞানের চর্চা তাই মৃত্যুর চর্চা হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।

শব্দ, শব্দ এবং শুধুই শব্দের যে কাব্যিক ও গীতিপ্রধান প্রেম তার মধ্যে অপচয় ও প্রহসন দুটোই আছে। আজ যা প্রয়োজন তা শব্দকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাধান্য দেওয়া অর্থকে, ধ্বনিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া

জীবনের দিকে। সাহিত্যের সঙ্গে শত্রুতা অনেক প্রকার হয়, সবচেয়ে বড় শত্রুতা সাহিত্যকে জীবনবিমুখ করা, যে-শত্রুতা অনেক সময় সাহিত্যিকরাই করেন সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে। সাহিত্য তখন শূন্যকুম্ভ হয়ে ওঠে এবং ধ্বনি করে অত্যধিক। কিন্তু সমস্যাটা সাহিত্যিক নয়, ভাষাতাত্ত্বিক তো নয়ই, সমস্যাটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন-জিজ্ঞাসা

কল্পিত নাম নয়, ছদ্মনাম নয় কারো। আরজ আলী মাতুব্বরের নিবাস বরিশাল। তাঁর সংগে আমার পরিচয় তাঁর বইতে, যে-বই তিনি লিখেছেন অনেক যত্নে, ছাপিয়েছেন বিস্তর পরিশ্রমে।

বইয়ের নাম 'সত্যের সন্ধান'। ম্রিয়মাণ, দরিদ্র চেহারা, বাংলাদেশের গ্রামের মত। ছাপা ভাল নয় মোটেই, কাগজ খারাপ, বাঁধাই দুর্বল, প্রচ্ছদপট অনাকর্ষণীয়। প্রচ্ছদ-শিল্পে যে বিপ্লব ঘটেছে ইতিমধ্যেই এই বাংলাদেশে তার কোন হদিস নেই এ বইতে। আরজ আলী নিজেই এঁকেছেন প্রচ্ছদ, অন্ধকার পাতা-জুড়ে, উপর থেকে আলো আসছে সামান্য একটু, রশ্মিপাত শুধুই, তাতে অন্ধকার কাটেনি, বরঞ্চ তার গভীর, কৃষ্ণ, আচ্ছন্নকারী ভয়াবহতাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে আরো। এ বই পেলে উৎফুল্ল হবার কারণ ঘটবে না কোন আধুনিক পাঠকের। পড়তে গেলে দেখবেন ভাষা পুরাতন, রীতি সাধারণ এবং প্রসংগসমূহ অনুত্তেজক। যত্ন ও পরিশ্রমে প্রকাশ সম্ভব হয়েছে শুধু, তার বেশী নয়। বলা যায় গলদ এর কেন্দ্রেই, একেবারে মূলগত। এ বইতে গল্প নেই, এ বই পথ মাড়ায়নি রূপকথার।

আসলে গল্প ও রূপকথার বিরুদ্ধেই এই বই। মনের ভুবন থেকে গল্পকে ছিনিয়ে নিতে চান তিনি, রূপকথাকে দিতে চান ঘুচিয়ে। সত্যকে দেখতে চান তার অবিচল অচঞ্চল প্রসাধনবিহীন রূপে। কিন্তু নিরাভরণ সত্যকে দেখে কি আনন্দ আছে, নির্ভেজাল সত্যে কি জীবন চলে মানুষের ?

চলে কিনা সে পরের প্রশ্ন। বাংলাদেশে অবান্তর কথা। বাংলাদেশে মৃত্যু সত্য, দুর্ভিক্ষ সত্য। সত্য মানুষের অমর্যাদা। কিন্তু আরো-এক সত্য আছে, সত্য হচ্ছে গল্প এবং রূপকথা। কিন্তু দু'য়ে মিলে সত্য একটাই, সে হচ্ছে অন্ধকার, যে অন্ধকার একদিন জীবনকে গোলাম করে রাখে কুৎসিত মৃত্যুর এবং অন্যদিকে জন্ম দেয় অসম্ভব রঙীন গাল-গল্প, অতি-কথার।

এ সেই আদিম অন্ধকার যা আছে আরজ আলী মাতুব্বরের স্বহস্তাঙ্কিত প্রচ্ছদপটে যেখানে তিনি সামান্য আলো ফেলেছেন বলে মনে করেন কিন্তু স্পষ্ট জানেন অন্ধকার তাতে দূর হবে না। বরং তার ঘনসর্বগ্রাসিতা আরো ভয়ংকর হয়ে ধরা দেবে। সেইখানেই তাৎপর্য এই বইয়ের, সেই প্রাচীন ও অনড় অন্ধকারের উপস্থিতিকে জানিয়ে দেওয়া, তাকে জ্ঞাত করা পাঠকের কাছে।

অন্ধকার আরো আছে এক প্রকারের, যার কথা কবিতার ওজস্বী রোমাঞ্চকরতায় ব্যক্ত করেছেন পশ্চিমের লেখকেরা। যে অন্ধকার, তাঁরা বিলাপ করে বলেন, পলাতক হয়েছে যন্ত্রসভ্যতার অতিউদ্ধত বিকাশে, প্রকৌশলের বিবেচনাবিহীন তৎপরতায়। এই অন্ধকার প্রবৃত্তির, অনুভবের, হৃদ-স্পন্দের। সেই দ্বিতীয় ও বিলাসী অন্ধকারকে খুঁজতে বার হওয়া তখনি সম্ভব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের, হতাশা ও অসহায়ত্বের প্রাথমিক অন্ধকার যখন কেটে গেছে। অন্ধকারে অন্ধকারকে খোঁজা যায় না।

আরজ আলী মাতুব্বর প্রথম ও নির্মম যে অন্ধকার সুচিরকাল ধরে স্থায়ী হয়ে আছে এই বাংলাদেশে তার কথাই বলেছেন তাঁর বইতে। বর্ণনা করে নয়, প্রশ্ন করে। কিন্তু সেই সব প্রশ্ন, সামান্য সামান্য প্রশ্ন, বর্ণনার অধিক করেছে দেখতে পাচ্ছি। সে কথায় পরে আসা যাবে। এইখানে এ কথাটা বলতে হবে যে, আরজ আলী অন্ধকারেই বাস করেন। গ্রামের মানুষ, পড়েননি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভ্রমণ করেননি দেশ-বিদেশ। গাছ-পাথর-বিহীন বয়সী অন্ধকারের রাজত্বেই তাঁর জন্ম।

সেখানেই বসবাস। কিন্তু সেটা বাহ্য অর্থেই শুধু। এই বই পড়ে জানা যায় তিনি অন্ধকারের সেবক নন, প্রজাও নন, ভক্তিমন্য, তিনি বিদ্রোহী আসলে।

বিদ্রোহ কি হয়নি বাংলাদেশে? আমরা কি দেখিনি সন্ত্রাসবাদ, দেখিনি মুক্তিযুদ্ধ? হয়নি কি কৃষক-বিদ্রোহ, অথবা যুদ্ধ ভোটের? আরজ আলীর বিদ্রোহ ভিন্ন প্রকারের। তিনি একাকী লড়ছেন। এবং তিনি লড়ছেন অন্তর্গত তিমিরের বিরুদ্ধে, সেইখানে যেখানে মানুষ অসহায় প্রতিরোধের শক্তিবিহীন, অন্ধবিশ্বাসের চিত্তভূমিতে। ধারণায় অভ্যাসে, সংস্কারে, সন্ত্রাসে গড়া এক অন্ধকার। সেইখানে তিনি লণ্ঠন উঁচিয়েছেন আলো ফেলবেন বলে। তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় নাম 'যুক্তিবাদ'। এই বিদ্রোহ ভিন্ন প্রকারের।

ধার্মিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা কি বলা হয়নি এর আগে? চিৎকার করে কেউ কি বলেননি, যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা কর জীবনে, মান্য করো না, জিজ্ঞাসা কর, অবরোহণ করো না আরোহণ কর? বলেছেন। কিন্তু তাতে অন্ধকারের ক্ষতি হয়নি। চমকে উঠলেও উঠতে পারে, কিন্তু দূর হয়নি, ভাঙেনি, মচকায়ওনি। যারা চিৎকার করেছে তারাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত, আত্মসমর্পণ করেছে তারা অন্ধকারের কাছে।

আরজ আলী মাতুব্বরে চিৎকার নেই কোন প্রকারের। চিৎকার করলে চিৎকার আসে প্রত্যুত্তরে, এক লাঠি ওঠালে অনেক লাঠি আসে, ধরতে আসে, মারতে আসে, ক্রোধ বাড়ে। আরজ আলী চিৎকার করেননি। তিনি কথা বলেছেন মৃদুস্বরে। নম্র কণ্ঠে। কিন্তু তবু তাঁরও বিপদ হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন সে-কথা বইয়ের ভূমিকাতে। "১৩৫৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ। বরিশালের তদানীন্তন ল' ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাবলিগ জামাতের আমির জনাব...(নাম বলা হয়েছে) সাহেব আমাকে তাঁর জামাতভুক্ত করার মানসে সদলে হঠাৎ তসরিফ নিলেন আমার বাড়িতে। তিনি আমাকে তাঁর জামাতভুক্তির অনুরোধ জানাইলে আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, ধর্ম জগতের এরূপ কতকগুলি নীতি-প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি এবং ঘটনার বিবরণ প্রচলিত আছে, যাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে এবং ওগুলি দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ নহে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতও বটে। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান, এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে যাইয়া আমার মনে কতগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে এবং হইতেছে। আমি ঐগুলি সমাধানে সক্ষম না হইয়া এক বিভ্রান্তির আঁধার কূপে নিমজ্জিত হইয়া আছি। আপনি আমার প্রশ্নগুলির সুষ্ঠু সমাধানপূর্বক আমাকে সেই বিভ্রান্তির আঁধার কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে আমি আপনার জামাতভুক্ত হইতে পারি। জনাব................সাহেব আমার প্রশ্নগুলি কি, তাহা জানিতে চাহিলে আমি আমার প্রশ্নের একখানা তালিকা (যাহা অত্র পুস্তকের "সূচীপত্র" রূপে লিখিত আছে সেই রূপেই) তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি উহা পাঠ করিলেন এবং সংগে লইয়া বলিয়া গেলেন—'কিছুদিন বাদে এর জওয়াব পাবেন।'.............সাহেব চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে আমি পাইয়াছিলাম —কম্যুনিজমের অপরাধে আসামী হিসাবে ফৌজদারী মামলার একখানা ওয়ারেণ্ট। কিন্তু আমার প্রশ্নগুলির এ জবাব আজও পাই নাই।"

শুধু জিজ্ঞাসা করেছেন, চিৎকার করেননি, আঘাত করেননি কারো ধর্মবিশ্বাসে। বস্তুত তিনি অধার্মিক নন, ধর্মের মধ্যে যে অংশটি, তিনি মনে করেন রূপকথা, অথবা অতিকথা তাকে তিনি পৃথক করতে চান ধর্ম থেকে। অতিকথাকে (মিথ্) তিনি ক্ষতিকর মনে করেন বেশী, মিথ্যা কথার তুলনায়। কেননা, মিথ্‌কে মিথ্যা বলে সহসা চেনা যায় না। অনেক আগে দার্শনিক বেকন বলেছেন এই কথা যে, কুসংস্কারের চাইতে নাস্তিকতা বাঞ্ছনীয়, কেননা নাস্তিক অবিশ্বাস করেন, কুসংস্কারবাদী করেন অপমান। ঈশ্বরে বিশ্বাস না-করা বরঞ্চ ভাল ঈশ্বরকে বিকৃত-ভাবে দেখার তুলনায়। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, বানরকে যে অত খারাপ লাগে দেখতে সে বানর মানুষের মত দেখতে বলে। আরজ আলী বেকন পড়েননি, কিন্তু আরজ আলীর বইতে সেই কথাটাই আছে। প্রচ্ছন্নভাবে বিস্তৃত হয়ে।

কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বরের বিপদ হয়েছিল কেন? সে কি এই জন্য যে, মনে করা হয়েছিল তিনি বিপদগ্রস্ত করেছিলেন ধর্মকে। ধর্ম কি এতই নাজুক, এতই সামান্যশক্তি যে কোথাকার কে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি প্রশ্ন করলো দু'চারটে আর সে ঘায়েই ভেঙেচুরে পড়বে ধর্মের ভিত? সে ভয় ধর্মের ছিল না। সে ভয় ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও করেননি। তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন গ্রাম্য মাতুব্বরের ধৃষ্টতা দেখে। তেমনভাবে যেমনভাবে তপ্ত ক্ষিপ্ত উন্মত্ত হয়ে পড়েন জমিদার তাঁর প্রজার ঔদ্ধত্য দেখতে পেলে। সাহেবেরা মনে করেন প্রজারা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তারা কেন প্রশ্ন করবে, জিজ্ঞাসা করবে এই ধরনের কথা।

আরজ আলী মাতুব্বর হাতিয়ারটা দেখেছেন হাতটা দেখেননি পেছনের। সেই হাতের কথা বলেননি তিনি বইতে যে-হাত চিরস্থায়ী করে রেখেছে আঁধারকে বাংলাদেশের মাটিতে। এই হাত শিক্ষিত মানুষের। এই হাত শাসক সম্প্রদায়ের।

অভিযোগ উঠেছিল কম্যুনিজম প্রচারের। সেটা তাৎপর্যপূর্ণ। কম্যুনিস্ট শুনলে সরকার রক্তচক্ষু হবে এটা জানা কথা। সেই সঙ্গে আরো আশা ছিল উন্মত্ত হয়ে উঠবে জনসাধারণও। কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে বলা হয় শোষিত মানুষের আন্দোলন। বলা হয়, না শুধু, সেটাই প্রকৃত পরিচয় এই আন্দোলনের। কিন্তু অন্ধকারের ক্ষমতা এমনি ঐন্দ্রজালিক যে শোষিত মানুষকেই সে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে।

এই জন্যই অন্ধকারের প্রয়োজন, এই দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি করতে পারে বলেই। কিন্তু দৃষ্টিহীনতাই নয় কেবল, অন্ধকারে বিষ আছে; সেই বিষ বিকারগ্রস্ত করে, তখন মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়, ছেলেমানুষের মত বিশ্বাস রাখে রূপকথা ও অতি-কথায়। তমসার শরীরী-অশরীরী উভয় প্রকার পশুদের তৎপরতা শুরু হয় নির্বিরোধে। ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব সবাই আসে, আসে শৃগাল-কুকুর। তস্কর ও দুর্বৃত্তেরা দূরে থাকে না। চারদিক থেকে চেপে ধরে তারা মানুষকে। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রধান পরিচয় তার চিন্তা-শক্তিতে, নইলে দৈহিক শক্তি, সহ্য-ক্ষমতা, শৃঙ্খলা, সাহস, স্বাস্থ্য যে গুণের কথাই বলি না কেন কোন-না-কোন প্রাণী পাওয়া যাবে যে ছাড়িয়ে যাচ্ছে মানুষকে, পারে না শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে। প্রাচীন আঁধার এই চিন্তাশক্তি কেড়ে নিতে চায় মানুষের, নষ্ট করে দিতে চায় তার মনুষ্যত্বকেই।

এই তমসা-বৃত্ত থেকে কেউ কেউ বার হয়ে গেছে। ছিটকে পড়ছে দূরে। নয়ত পালিয়েছে চুপি চুপি। হয়ত বা হেঁটেই চলে গেছে পায়ে পায়ে। উন্নতি করেছে বিষয়ের মাপে, উজ্জ্বল হয়েছে শিক্ষার আলোতে। গর্ব করেছে। অন্ধকারকে বলেছে অন্ধকার। হাস্য করেছে উন্নাসিক, মন্তব্য করেছে কটু। করুণাও করেছে অন্ধকারনিমজ্জিতদের। হয়ত হাতও দিয়েছে সংস্কারে। কিন্তু অন্ধকার দূর হয়নি। সে আছে যেমন সে ছিল।

বরং প্রায়ই দেখা গেছে সংস্কারের বস্তুবাদী আন্দোলন পোশাক নিয়েছে আধ্যাত্মিকতার। সে পোশাক পোশাক থাকেনি, অংশ হয়ে গেছে চেহারার। যুক্তিবাদী রাজা রামমোহন বাদ দিতে পারেননি শাস্ত্রকে। নাস্তিক বিদ্যাসাগর বলতে পারেননি তিনি নাস্তিক ছিলেন। এমন যে বিজ্ঞান, যা আন্তর্জাতিক, স্থাননিরপেক্ষ, তাকেও বাংলাদেশে এসে দরবার করতে হয়েছে ধর্মের কাছে। এবং দর্শন আলাদাই হতে শেখেনি ধর্ম থেকে, একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা সেখানে প্রবলরূপে প্রতাপশালী।

শাসকদের চাইবার কথা নয় আঁধারটা ফিকে হোক, লোকেরা জেগে উঠুক। লোকেরা জাগেনি, তাই দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র্য ঘোচেনি দেশের। কিন্তু তাতে শাসকদের বিঘ্ন নেই, মানুষের দুর্দশা ও শাসকদের সুবিধা— এই দুইয়ের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি আছে গোপন, তারা পরস্পর এগিয়ে নিয়ে যায় পরস্পরকে। সাধারণ মানুষের দুর্দশায় তাই বিপত্তি নেই, বিপত্তি

তাদের বিদ্রোহে; আরজ আলী মাতুব্বরদের উদ্ধত প্রশ্নে। শাসকদের অনুচরেরা আছে, শাসকদের চাইতেও ব্যস্ত তারা। অন্ধকারের হাতিয়ার তারা ব্যবহার করে নানা কৌশলে, বিবিধ দক্ষতায়। বিশেষ করে যখন বিদ্রোহ হয়েছে, আশঙ্কা দেখা দিয়েছে জাগরণের, তখন সন্ত্রস্ত তারা অন্ধকারকে নিয়ে এসেছে টেনে, বিদ্রোহকে বিদ্রোহ বলে চিনতে দেয়নি বিদ্রোহীদের। ফারায়জী আন্দোলন হয়েছে এদেশে, সে ছিল কৃষকের বিদ্রোহ; তারা বলেছে, এ হচ্ছে দাড়ি রাখা না-রাখার অত্যন্ত আবশ্যকীয় প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে বিবাদ—দুই সম্প্রদায়ে। হেসেছে অন্তর্যামী। বিদ্রোহ করেছে সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে; অনুচরেরা প্রচার করেছে সুস্পষ্ট গলায়, এ আন্দোলন হল শুয়োরের ও গরুর চর্বি নিয়ে, চর্বির বিরুদ্ধে উত্তেজনা। দোষ ইংরেজের নয়, দোষ বেচারা শুয়োরের, বেচারা গরুর। কৃষিপ্রধান দেশে অন্ধকার সন্ধ্যা হলেই নামে, শাসকেরা সন্ধ্যাকে মধ্যরাত্র করে রেখেছে।

তিমির-বিনাশক আন্দোলন কি হবে না? শাসক বলবে, হবে না। সরাসরি বলবে না, বলবে আকারে-ইঙ্গিতে প্রকারান্তরে। ছড়িয়ে দেবে হতাশা। জনসাধারণের হতাশাতেই শাসকের আশা। এবং হতাশা সংক্রামক। বলবে অন্ধকারই এ দেশের বিধিলিপি। আমরা বলতে পারি, মানি না এই কথা। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে সঙ্গে সঙ্গে, অবধারিত, কারা, কারা করবে আন্দোলন? করবে কি শিক্ষিত লোকেরা?

তাদের কাছে আশা করা যাবে। তারা আলোকপ্রাপ্ত, তারা অন্ধকারকে চেনে অন্ধকার বলে, জানে তারা পাশবিকতা অন্ধকারের, তারা আসবে এগিয়ে। কিন্তু কেন আসবে? ব্যক্তিগতভাবে আসতে পারে। তরুণেরা আসতে পারে সমবেতভাবে। তারা স্বার্থকে চিনতে পারেনি, এখনো, কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত যারা এবং সেই সঙ্গে সুশিক্ষিত তারা কেন আসবে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে যে-অবস্থা তাদের স্বার্থের পরিপোষক? আসবে না। ঘরের খেয়ে তারা তাড়াতে যাবে না বনের মোষ, বিশেষ করে সম্ভাবনা যখন স্পষ্ট যে, ঐ মোষ গুতিয়ে দেবে মওকা পেলেই। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিতরা ম্রিয়মাণ থাকে, জপ করে স্বার্থের, ভয় পায় অরাজকতাকে অর্থাৎ তেমন পরিস্থিতিকে যেখানে বঞ্চিত মানুষ অধিকার চাইছে বাঁচার। সাধারণের কথা বাদ রইল, কিন্তু অসাধারণ যাঁরা, প্রাতঃস্মরণীয়, করুণায় অসামান্য, প্রেমে অনন্য তাঁরাও কি সবাই সত্যি সত্যি চান পরি-

বর্তন আসুক শ্রেণীবিভাগের স্থিররেখায়? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র অশ্রুপাত করেছেন কৃষকের হৃদয়বিদারক দুঃখে, কিন্তু চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী থাকবে এই হৃদয়হীন কথা প্রচার করতে তাঁর বাধেনি। ইতিহাসের কথা বলেছেন বঙ্কিম, লেখার কথা, চর্চার কথা, ইতিহাসের পরিবর্তনের সত্যটা দেখেননি তাকিয়ে। তাঁর কথা সত্য হয়নি, টিকে থাকেনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যদিও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে গেছে এই দেশের, টিকে থাকলে মিথ্যা হত সামাজিক ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্রের একশ বছর পরে সেই বন্দোবস্তপিষ্ট কৃষকদের দেশে আয়ুব খানের অন্তিম দিনগুলো যখন এগিয়ে আসছে তখন পুস্তকের ওজনে বঙ্কিমাধিক শিক্ষিত সমাজতত্ত্বের মস্ত এক পণ্ডিত বলছেন শুনেছি, বুনিয়াদী গণতন্ত্র টিকবার জন্যই এসেছে। টেকেনি অবশ্যই, মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে ওপড়ানো স্তম্ভের মত, টেকেনি এমনকি পিতার পাকিস্তানও। টেকেনি শেখ মুজিবের একদলীয় শাসনও। ব্যবধান একশ' বছরের, কিন্তু কথা বলেছেন একই, অন্ধকারকে চিরস্থায়ী করে রাখবার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান এত প্রবল ছিল না বলা যাবে, বলা যাবে তিনি ডেপুটি ছিলেন পেশায়, ঔপন্যাসিক ছিলেন স্বভাবে। কিন্তু একশ' বছর পরে মার্কস ও আইনস্টাইন পার হয়ে এসে সমাজতত্ত্বের মস্ত মস্ত তত্ত্ব ও প্রান্তর ভ্রমণ করে, বিবর্তনবাদকে নিয়তি জেনে, সমাজতাত্ত্বিক কি করে বললেন ঐ একই কথা, ভ্রান্ত কথা? বললেন স্বার্থের কারণে। শতাব্দীর দূরত্ব, অথবা দূরত্ব সম্প্রদায়ের ও রাষ্ট্রের, কিম্বা শিক্ষার—সমস্ত কিছুই তুচ্ছ স্বার্থের ঐক্যের কাছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভেঙে পড়বে কৃষকের অসন্তোষের ধিক্কার থেকে ধাক্কা খেয়ে—একথা বললে মুরুব্বিরা চটবে। বিপরীত কথা যদি বলি তারা খুশী হয়, তারা শুনতে চায় ঐ কথাই। কৃষকের কথা কেন বলব? কৃষক কি দেবে আমাকে? কি আছে তার হাতে দেওয়ার মত, অভাব ছাড়া? বিপরীত কথা বললে বিপদ ঘটত ডেপুটিগিরির এবং প্রফেসরশীপের। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বুনিয়াদী গণতন্ত্র (তফাৎ প্রধানত নামেরই) যদি না টেকে তবে অরাজকতা দেখা দেবে দেশে, আইন-শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হবে, ভবিষ্যৎ থাকবে না স্ত্রী-কন্যার। ঐ ব্যবস্থায় লগ্নিকরা আছে সামান্য পুঁজির সবটুকু সঞ্চয়, পুঁজি গেলে হায় হায়, বসব আমরা পথে। ঔপন্যাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ তাই হাত ধরেন পরস্পরের, নৃত্য করেন বলতে গেলে। দরদের অভাব নেই, ভিক্ষুক আসুক দেবেন দু'চার পয়সা,

দাতব্য করবেন যদি চায় কেউ, কিন্তু ভাঙন বরদাশত করবেন না ব্যবস্থায়, এমনকি তত্ত্বগতভাবেও স্বীকার করবেন না পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে।,

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গেছে চলে, বুনিয়াদী গণতন্ত্রও নেই, একদলীয় শাসনও নয়, কিন্তু অন্ধকার তো আছে। আছে, কেননা শাসক, শোষক, সুবিধাভোগীরা আছে। অন্ধকারকে টিকিয়ে রাখছে তারাই। এরা অন্ধকার ঘুচাবে আরজ আলীদের জন্য এমন আশা আকাশকুসুম। শিক্ষিত তরুণরা এসেছে, আসবে। কিন্তু তাদের কাছে কৃষকের স্বার্থ জমা রেখে নিশ্চিন্ত বসে থাকা প্ররোচনামূলক, তারাও বাপের ঘোড়াই, নয়ত মামার কিম্বা চাচার। তাহলে বাকী রইল কারা? রইল আরজ আলী মাতুব্বরেরা, তারা নিজেরাই। নিজেদের অন্ধকার নিজেদেরই ঘোচাতে হবে, নেতৃত্ব হওয়া চাই তাদেরই। সহযোগিতা আসবে, সাহায্য পাওয়া যাবে, কিন্তু মূল আন্দোলন কৃষকেরই, গ্রামেরই। 'সত্যের সন্ধান' বইয়ের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর তাৎপর্য এখানে যে, সে এই তিমির-হনন আন্দোলনের অংশ, যে আন্দোলন বাইরের নয়, বক্রোক্তির নয়, যা ভেতরের, এবং সরলতায় উদ্ভাসিত।

স্বর্গ কোথায়? আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন তাঁর বইতে। প্রায় সক্রেটিসের মত বিনয়ে। স্বর্গ কি বাইরে কোথাও, নাকি মনের ভেতর? যেখানেই থাকুক সে যে বাংলাদেশে নেই তা আমরা কে না জানি। স্বর্গ চাই না, বাঁচার মত পরিবেশ চাই। মানুষের মত বাঁচাও নয়, শুধু টিকে থাকা—সেও সম্ভব হচ্ছে না লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে। বাইরের সাহায্যে কাজ হবে না, যতদিন না জাগরণ আসছে ভেতরে। সেই জাগরণের সামান্য চেষ্টা যিনি যেখানে করুন, তিনিই অভিনন্দন পাবেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা জীবনের জিজ্ঞাসা, তার নিরীহ লণ্ঠন বিস্ফোরক আসলে। লণ্ঠনে কাজ হবে না, বিস্ফোরকই চাই, অনেক অনেক বিস্ফোরক।

অনূদিত স্বর্গ ও বাস্তবিক নরক

অনুবাদের ব্যাপারে বাংলাদেশে আগ্রহ ও উৎসাহ অনেক কাল ধরেই প্রবল। বিশেষ করে উনিশ শ' সাতচল্লিশের পর থেকে সে আগ্রহ ক্রমশ ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর হয়ে উঠেছে। তুলনায় সাফল্য যে আসেনি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন আসেনি সফলতা? এটা একটা প্রশ্ন বটে। তবু এই প্রশ্নের চেয়েও প্রাথমিক ও গুরুত্বমণ্ডিত যে জিজ্ঞাসা তা হল আগ্রহ ও উৎসাহের কারণটা কি, কোন্ উৎসমুখ থেকে তারা উৎসারিত। কেননা উৎস শুধু উৎস নয়, উৎস সে গতি ও গভীরতার নিয়ামকও বটে।

অনুবাদের আবশ্যকতা প্রথমত এসেছে দৈন্যের বোধ থেকে। অনেক দেশে অনেক কাল দেখা দিয়েছে এমন যখন অনুবাদ এসেছে সৃষ্টির পরিপূরক হিসাবে। মূল স্রোত মৌলিক রচনার, সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে অনুবাদের স্রোতস্বিনী। স্রোতস্বিনী মূল্যবান সন্দেহ কি, কিন্তু মূল ধারার বাইরে এলে তার ক্ষমতা সামান্য, অস্তিত্ব বিপদগ্রস্ত। অথবা, বলা যায়, অনুবাদ এসেছে জাগরণের উল্লসিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুসঙ্গী হিসাবে। কিন্তু আমাদের দেশে সত্য ভিন্ন প্রকার। এখানে অনুবাদ না-স্রোতস্বিনী, না-জাগরসঙ্গী। অনুবাদ এখানে এসেছে বৈদেশিক সাহায্য, বা ঋণের মত। জীবনের আর পাঁচটা এলাকায় ঋণ আবশ্যক, আবশ্যক লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও। অভাব আত্মবিশ্বাসের, যে আত্মবিশ্বাসহীনতার জন্ম দৈন্যের জঠরে। বিষয়ের অভাবই বিষয়ীকে হীনমন্য করে, এটাই বড় সত্য; উল্টো ব্যাপারে সত্য থাকা সত্ত্বেও। আমরা নতুন পাঠ্যপুস্তক চাই, নবীন জ্ঞান চাই, সে জন্য আমাদেরকে বিদেশে যেতে হয়। যেমন করে আমরা রিলিফ চাই, যন্ত্র চাই, যন্ত্রী চাই, তেমনি করেই চাই আমরা অনুবাদও। উচ্চশিক্ষার্থীরা বিদেশে যান, নিম্নশিক্ষার্থীরাও এমন কিছু দেশে থাকে না, শরীরে থাকলেও মনে থাকে না, বিদেশের নকল-করে-লেখা পাঠ্যপুস্তক তাদের দখল করে রাখে, কিছুতেই ছাড়ে না, ছাড়ে না। অনুবাদ একদা রেনেসান্স এনেছিল ইউরোপে। আসলে অনুবাদ আনেনি রেনেসান্স, অনুবাদ সাহায্য করছে তার আগমনে। সেই অনুবাদ ছিল

জাগরণের সঙ্গী, ছিল না মুষ্টি-ভিক্ষুকের সামান্য ধন। ভিক্ষাজীবী ভিক্ষুকই থাকে, সাহস করে না এমনকি যে চোর হবে।

অনুবাদব্যগ্রতার কারণ আরো একটা আছে। সে হচ্ছে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের বিশেষ মওকা। জাতীয় দীনতায় ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে—সকলের নয়, অল্পকিছু জনের। বহু'র সর্বনাশে অল্পের পৌষ মাস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি মূল সত্য। সেই জন্য দেখা যায় রিলিফ এলে বিপন্ন মানুষের প্রায় কোনই উপকার হয় না, লাভ হয় রিলিফওয়ালাদের। দৈন্য আছে বলেই সাহায্য আসে বিদেশ থেকে এবং সেই সাহায্য বণ্টন করে নেয় সুবিধাভোগী অল্পকিছু মানুষ। অনুবাদ কর্মও সুযোগই এক প্রকারের, উঠতি মধ্যবিত্তের একাংশের পক্ষে বিশেষ একটা মওকা। বিদেশীরা আছে, যারা ভাবে বিস্তার করবে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য, এবং তারা লোক খোঁজে বিশ্বস্ত, অনুবাদওয়ালারা সানন্দে গিয়ে হাজির হয় তাদের দরবারে, টাকা নেয় দ্রুত, এবং অনুবাদ করে দ্রুততর। রিলিফ যারা দেয় তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের মধ্যে ইতর-বিশেষ থাকা সম্ভব, কিন্তু নগদ অর্থ দিয়ে যারা অনুবাদ করিয়ে নেয় তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, তারা অনুপ্রবেশ করতে চায়, বিস্তৃত করতে চায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যকে, প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় যা যতটুকু বিস্তৃত হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কলিনই বলি, কি ইউ. এস. আই. এস'ই বলি উদ্দেশ্য মোটমুটি ঐ একটাই। রিলিফ যে শ্রেণীর হাতে যেয়ে পড়ে অনুবাদদায়িত্বও সেই শ্রেণীর হাতেই যায়।

দেশ স্বাধীন হওয়া মানেই নতুন সুযোগ সৃষ্টি হওয়া উঠতি মধ্যবিত্তের জন্য। সাতচল্লিশে হয়েছিল, একাত্তুরেও হয়েছে। অনুবাদকর্ম আর পাঁচটা নতুন সুযোগের একটি। অন্য-একটা সুযোগ ভ্রমণ। স্বাধীনতা মুক্তি দিয়েছে কিছু-কিছু মানুষকে, সাতচল্লিশের পর থেকে তাঁরা দেশী-বিদেশী অর্থে দেশভ্রমণ করছেন প্রতিনিয়ত। এঁদের কেউ কেউ ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, যাঁরা লেখেননি তাঁরাও কাহিনী দিয়ে ভরে রেখেছেন ঘর, ঘর যত ভরেছেন ততোধিক ভরেছেন মন—থরেবিথরে। ভ্রমণের কাজ ও অনুবাদের কাজ—এই দুইয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য বর্তমান। উভয়েই সুযোগ, এবং সুযোগ একই শ্রেণীর মানুষের জন্য। উভয় কাজের পেছনে উদ্দেশ্য আছে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের এবং উভয় কাজ সম্পাদিত হয় তুল্য পারদর্শিতায়। অর্থাৎ অগভীররূপে, হেলাফেলায়। যাঁরা বাইরে যান ভ্রমণে

তাঁরা জিনিস কেনেন যত পারেন, সময় কাটান হাটেবাজারে, খোঁজ করেন না গ্রন্থাগারের কিম্বা মিউজিয়ামের। সময় পান না খোঁজ করবার, প্রবৃত্তিও হয় না যে খোঁজ করবেন। অনুবাদকেরাও তাই করেন, হাটেবাজারে ঘোরেন, তার বাইরে যেতে সময় সুযোগ পান না।

২

তাহলে অনুবাদের এই দ্বৈত সূত্র, দ্বিবিধ উৎস। এবং এরাই নিয়ন্ত্রিত করে অনুবাদের নির্বাচন এবং অনূদিতের শক্তি। একাত্তুরের পর থেকে বাঙলাভাষার প্রচলনের কথা নতুন রকম জোর পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙলা ভাষা প্রচলন অর্থ আরো অধিক সংখ্যক বিদেশী পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ করা। বিদেশী পাঠ্যপুস্তক স্বদেশে ব্যাপক হারে চালু করার বুদ্ধিবৃত্তিক তাৎপর্য বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করা। পুঁজিবাদের নিন্দা উচ্চকণ্ঠে করা হয়, কিন্তু যখন উচ্চকণ্ঠে অনুবাদের কথা বলছি বিদেশী পুস্তকের তখন ঐ নিন্দিত পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত মনোভঙ্গিকেই দেশী ভাষায় দেশের সর্বত্র প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার মস্ত উদ্যম নিচ্ছি আমরা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানসিক পরাধীনতার সুযোগ সৃষ্টি করছে। জাতীয় প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন এই দুই দিক থেকেই যে অনুবাদের দিকে ক্রমশ বেশী করে ঝুঁকছি আমরা তাতে জাতীয় মনীষা মজুরি খাটছে বিদেশীদের। জাতীয় মেধা পাচার সম্পর্কে সচেতনতা নানান সময়ে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু জাতীয় মনীষার বিদেশকরতলগত হওয়া যে অধিকতর অপচয়মূলক ও ক্ষতিকর সেটা খেয়াল করা হয় না।

অনুবাদ যা হচ্ছে তা পাঠ্যপুস্তকের ও সাহিত্যের। অনুবাদ হচ্ছে না ক্ল্যাসিকসের। সাহিত্যের ক্ল্যাসিকসের যেমন, অন্যসব শাস্ত্রের ক্ল্যাসিকসেরও তেমনি। অল্প যা ক'টি হয়েছে তাও সার্থক হয়নি। এটাই অবশ্যি স্বাভাবিক—উপরের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে। অন্য ভাষার বইও অনূদিত হয়েছে ইংরেজীর মাধ্যমে। এমনকি পাকিস্তান আমলে যখন উর্দু-বাঙলা ভাই-ভাইয়ের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া তৈরী করবার চেষ্টা চলত তখনো ইকবালের যে সকল অনুবাদ হয়েছে বাঙলায় তাও প্রায় ক্ষেত্রেই ইংরেজী থেকে, মূল উর্দু থেকে নয়। এতে ইংরেজীর গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি প্রমাণিত হয়েছে অন্যভাষায় অনধিগম্যতা। একটি

বড় মত দরজা ছাড়া আর সব দরজা বন্ধই ছিল আমাদের জন্য। এবং যে সকল অনুবাদ হয়েছে ইংরেজীর মাধ্যমে তাদের অধিকাংশই অসফল।

মুদ্রিত অনুবাদে অনেক কৌতুককর অসংগতি অনেক সময় দেখা যায়। যেমন, a couple of tractors-এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'ট্রাক্টর দম্পতি।' Hanif bats a centuryর "হানিফ এক শতাব্দী ধরিয়া ব্যাটাইতেছেন।" 50 miles as the crow flies, বাঙলায় হয়েছে "পঞ্চাশ মাইল এলাকায় সকল কাক উড়িয়া গিয়াছে।" Police patrolled the street, "পুলিশ পথে পেট্রল ছড়াইয়া গিয়াছে।" চাইকভস্কিকে দেখি বাঙলায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন 'টকাইভস্কি'—যেখানে-সেখানে নয়, গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনীতে।

এ ধরনের অনুবাদ নিয়ে কৌতুক করা যায়, কিন্তু এদের কৌতুকবহতার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল সেই সত্য যা এদের মধ্য দিয়ে বিধৃত হয়েছে। বলতে পারি এই সব অনুবাদে অজ্ঞতা আছে, আছে শ্রমবিমুখতা। কিন্তু যখন স্মরণ করা যায় যে এধরনের অনুবাদ হেলাফেলা লোকেরা করেননি, তেমনি হাত দিয়েই এরা বেরিয়ে এসেছে যে সমস্ত হাত সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা রাখে, এবং বাস্তবিক পক্ষে প্রভাব বিস্তার করেও থাকে তখন বোঝা যায় এই ব্যর্থতা ব্যক্তিগত নয়, ব্যর্থতা জাতিগত। উদাহরণ আরো অনেক দেওয়া যেতে পারে, এবং উদাহরণ যতই দেওয়া হোক তাদের প্রকৃত তাৎপর্য থাকবে এখানে যে, অনুবাদের মাধ্যমে যে-জ্ঞান, যে-ধরনের গভীরতাসম্পন্ন জ্ঞান, আমরা বিতরণ করছি উদাহরণসমূহ তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যদি শিউরে উঠতে হয় তবে উঠতে হবে সেই সেই সত্যের কথা ভেবেই, উদাহরণসমূহের উৎকটতার কথা ভেবে নয়। উৎকট বস্তুকেই প্রতিনিয়ত আমরা সেবন করছি প্রকৃষ্ট খাদ্য বিবেচনা করে।

যে উদাহরণগুলো উপরে আছে তাদের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক দূরত্বও নির্দেশিত হয়। ট্রাক্টরের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিজীবীর পরিচয় নেই, ট্রাক্টর তাই দম্পতি হতে পারে সহজেই। হানিফ কি করলেন তার খবর নিতে হয়েছে বেচারা সাংবাদিককে, কিন্তু century ও bat দুইই অজ্ঞাতপরিচয়। কাকরা ওড়ে জানি, কিন্তু কেমন করে

ওড়ে সে বিষয়ে খবর করি না, করা আবশ্যক হয় না, দূর আমাদের কাছে দূরই, অনেক দূর, তার বৈচিত্র্য সে না জানলেও ক্ষতি নেই। পেট্রল আমাদের কাছে এক প্রকারেরই, গাড়ীর পেট্রল। ইংরেজীতে চাইকভস্কির নামে যেহেতু T আছে, এবং T যখন ট'ই সাধারণত তখন চাইকভস্কির পক্ষে টকাইভস্কি হওয়া এমনকি অসম্ভব কাজ। কিন্তু বিষয় এই যে সংস্কৃতিসেবীকে যখন পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞান প্রদর্শন করতে হয়, তখন চাইকভস্কির খোঁজ পড়ে, কিন্তু তিনি যেহেতু নামই শুধু একটা, আর কিছু নন, তাই চকাইভস্কিতে এমনকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়।

৩

সাংস্কৃতিক দূরত্বটা আছে, সে থাকবেই। আমাদের ঝোল যে আমাদেরি দেশী ঝোল থাকবে, সে যে স্থপ হবে না, গ্রেভিও নয়, সেটাকে মান্য করা বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক। আর সেই বাস্তববুদ্ধির অভাবটা একটি মর্মান্তিক পীড়া। ইউরোপের সাহিত্যে রাজপুত্ররা আছেন, কিন্তু সে রাজপুত্রকে জানতে হবে তাঁর নিজের পটভূমিতে স্থাপন করে, নইলে দেখা যাবে শেক্সপীয়রের হ্যামলেট হয়ে দাঁড়াচ্ছেন রূপকথার রাজকুমার, টলষ্টয়ের আঁদ্রে হয়ে পড়ছেন উপজাতীয় প্রধান। এই ব্যাপারটা অনুবাদে ঘটছে। আমাদের দেশে দুইএর কথা ভাবতে গেলেই দম্পতির চিত্র ভেসে ওঠে মনে। ট্রাক্টরও তাই দম্পতি হয়। যন্ত্র এইভাবে এসেছে আমাদের দেশে, বিজ্ঞানও; অনূদিত হয়ে, নিজস্বতা খুইয়ে, বিকৃত, কিম্ভুত, অতিউৎকট চেহারা নিয়ে।

দোষ অনুবাদের নয়। অনুবাদ বড় একটা ভূমিকা নিতে পারে যদি অনুবাদের সঙ্গে থাকে সৃজনশীলতার মূল ধারা, যেমন অনেক দেশই নিয়েছে। ইউরোপের রেনেসান্সকে ভাবা যায় না অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার সাধনের দিকটিকে বাদ দিয়ে। বাঙলা ভাষাতেও বিদ্যাসাগর তো অনুবাদকই ছিলেন প্রধানত। কিন্তু আজ সৃজনশীলতার ধারাটি দেশে নেই, অনুবাদ তাই কেরানীর মাছিমারাতে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, কেরানীর পক্ষে মাছিমারা অন্যায় নয়, অস্বাভাবিকও নয়, কেরানীকে মাছি মারতেই হয়, নইলে সে কেরানী থাকে না, তার চাকরি যায়।

সমস্ত দেশ কেরানীর দেশে পরিণত হয়েছে। সকলেই পদবীতে কেরানী এই অর্থে নয়, সকলেই নকলনবীশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে। নকল করার কাজই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান যখন হয় তখন নতুন কোন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি আমরা দেশে। বাংলাদেশ এসেছে, কিন্তু সমাজব্যবস্থা বদলায়নি। নেতৃত্বের শ্রেণীগত পরিচয় অবিকৃত হয়ে গেছে, ফলে **Read Bangladesh for Pakistan**—পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই এই রাবার ষ্ট্যাম্পে আটক হয়ে আছে। ব্যাকরণ বলে বিষয়ের পরিবর্তন হলে বাক্যের অন্যান্য অংশে রদবদল হয়। আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাকরণ-অনুরুদ্ধ রদ-বদলটুকুও সম্পন্ন হয়নি।

পদবীতে কেরানীত্ব থেকে অনেক দূরে যাঁরা তাঁরাও কেরানীই, নকলনবীশ অনুবাদক ভিন্ন অন্য কিছু নন। বিদেশে কর্মরত আমাদের জাতীয় প্রতি-নিধি কেউ যখন খোঁজ করেন তাঁর সমপর্যায়ের পদবীসম্পন্ন অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি কি কি সুযোগসুবিধা লাভ করে থাকেন তখন তাঁকে লোভী বলা সহজ, তিনি তাঁর দেশের অতি নিকৃষ্ট দারিদ্র্য বিস্মৃত হয়েছেন স্মরণ করে উত্তেজিত হওয়াও খুবই সম্ভব, কিন্তু তিনি আমাদের জাতীয় অনুবাদক-চরিত্রের বরখেলাফ করেছেন এমন নালিশ তাঁর বিরুদ্ধে করা যাবে না, বরং বলতে হবে কেরানী-জাতির খাঁটি স্বভাবকেই তুলে ধরেছেন তিনি, নকল করতে চেয়েছেন, উদ্যত হয়েছেন মাছি মারতে, তিনিই আমা-দের যথার্থ প্রতিনিধি, তাঁর পদোন্নতি হওয়া অত্যন্ত সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়।

অনুরূপ কর্ম দেখা যায় গবেষণার ক্ষেত্রেও। পশ্চিমের মত করেই গবেষণা করেন গবেষকেরা, দেশকে ভুলেন, পরিবেশকে ভুলেন, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনকে অবজ্ঞা করেন। এমনকি সমাজ বিষয়ে যখন উদ্যম নেন গবেষণার তখনো যে সকল বিষয় নির্বাচন করেন, যেভাবে প্রশ্ন-মালা প্রস্তুত করেন তাতে তাঁদের অনুবাদকবৃত্তি আদৌ লুকানো-ছাপানো থাকে না। বিদেশী কল পেতে বসে থাকেন স্বদেশী সত্য ধরবেন বলে, সত্য ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে সত্যের বিকৃতি। তদুপরি সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই তাঁদের গবেষণা। বস্তিবাসির অবস্থা সম্পর্কে যদি কেউ গবেষণা করেন, তিনি সংগ্রহ করতে পারেন, জানতে পারেন, জানাতে পারেন তথ্য। কিন্তু অতঃপর? অতঃপরের কথা তাঁরা বলেন না, পশ্চিমের পাঠ্যবইও বলে না। যা আছে তাকে মান্য করেই তাঁদের

অনুসন্ধান, অমান্য করবার জন্য নয়, বদল করবার জন্য নয় সমাজব্যবস্থার। খাঁচার পাখি খাঁচাতে আছে, এবং থাকবে ধরে নিয়ে তারপর তত্ত্বতল্লাসি। খাঁচা ভালো কি মন্দ সে নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। বললে ভুল হবে না যে এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় প্রচলিতকে প্রতিষ্ঠিত রাখা। এই গবেষণা প্রকৃত আলো দেয় না, কেননা এ অভিজ্ঞতা জাগায় না মানুষের মনে পরিবর্তনের সপক্ষে, বরঞ্চ, আধো-আলো আধো-অন্ধকারের এমন একটা আলো-আঁধারি তৈরী করে রাখে যেখানে না উৎসাহ জাগে কাজ করার, না ইচ্ছা হয় ঘুমানোর। অনুবাদের ব্যাপারটাও ঐ রকমই, না-ঘুম না-জাগরণ, যে অবস্থাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর চেয়ে ভাল হত পরিপূর্ণ নিশ্ছিদ্র নিদ্রা, আমরা টকাইভস্কির কথা ভাবতাম না, নাক ডেকে ঘুমাতাম, সম্ভাবনা থাকত একদিন জেগে উঠব পরিপূর্ণরূপে, আধো-ঘুম আধো-জাগরণ যে সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে চায় আপন স্বার্থে। অনুবাদের স্বল্পজ্ঞান ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু জাগরণ দিতে পারেনি।

যে ধরনের গবেষণার কথা উপরে বললাম তার অভিপ্রায় আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে শ্রেণীকর্তৃত্বে রাখা, যে যেমন আছে যেখানে আছে তেমন থাক, সেখানে থাক এমন আয়োজন করা। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য যখন সামনে থাকে, থাকে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন, মার্কসিজমের প্রতিষ্ঠাসাধন তখনো দেখা যাচ্ছে, অনুবাদ, শুধুই অনুবাদ চলছে। মার্কসিজমের প্রধান শক্তি আছে যে-বাস্তববুদ্ধিতে সেই বুদ্ধিকে অকার্যকর রেখে ধার্মিকের নিষ্ঠায় শুধু উদ্ধৃতি দেওয়া, শুধুই হাদিস ঘাটা। বাস্তবিক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করার তত্ত্ব ধর্মকথায় পর্যবসিত হয়েছে, সে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কল্পনালোকের, অথবা জীবনবিচ্ছিন্ন তার্কিক সংঘর্ষের। অনুদিত মার্কসিজম ধর্ম হয়েছে আরোহণ বাদ দিয়ে অবরোহণের পথকে গ্রহণ করে এবং প্রযুক্তির বাস্তবিক প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে। প্রধানত সেজন্যই মার্কসিজমচর্চা অসফল হয়েছে এই দেশে।

নকল মাত্রই যে নিন্দনীয় এমন নাও হতে পারে অবশ্যি। যেমন জাপানীদের বলা হয়েছে নকলনবীশ জাতি। বলা হয়েছে, তারা উদ্ভাবন করেনি, অনুকরণই করেছে কেবল। উদ্ভাবন না করুক, উৎপাদন করেছে। উৎপাদনের সেই প্রবল স্রোতে নকলের ক্লেদ ভেসে চলে গেছে। যেখানে স্রোত নেই বিপদ সেখানে, সেখানে নর্দমার সৃষ্টি হয়, যেমন হয় আমাদের পরীক্ষার হলে, নকলকারীদের ব্যস্ততার মধ্যে।

যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে উৎকট অনুবাদের, তাদের দিকে তাকালে আরো একটি সত্যের মুখোমুখি হই আমরা। এটি হচ্ছে ধ্বনির প্রতি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ। দম্পতি ও শতাব্দীর মত শব্দ শুনলে উৎকর্ণ আমরা তৎপর হয়ে উঠি, অর্থের জন্য খেয়াল না করে শব্দের দিকে ধাবিত হই। অন্ধকে শব্দের উপরই নির্ভর করতে হয়, আমাদেরও বিশেষ নির্ভরতা শব্দে। অনুবাদে ধ্বনির দিকে খেয়াল থাকে অধিক, জীবনে যেমন আছে নানাবিধ তন্ত্রের দিকে। এমনকি যখন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা—এ ধরনের বিষয় আসে সামনে তখন ধ্বনিই আসে আসলে, চিত্র প্রায় আসেই না, এলেও আসে অস্পষ্ট, ক্ষীয়মাণ। শব্দের অন্তরাল ভেদ করে বস্তুতে পৌঁছা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এবং শব্দের মধ্যে—জনসভার, সংবাদপত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, সর্বাঞ্চলের চিত্রহীন শব্দের মধ্যে--অবস্থান আমাদের, যেমন জন্ম তেমনি বিলয়।

পরিভাষা নিয়ে পণ্ডিতরা অনর্থক তর্ক করছেন। কেউ বলছেন, উপাচার্য, কেউ উপ-মহাধ্যক্ষ। অর্থাৎ সেই পুরাতন অপব্যয় টপ্ করে পড়ল, না পড়ে টপ্ করল। সকল জনগোষ্ঠীরই একটি শুভবুদ্ধির অন্তঃসলিলা ধারা, থাকে সেই ধারাই ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত ও রক্ষিত রাখে। পণ্ডিতেরা সেই কথাটা ভোলেন, শুভবুদ্ধির কাছে না পাঠিয়ে পরিভাষাকে পাঠান নিজ নিজ দপ্তরের কাছে। মনে করেন, পদের জোরে প্রতিষ্ঠা করবেন শব্দ। পরিভাষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার পেছনে ধ্বনির প্রতি এই আসক্তি কার্যকর আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আরো আছে সেই সত্য, প্রধান সত্য জাতীয় জীবন সম্বন্ধে, সেই অনুবাদ নির্ভরতা, সেই মাছি মারার প্রবৃত্তি। উদ্ভাবনা যেখানে অল্প, উৎপাদন যেখানে সামান্য সেখানে শব্দের পেছনে ছুটোছুটি না করে উপায় কি, উপায় কি পরিভাষার অভাবকে দোষী না করে অনগ্রসরতার জন্য। পরিভাষায় এই অত্যন্ত-অধিক গুরুত্ব আরোপ দীনতারই প্রতিলিপি। এ কথা বলতে বিশেষ কোন কল্পনাশক্তির আবশ্যক হয় না যে, ভাষা দুর্বল বলেই পরিভাষা দুর্বল, ভাষার যদি ক্ষমতা থাকে ডাক দেবার, তবে পরিভাষা আসবেই, চলে আসবে, শামিল হবে, সংলগ্ন হবে—কোথা থেকে কে জানে। পরিভাষা অর্জিত জ্ঞানের স্মারক চিহ্ন হলেও হতে পারে, কিন্তু অর্জনকারী জ্ঞানীর জন্য মোটেই কোন দামী বস্তু নয়।

আমাদের বাস্তব যে নরকসমতুল্য এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নরক থাকলে স্বর্গের কল্পনাও থাকে। তাছাড়া ইসলাম ধর্মেও স্বর্গের ধারণা একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে খৃষ্টধর্ম ও ইসলামেরও অসামান্য সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ স্বর্গের অত্যন্ত আকর্ষণীয় চিত্রের উপস্থাপন। সমাজের নেতা যাঁরা তাঁদের স্বর্গ প্রকাশ্যেই অনূদিত স্বর্গে, এমনকি নিদ্রাতেও তাঁরা স্বাধীন নন, স্বপ্নেও পরাধীন। নেতৃত্বের এই সূত্র ধরে অনূদিত স্বর্গ বাস্তবিক নরককে বেষ্টন করে আছে। স্বর্গের নিকটবর্তী হবার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা যত-পারা যায় নিকটবর্তী হচ্ছেন, তাঁরা স্বদেশে থাকেন বিদেশীর মত, বিদেশে যান বারে বারে, ব্যবস্থা রাখেন বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের এবং অনেকেই করেনও বসবাস। দেশবাসী নরকে আছে। আর নরককে পাহারা দিচ্ছে অনূদিত স্বর্গ। তাকে ধ্বংস না করে সাধ্য কি নরক থেকে বার হই, বা নতুন স্বর্গ গড়ে তুলি, মৌলিক স্বর্গ, অর্থাৎ প্রকৃত স্বর্গ।

৫

উপরের অংশ লেখা হয়েছিল ১৯৭৪এ। পরের বছর শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন। অনূদিত স্বর্গে তিনি বসবাস করতে চেয়েছিলেন। 'জাতির পিতা' হয়েছিলেন, সেই পদবীটা যে-অনুবাদ তা সবাই জানে, তিনি জানতেন কিনা আমরা জানি না। বিদেশী আদর্শ আমরা নেব না এই কথাটা যতটা প্রবলতার সঙ্গে বলতেন ততটা প্রবলতার সঙ্গেই একদলীয় শাসন প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন—যে-শাসন এদেশে সমর্থন বা ভিত্তিভূমি কোনটাই পায়নি, এমনকি তাঁর নিজের জনপ্রিয়তাও ঐ বিশেষ ধরনের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলেই গড়ে উঠেছিল। যে-পথে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন তাতে নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা চান নিজস্ব। অথচ এদেশের কাদামাটি যে রাজবংশদের গোরস্থান স্বরূপ তা তাঁর অজানা থাকবার কথা ছিল না। এ যদি না জানতেন তিনি তবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। শোনা যায় দেশে যত না বিদেশে ততোধিক বিত্ত-বৈভব গড়ে উঠেছিল তাঁর ও তাঁর পরিবারের। মিত্রও ছিল বৈদেশিক। কিন্তু যে-স্বর্গ তৈরী করছিলেন তার জন্য মূল্য দিতে হচ্ছিল সমগ্র দেশকে, নরক তৈরী হচ্ছিল দেশবাসীর জন্য। সেই স্বর্গ ভেঙে পড়েছে, নিজের সৃষ্টির ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন তিনি শেষ পর্যন্ত। এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে; তার একটি হচ্ছে এই সত্য যে অনূদিত স্বর্গ ক্ষণস্থায়ী ও অত্যন্ত ভঙ্গুর, বাস্তবিক নরক বাস্তবিক বলেই অনেক বেশী শক্তিশালী।

শত্রুকে চেনা

বাংলাদেশে স্বাধীনতা এসেছে অকল্পনীয় মূল্যে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আসা মানেই দেশের মানুষের স্বাধীনতা আসা নয়। দেশের স্বাধীনতা আসায় দেশের মানুষের স্বাধীনতা আসার পথটা প্রশস্ততর হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু সে-স্বাধীনতা, দেশের মানুষের স্বাধীনতা, কিছুতেই আসবে না যতদিন দেশের অধি-কাংশ মানুষ জর্জরিত থাকছে অনাহারের, দারিদ্র্যের, অজ্ঞতার নির্মম বন্ধনে। শত শত বছর ধরে পুষ্ট হয়েছে এই সব বন্ধন, কাটবার চেষ্টা হয়েছে ক্ষীণ হস্তে, কিন্তু বন্ধন কাটেনি। সেই বন্ধনগুলো কাটিতে না পারলে মানুষের মুক্তি আসবার কোন সম্ভাবনা নেই।

বন্ধন কাটবে কারা? কাটবে তারাই যারা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছে দেশে—তরুণেরা, ছাত্রেরা, সর্বোপরি সাধারণ মানুষেরা। বন্ধন কাটার পথে অন্তরায় কি? প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বিত্তবান ও সুযোগ-সম্পন্ন মানুষেরা। তেমন মানুষ বাংলাদেশে অনেক করে ছিল না; ইতিপূর্বে পশ্চিমারাই ছিল বিত্তবান, বিত্তবানেরাই ছিল সুযোগসম্পন্ন। লড়াই হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তাদের পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ —প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে। স্বাধীন দেশে সুযোগের দ্বার আবার উন্মোচিত হয়েছে, নতুন করে। সেই দরজা দিয়ে কতজন ঢুকতে পারে, ঢুকে তারা দরজাটা বন্ধ করে দেবে কিনা সশব্দে—জিজ্ঞাসা সেটাই। পারে যদি বন্ধ করে দিতে দরজা। তবে আবার একটা শ্রেণী তৈরী হবে বিত্তভোগী ও সুযোগপ্রাপ্তদের। দরজার ভেতরের ও বাইরের মানুষের ভেতর আবার শুরু হবে কলহ, আবার সংঘর্ষ, আবারো রক্তপাত। রক্তের দ্বারা সিক্ত, মৃত্যুর দ্বারা লাঞ্ছিত এই বাংলাদেশে তেমনটা যাতে না ঘটে তা-ই হওয়া উচিত আমাদের সকলের কাম্য।

সুযোগ যাতে দেশের সকল মানুষের জন্য না আসে, সে যাতে বাইরে যেতে না পারে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদীদের আছে। দেশের স্বাধীনতার যারা বিরোধিতা করেছিল, দেশের মানুষের স্বাধীনতার বিরো-ধিতাও করবে তারাই। শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, সব অনুন্নত দেশেই সাম্রাজ্যবাদীরা এই কাজ করে আসছে অদম্য উৎসাহে, কম্যুনিজম প্রতি-

রোধের নাম করে দেশে দেশে ছুটে গেছে, ছুটে গিয়ে প্রতিরোধ করেছে সাধারণ মানুষের মুক্তি আন্দোলনের। কম্যুনিজম নষ্ট কর্‌বার অভিপ্রায়ে অনুন্নত দেশে তারা উন্নত একটা শ্রেণী গড়ে তুলেছে—সাহায্য দিয়ে, সমর্থন দিয়ে। বাইরে থেকে দেখতে যতই ভদ্র নম্র মার্জিত মনে হোক না কেন অতি-নিষ্ঠুর শোষণের উপরই এই শ্রেণীটির প্রতিষ্ঠা। অনেক মানুষকে বঞ্চিত করে তবে এই মানুষরা সুসভ্য। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যতই দাতব্য করুক না কেন, শ্রেণী পর্যায়ে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এরা হৃদয়হীন। পাকিস্তানীদের সৃষ্ট রাজাকারদের চেয়ে কিছু কম উৎসাহী বা নিষ্পেষণ-কারী নয় সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট এই আপাতঃভদ্র রাজাকারেরা। এরা বন্দী করে রাখে দেশের অধিকাংশ মানুষকে, কিন্তু নিজেও এরা পরাধীন, বিদেশী প্রভুদের হাতে তো বটেই, স্বদেশী বন্দীদের হাতেও বটে—কারা-গারের সবক্ষণিক রক্ষীকে স্বাধীন বলা যায় কি?

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন মহোৎসাহে, গিয়ে বলেছিলেন পাকিস্তান হল এশিয়ার হৃদয়, তখনি বোঝা গিয়েছিল ঐ হৃদয়ে রোগ ঢুকেছে। তারপর সামরিক চুক্তিতে, প্রতিরক্ষা জোটে যত ঢুকছে পাকিস্তান ততই স্পষ্ট হয়েছে কঠিন হয়েছে তার রোগ। সেই রোগেই পাকিস্তান ধ্বংস হল শেষ পর্যন্ত। সাম্রাজ্য-বাদীরা যে শুধু অস্ত্র সাহায্য দিয়ে ক্ষতি করেছে পাকিস্তানের তা নয় তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে দেশের সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত রেখে। বঞ্চিত মানুষেরা পঙ্গু মানুষে পরিণত হয়েছে, দেশের দারিদ্র্য ঘুচবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শেষে সেই বঞ্চিত মানুষের অভ্যুত্থানেই পাকিস্তান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বঞ্চিত বাঙালীরা জেগেছিল গতকাল, আজ সিন্ধী, বেলুচী, পাঠানদের জাগবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্তানে রক্তপাত শেষ হয়ে যায়নি।

সাম্রাজ্যবাদীরা যখন ভাব করে বন্ধুর তখনো কাজ করে শত্রুর। যখন নিজের দেশে দরকার নেই এমন খাদ্যদ্রব্য পাঠায় অভুক্ত মানুষদের দেশে তখন নিজের উপকারের জন্যই পাঠায়, অভুক্ত মানুষের উপকারের জন্য নয়। পাঠিয়ে সুনাম কেনে। গম-বেচা টাকা ব্যবহার করা যায় দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষদের মুক্তির আন্দোলনকে ধ্বংস করার কাজে। সাহায্য দানের পেছনে প্রচ্ছন্ন থাকে একটা সরল উদ্দেশ্য, গরীব দেশকে চিরকালের জন্য গরীব, পরমুখাপেক্ষী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবর্জিত

ভিখিরী করে রাখা। তরুণ ছাত্রকে যখন সমাদর করে নিজের দেশে নিয়ে যায় তখন উদ্দেশ্য থাকে ছাত্রের মঙ্গল করা নয়, উদ্দেশ্য থাকে একজন তাবেদার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু সৃষ্টি করা। বছরের পর বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা তার বিকারগুলোকে পাঠিয়েছে এই দেশে। পাঠিয়েছে বড় লোক হবার উৎকট প্রতিযোগিতাকে, উত্তেজনাকে, উদ্দেশ্য-হীনতাকে, যৌনসর্বস্বতাকে, এক কথায় ব্যাপক এক অপসংস্কৃতিকে। যুবশক্তিকে বিপথগামী করতে চেয়েছে। বিত্তবানদের সন্তান যারা তাদের শিখিয়েছে দেশের জনজীবনের প্রতি বিমুখ হতে, পোষাকে-আশাকে, চুলের শোভায়, চলার ভঙ্গিতে বিশিষ্ট হতে। তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে তারা ভাগ্যবান, সেই ভাগ্যকে নিয়ে তারা বড়াই করুক, এই ভাগ্য থেকে যারা বঞ্চিত করতে চায় তাদের তারা ঘৃণার পাত্র বলে মনে করে। গণতন্ত্রের কথা বলেছে সাম্রাজ্যবাদীরা, কিন্তু অর্থনৈতিক অসাম্যের দেশে গণতন্ত্র কি করে আসবে সেই প্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দেয় নাই কখনো। বাঘ ও গরুকে বলেছে এক সঙ্গে কাজ কর, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর, গরুর পক্ষে সে যে ভীষণ রকম বিপজ্জনক কাজ সেই কথাটা লুকিয়ে রেখেছে মিথ্যা প্রচারের অন্তরালে। এমন কি দরিদ্রের প্রতি মমতার কথাও বলেছে সাম্রাজ্যবাদীরা, যেমন করে চোর চীৎকার করে চোর চোর বলে, হাতে যখন চোরাই মাল থাকে তখন। কোন ধরনের গণতন্ত্র চায় সাম্রাজ্যবাদীরা তা বোঝা যায় আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট দেশগুলোর দিকে তাকালেই, বোঝা যেত পাকিস্তানকে দেখলেই।

কে আমাদের শত্রু মিত্র এটা আমাদের চিনে নিতে হবে। চিনতে ভুল হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। 'আমাদের' অর্থটা কি তাও স্পষ্ট রাখা কর্তব্য। আমাদের অর্থ সাধারণ মানুষের। তার খেসারত দিতে হয়েছে ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু দিয়ে, সংখ্যাহীন নারীর সম্ভ্রম দিয়ে। যাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলি তাদের প্রধান কাজ হওয়া দরকার শত্রুকে চিনিয়ে দেওয়া। অতীতে বুদ্ধিজীবীরা তা দেয়নি। হয়তো চিনতে পারেনি। কখনো বা চিনতে পেরেছে কিন্তু বলতে পারেনি। কেননা, না-বললে লোভ ছিল প্রাপ্তির, বলতে গেলে ভয় ছিল শাস্তির। শাস্তি কম হয়নি, জেলজুলুম ছিল, ছিল জীবিকার উপায় হারানোর সম্ভাবনা। সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এদেশে ছিল না বললেই চলে। ফলে আল-বদরেরা রাজত্ব করেছে। এবং পাকিস্তানের চব্বিশ বছর পার হয়ে যখন এসেছে শেখ

মুজিবের সাড়ে তিন বছর তখন অনেক সংখ্যক বুদ্ধিজীবী তারস্বরে নেতা, পিতা ও বন্ধুত্বের জয়ধ্বনিসমূহ এত বেশী করা শুরু করেছিলেন যে অতি অল্প সংখ্যক মানুষের সমৃদ্ধিকেই সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি বলে ভুল করবার কারণ দেখা গিয়েছিল। এই সকল বুদ্ধিজীবী শত্রুকে চিনতে তো সাহায্য করেনইনি উপরন্তু শত্রুকেই মিত্র বলে চেঁচামেচি করেছেন, হৃদয়হীন উন্মত্ততায়। সৌভাগ্যের কথা দেশবাসী বিভ্রান্ত হননি। কেননা কে শত্রু আর কে মিত্র সে ব্যাপারটা কোন তর্কের ব্যাপার ছিল না তাঁদের কাছে, জীবনের পীড়া ও দুর্ভোগের মধ্যেই প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁরা শত্রুকে। বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন ভেবেছিলেন তাঁরা, পরম সন্তোষের কথা, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, এবং ব্যর্থতার কৃষ্ণ গ্লানি তাঁদের নিজেদের উপরই শুধু টেনে আনেননি সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী সমাজের উপরই টেনে এনেছেন।

দেশের স্বাধীনতা যাতে দেশের মানুষের স্বাধীনতায় পরিণত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সকলের। স্বাধীনতা রক্ষা করবে কারা? করবে দেশের মানুষ। কিন্তু বন্দীকে দিয়ে তো স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বন্দীর মুক্তি না হলে স্বাধীনতা যে এসেছে তাই বা বুঝব কি করে?

নতুন বছর, পুরাতন প্রশ্ন

পহেলা বৈশাখে শহরের মানুষ সভা করে, গান করে, বলে বর্ষ-বরণ করছি। অনেকে নয়, অল্পকিছু মানুষ করে। কিন্তু বৈশাখ আসে, শহরে আসে, গ্রামে আসে। আসে খরা নিয়ে, দাহ ও তৃষ্ণা নিয়ে, দেনা ও দারিদ্র নিয়ে। বছরের পর বছর আসে, কিন্তু জীবন বদলায় না। অল্পকিছু মানুষের বদলায়, বেশীর ভাগ মানুষের আদৌ বদলায় না, সেখানে পুরাতন দুর্ভাগ্য ও হতাশা অজর অনড় হয়ে বসে থাকে।

আমাদের সামাজিক জীবনে বড় সত্য দুটো। এক, অভাব; দুই, বৈষম্য। অভাবকে ঢাকা দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ি, অনুষ্ঠান করি; কিন্তু যা-ই করি না কেন, তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে বৈষম্যটাই উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে। ধনী-নির্ধনের তফাৎ আমাদের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কেউ বিশেষ পোষাক পরে, সাজে বিশেষ সাজে; কেউ অনাবৃত করে ক্ষত ও দৈন্য, যদি পাওয়া যায় ভিক্ষা কিছু। ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানেরও ঐ একই বৈশিষ্ট্য। আমরা বলি একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান সর্বজনীন, কিন্তু এমনকি তার মধ্যেও দেওয়াল থাকে, সর্বজনীনতা দেও-য়ালের এপাশের মানুষগুলোকে নিয়ে, ওপাশের মানুষগুলোকে দূরে ঠেলে বাদ দিয়ে।

যেদিক তাকাই দেখতে পাব শুধু দেওয়াল উঠছে। দেওয়াল তোলাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের প্রধান শিল্প। দেওয়ালের তাৎপর্য দুই প্রকারের। প্রথমত, নিজের স্বার্থ রক্ষা করা; দ্বিতীয়ত, নিজের এলাকাটাকে জানিয়ে দেয়া। এরা দুইয়ে মিলে এক ও অভিন্ন। আত্মকেন্দ্রিকতা, সকলের সঙ্গে সকলের বিরুদ্ধতা, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের।

বাইরের দেওয়ালের চেয়েও শক্ত দেওয়াল আছে মনের ভেতরে। সেই দেওয়ালেরই আসল দেওয়াল, তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ইটের দেওয়াল। দেওয়াল আছে, আছে দারোয়ান। সঙ্গে আছে মামলা, আছে মোকদ্দমা, উকিল আছে, আছে মোক্তার। সৃষ্টি না-করে শুধু রক্ষা করাই যদি কোন সমাজের প্রধান চিন্তা হয় তবে বুঝতে হবে সেখানে মৃত্যুর ছায়া এসেছে।

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কে পরস্পরের উদাসীনতাটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু সেই উদাসীনতা এখন প্রকাশ্য ও পারস্পরিক শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছে। এত দেওয়াল, কেবলি দেওয়াল, বাংলাদেশে আগে কি কখনো ছিল? দেওয়াল তোলার ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে যে সৃষ্টিশীলতা, যে সম্ভাবনা আছে তা বিকশিত হবার পথ পাচ্ছে না। বাধা পাচ্ছে দেওয়ালে। আর সকল মানুষের শক্তিকে একত্র করলে যে প্রচণ্ড শক্তি তৈরী হতে পারত তাও তৈরী হচ্ছে না কিছুতেই। ফলে দারিদ্র্য ঘুচবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অভাব বরং বাড়ছেই, সামান্য জীবনযাত্রা সামান্যতর হয়ে পড়ছে। প্রকৃতিকে জয় করা, সম্পদ আহরণ করা, এসব কথা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক মস্ত মস্ত শব্দের বোঝা হয়ে বিদ্রূপ করছে ক্রমবর্ধমান দীনতাকে।

সমাজতন্ত্র ও দেওয়াল পরস্পর বিরোধী, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্কটাও বিরুদ্ধতার। দেওয়াল না ভাঙলে দারিদ্র্য ঘুচবে না। সমাজতন্ত্রও আসবে না কখনো। কথা ছিল দেওয়াল ভাঙা হবে। আজকের কথা নয়। নতুন কথা নয় কোন। অনেক কাল ধরে শোনা যাচ্ছে এই কথা। প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির সুর ও ধ্বনি কম ওঠেনি কোনকালে। স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ, স্বরাজ ও স্বাধীনতার কথা শুনে শুনে মনে হয়েছে পরিবর্তন বুঝি এসে গেছে রাস্তার মোড়ে, এখন শুধু তার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়াটা বাকি। কিন্তু আসেনি পরিবর্তন, ভাঙেনি দেওয়াল। শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, অনেক কিছু কর্মকাণ্ড হয়েছে হট্টগোল করে, কিন্তু দেওয়াল ভাঙেনি, বরং শক্ত হয়েছে। ধনী আরো ধনী হয়েছে, দরিদ্র আরো দরিদ্র। পাকিস্তান যখন ভাঙল আমরা ভাবলাম দেওয়াল এবার ভেঙেছে চিরতরে, এখন মানুষ একত্র হয়েছে. সমবেত হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, এখন ব্যক্তির বিকাশ, সমাজের সম্মিলিত বিকাশ অবাধ হবে বাংলাদেশে।

কিন্তু আবার শুরু হয়েছে দেওয়াল তোলা—মনের মধ্যে, সমাজের মধ্যে। বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হয়েছে মানুষ। সংঘর্ষ এসেছে স্বার্থের। চলছে মজুতদারি, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সংগ্রহ এবং তার উল্টো পিঠে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে উৎপাদন।

আমরা বলি অরাজকতা এসেছে দেশে। লুণ্ঠন চলছে। রাহাজানি এসেছে, এসেছে নকল। পরীক্ষায় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র। যে

যাকে যেখানে পারছে যেমনভাবে পারছে প্রতারণা করছে। আমরা নিন্দা করতে পারি এবং করছিও; আমরা হায় হায় করতে পারি, বলতে পারি সর্বনাশ হয়েছে, চরিত্র গেছে বাঙালীর, আমরা বলছিও তাই। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে যা ঘটছে তারা বিচ্ছিন্ন নয় মোটেই, আর ঘটনা রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। রোগ হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থা চালু আছে জীবনে তাদের কোনটার প্রতিই কোন আস্থা নেই মানুষের। মানুষ মনে করছে প্রত্যেকে একা, প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু, মনে করছে যেসব ব্যবস্থা চালু আছে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করা। আমি যদি প্রতারণা না করি তবে অন্যে আমাকে প্রতারণা করবে, আমি যদি কোন অভাবে পড়ি তবে কেউ আসবে না আমাকে বাঁচাতে। কাজেই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে আমার। আমি সৎ তার মানে আমি সুযোগ পাইনি, তার মানে আমি ভীতু। মনে মনে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অসৎ। অশুভ মানুষের ভেতর সব সময়েই আছে, সমাজের প্রয়োজন হয় সেই অশুভকে দমন করবার জন্য, বশীভূত করবার জন্য; কিন্তু আমাদের সমাজ সেই অশুভকেই উত্তেজিত, প্ররোচিত করছে। চরিত্রকে গাল দিচ্ছি, কিন্তু চরিত্র নষ্ট হচ্ছে কেন, দেখতে হবে সেই কারণকে।

ব্যবস্থাগুলো তাই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আর আমরা ভাবছি, এই ব্যবস্থাগুলোকে মেরামত করলেই সব অরাজকতা দূর হবে। তা হবে না; হবার নয়, কিছুতেই। ব্যবস্থা না বদলালে মানসিকতা বদলাবে না। মানুষের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং ব্যবস্থা সমূহের প্রতি সকলের আস্থা যদি না জন্মায় তবে মানুষ বদলাবে না কিছুতেই। এবং সেই অতিপ্রয়োজনীয় আস্থা সৃষ্টি হবে না কোনদিন, যতদিন পর্যন্ত না আমরা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি, যেখানে দেওয়াল থাকবে না বিভেদের, যেখানে মানুষ এক হয়ে, একত্র হয়ে সকলের স্বার্থকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে অনায়াসে।

কিন্তু ব্যবস্থাকে ভাঙতে চাইবে কেন তারা, যারা এর সুবিধাভোগী? দু'টি শিশুর মধ্যে আলাপ শুনছিলাম সেদিন। দেশের সব লোক যদি ভদ্রলোক হয়ে যায় তবে পরিণতি তার দাঁড়াবে কি রকম—এই নিয়ে মতামত বিনিময় করছিল তারা। একজন বলছে—তখন রিক্সা পাওয়া যাবে না, কে টানবে রিক্সা? অন্যজন আরো কাছে এসেছে বাড়ির, বলছে শুনলাম, তখন চাকরই পাওয়া যাবে না, কে হবে চাকর? এই

কথাটা ছোট শিশুরা বলতে পারে সহজে, আমরা বলতে পারি না, কিন্তু সত্যের তাতে ইতরবিশেষ ঘটে না, সত্য সত্যই থাকে। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন গরীব মানুষ গরীবই থাকুক, তা না হলে রিক্সা টানবে কে, কেই বা হবে চাকর?

আমরা ধ্বনি তুলছি নানা প্রকারের, প্রতিষ্ঠান গড়ছি, অনুষ্ঠান করছি—নানান প্রকারের। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকছে একটা অভিসন্ধি, সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ, সন্তুষ্ট থাকুক নিজেদের ভাগ্য নিয়ে। আমরা তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাচ্ছি নিজেদের অভাব থেকে, নিজেদের বঞ্চনা থেকে, বলছি অতীতের কথা, ভবিষ্যতের কথা। ভয় পাছে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, পাছে দেওয়ালগুলো সব ভেঙে ফেলে সমবেত হাতে। তখন রিক্সা টানবে কে আমাদের? চাকর হবে কে?

পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানও তেমনি অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। তেযাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় কিছু যুবকের উচ্ছৃংখলতায় আমরা ভীষণ আতঙ্কিত হয়েছি। কিন্তু এই উচ্ছৃংখলতা কি অস্বাভাবিক কোন ঘটনা? আমরা বলেছি, পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারীর, কিন্তু পবিত্রতা যদি নষ্ট হয়েই থাকে তবে সেটা ঘটেছে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারীর উদ্দেশ্যহীনতায়। একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল অসন্তোষের আন্দোলন, দেওয়াল ভাঙার আন্দোলন, সেই মূল চেতনায় যদি ঘাটতি পড়ে থাকে, যদি অসন্তোষ না থাকে জাগ্রত, যদি প্রতিবাদ না থাকে তীব্র, তবে একুশে ফেব্রুয়ারী দেওয়াল ভাঙার পরিবর্তে দেওয়াল গড়েই তুলবে বরঞ্চ। দেওয়াল গড়ার দিকে যত অগ্রসর হবে এই দিন তত বাড়বে এর প্রাণহীনতা, বাড়বে আবিলতা, আমরা যতই যা বলি না কেন।

কিন্তু দেওয়াল ভাঙবেই। পাকিস্তানের শক্ত শক্ত দেওয়ালগুলোকে মানুষের আর্তনাদ ও প্রতিবাদ বার বার আঘাত করেছে। মনে হয়েছে পোক্ত দেওয়াল ভাঙবে না কিছুতেই, ভাঙবে না কোনদিন। শেষে নিরুপায় মানুষ বুকের হাড়কে অস্ত্র করে সেই দেওয়াল ভেঙে দিয়েছে। দেওয়ালগুলো যদি ভেঙে না থাকে সত্যি সত্যি, যদি আবার নতুন দেওয়াল ওঠে পুরানো ভিতের উপর, তবে আবারও পুরনো ইতিহাসের নতুন অভিনয় ঘটবে, স্বাভাবিকভাবেই। তার মধ্যে যে অপচয় আছে, আছে যে রক্তপাতের সম্ভাবনা তা আমরা রোধ করব কিনা, জিজ্ঞাসা সেটাই। পহেলা বৈশাখে সেটা একটা বিশেষ জিজ্ঞাস্য, কেননা পহেলা বৈশাখে একটা নতুন বছরের শুরু হচ্ছে। সেই বছরও কি ব্যর্থ হবে আগের অনেক-বছরের মত? এই পুরাতন জিজ্ঞাসাটা নতুন করে আসছে মনে।

সঙ্কটাচ্ছন্ন গ্রন্থজগৎ

প্রকাশনা-শিল্পের সাম্প্রতিক অবস্থাটা যে রীতিমত ভয়াবহ সেটা আন্দাজ করা আগেই গিয়েছিল।

সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল কিছু তথ্য পাঠ করে। যেমন, ১৯৪৮-এ সাহিত্যের বই প্রকাশিত হয়েছিল ৯৩টি, ১৯৫৯-এ প্রায় ১,০০০, ১৯৭২-এ সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ২০০। পরের হিসাব পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যেত সংখ্যা বাড়েনি, কমেছে বরং। অর্থাৎ অব্যাহত আছে ক্রমাবনতি, আমরা ফিরে যাচ্ছি ১৯৪৮-এর দিকে। কিন্তু ১৯৪৮ ও ১৯৭৪-এর ব্যবধান যে ২৬ বছরের সেই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য সবকিছুই, জনসংখ্যা, শিক্ষিতের হার, পাঠকের, প্রকাশকের, লেখকের— সবকিছুর পরিমাণই বেড়েছে অনেক গুণ। বেড়েছে ছাপাখানার সংখ্যা, কাগজের কল, আর বেড়েছে সাহিত্যের প্রত্যাশা। তদুপরি ১৯৫৯-এর যে সংখ্যা, এক হাজার, সেই সংখ্যা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না আদৌ। ১৯৫৯-এ পরাধীন ছিল দেশ, উৎপাদন ব্যবস্থার যেদিকেই তাকিয়েছি আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি, অসহ্য মনে হয়েছে আমাদের পশ্চাদবর্তিতা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের অভিযোগ ছিল আরো বেশী। সেই জন্যই আমরা অবসান চেয়েছি পরাধীনতার। আমরা পরিবর্তন চেয়েছি ১৯৫৯-এর অবস্থার। আজ যদি ১৯৫৯-এর অবস্থার তুলনায় অনেক নীচে নেমে যেতে হয় তবে আশাভঙ্গের সেই যন্ত্রণা দুর্বিষহ হবে নিশ্চয়ই। ৪৮ থেকে ৫৯-এর ১১ বছরে বইয়ের সংখ্যা যদি দশ গুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তবে ৫৯ থেকে ৭৪-এই পনের বছরে সমপরিমাণ বৃদ্ধি দেখতে পেলে হয়তো সন্তুষ্ট হতাম। দশ হাজার না হোক, পাঁচ হাজার হলেও চলত হয়ত বা ; কিন্তু দু'শো একেবারেই অচল।

প্রকাশনা অবশ্যই দেশের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। গ্রন্থের মধ্যে শক্তি আছে, মানসিক শক্তি। কিন্তু মানসিক শক্তি বিচ্ছিন্ন নয় যাকে বলে 'এনার্জি' সেই শক্তি থেকে। এই দুই শক্তি—মনের ও বাইরের—একই সঙ্গে যায়। সোনার বাঙলা শ্মশান কেন এই অসহ্য বিষয়ে যখন আমরা

নিজেদেরকেই অবহিত করতাম তখন চালের দাম ও সোনার দাম-এসব ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমের তারতম্যের হিসাব রাখতাম মনে মনে। কিন্তু একটা তারতম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে হল পূর্ব ও পশ্চিম মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের হেরফের। বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাপকাঠিতে পাকিস্তানের স্থান ছিল দুনিয়ার মধ্যে প্রায় নিম্নতম। আর সেই পাকিস্তানে একজন পূর্ব পাকিস্তানীর তুলনায় একজন পশ্চিম পাকিস্তানী ১৯ গুণ অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহার করতো ১৯৭০ সালে। পূর্ব পাকিস্তানের দুর্বলতার ও পরাধীনতার সত্য ঐ বিদ্যুৎশক্তিহীনতার মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থিত ছিল। স্বাধীনতার পরে শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে বরঞ্চ।

আরো একটা বিষয় আছে বিবেচনার। এই যে যৎসামান্য শক্তি ব্যবহৃত হত তার কত অংশ কি কাজে খাটছে সেটাও জানতে হয়। যেমন, ১৯৭০-এর তথ্যানুযায়ী মোট ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা এক ভাগও প্রয়োগ করা হয়নি কৃষিক্ষেত্রে। কৃষি আমাদের প্রধান নির্ভর, এবং হবার কথা প্রধান শিল্প। সেখানে শক্তি নেই, সেখানে আমরা চলি গরুর শক্তিতে, অর্থাৎ কিনা চলিই না বলতে গেলে। বিদ্যুৎশক্তির সবচেয়ে অধিক ব্যবহার ঘটছে গৃহস্থালিতে, তার পরিমাণ শতকরা সাতাত্তর ভাগ। অর্থাৎ অপব্যয় ঘটছে বিদ্যুতের—বিলাসে, আয়াসে, প্রদর্শনীতে। সমস্ত দেশ গভীরতম অন্ধকারে নিমজ্জিত, আলো এসে জমেছে অতিক্ষুদ্র এলাকায়। প্রদর্শনী চলেছে উৎপাদন থামিয়ে। যে সমস্ত দেশ উন্নত শিল্পের দিক দিয়ে, গৃহস্থালির কাজে তারা শক্তি ব্যয় করে সবচেয়ে কম। ঘোড়া-রোগ গরীবদেরই হয়।

ঠিক তেমনি ঘটনা, সমান্তরাল ঘটনা, দেখা যাবে গ্রন্থজগতে। গ্রন্থের প্রকাশ ঐ বিদ্যুৎ ব্যবহারের মতই নগণ্য, আর তার চেয়েও যা মর্মান্তিক তা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য বিদ্যুৎশক্তির মতই অপ্রতুল প্রকাশ সামগ্রীর ব্যাপক অপব্যয়। শুধু নিম্নমানের নয়, অপুষ্টিকর বইয়ের জঞ্জাল ছেপে কাগজ, কালি, ছাপা ও বইয়ের বাঁধাইয়ের সমুদয় সামগ্রীর যে-ব্যাপক অপব্যবহার চলছে দেশে তাতে শুধু যে অপচয় ঘটছে সম্পদের তা-ই নয়, অনিষ্ট ঘটছে ভাল বইয়ের, এবং পরিণামে ক্ষতি হচ্ছে জাতীয় স্বাস্থ্যের। দুষ্ট গরুর তুলনায় শূন্য গোয়াল গ্রন্থজগতে যত বাঞ্ছনীয় তত বোধ হয় অন্য কোথাও নয়। কৃষি নিয়ে অনেক সময় আমরা অনেক কথা বলি, কিন্তু আমাদের মূল গৌরব, সংগত কারণেই, সাহিত্য নিয়ে। এবং সাহিত্যের দশা কৃষির দশা থেকে স্বতন্ত্র নয় কোন প্রকারেই।

গ্রন্থ শুধু শক্তিই দেয় না, গ্রন্থ ঘটায় যোগাযোগও—মানুষের সঙ্গে মানুষের, মনের সঙ্গে মনের। সেই যোগাযোগ শক্তি আছে, ঐক্যের বিশ্রুতখ্যাতি শক্তি। যেমন আমাদের যানবাহন নেই প্রচুর, যেটুকু আছে তাও টিকিয়ে রাখা, চালু রাখা কষ্ট এবং যেটুকু আছে তার একটা বড় ভাগ অপব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তিগত বিলাসে—ঠিক তেমনি ঘটনা দেখছি বইয়ের ক্ষেত্রেও। উপকরণ অত্যন্ত সামান্য, যেটুকু আছে তারও ব্যবহার হচ্ছে না যথাযথ। মানুষে-মানুষে যোগাযোগ গড়ে তুলবার ভিন্নতর মাধ্যমগুলো কাজ যা-ই করুক যথার্থ ঐক্য সৃষ্টি করে যৎসামান্য, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের শোরগোল যতটা আছে আসল কাজ ততটা নেই। ফলে অনৈক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে আসলে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এবং প্রত্যেকে সকলের বিরুদ্ধে এই আদিম অবস্থার দিকে একটা ধাবমানতাই সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে। সমাজতন্ত্র ঐক্যের দর্শন, ঐক্য ভিন্ন সমাজতন্ত্র আসবে না, সমাজতন্ত্র না এলে অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে না মানুষের। কিছুতেই না।

বলা হয়েছে, বইয়ের প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের প্রয়োজনের চেয়ে কম নয়। প্রকৃতপক্ষে এমনকি ভাত-কাপড়ের চেয়েও অধিক মূল্যবান সদ্‌গ্রন্থ—ব্যক্তির জীবনের নয় হয়ত, কিন্তু সমাজের জীবনে অবশ্যি। কেননা সদ্‌গ্রন্থের সম্পর্ক অত্যাবশ্যকীয় ভাত-কাপড়ের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে। এমন গ্রন্থ আছে যা মানুষকে অলস করে বলে মনে হয় বাইরে থেকে দেখলে, কিন্তু সেই আপাত-আলস্য-সৃজনকারী গ্রন্থও মানুষকে সুস্থ রাখে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপরই নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত। উৎপাদনের জন্য কায়িক শক্তির তুলনায় অধিক প্রয়োজন মানসিক শক্তি—আগ্রহ ও উদ্দীপনা, বুদ্ধি ও উদ্ভাবনা। উৎপাদনব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন করতে হলে বৈপ্লবিক সামাজিক শক্তি আবশ্যক, এই শক্তি সৃষ্টিতে গ্রন্থ নিতে পারে অত্যন্ত বৃহৎ ও কার্যকর একটা ভূমিকা। গ্রন্থের বৈপ্লবিক শক্তি জানা ছিল বলেই ফ্যাসিজমের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা গ্রন্থকে ভয় করেছে, হিটলার বহ্ন্যুৎসব করেছে গ্রন্থের, তাঁর অনেক আগে প্লেটো নির্বাসন চেয়েছেন সাহিত্যিকদের। গ্রন্থে বুদ্ধি থাকে, থাকে আবেগ, আর থাকে এক করবার ক্ষমতা বুদ্ধি ও আবেগকে।

শক্তি যদি বৃদ্ধি না পায়, উৎকর্ষ না ঘটে যোগাযোগ ব্যবস্থায়, উদ্‌বোধিত ও উৎসাহিত না হয় সামাজিক ও সমবায়ী সৃজন-শক্তি, তা হলে

দেশের উন্নতি হচ্ছে বা হবে এমন অলীক কথায় বিশ্বাস করবে কে? বই নেই অথচ উন্নতি আছে এমনটা সম্ভব নয়। বিশেষ করে তথাকথিত অনুন্নত দেশে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে গ্রন্থের অবদান বুনিয়াদী।

২

লেখক যে লেখেন তা প্রকাশের জন্যই। তিনি ফুল নন যে শুধু ফুটেই সন্তুষ্ট হবেন, পাখি নন যে শুধু গেয়েই হবেন সুখী। এমন কি যে লেখক লুকিয়ে রাখেন লেখা তাঁর মনের মধ্যেও গোপন প্রত্যাশা থাকে একদিন প্রকাশ পাবে এই বই, জানবে তাঁকে সকলে। আত্মপ্রকাশের অনিবার্যতা থেকেই লেখার উদ্ভব। অন্যদিকে প্রকাশকের পেশা বই প্রকাশ করা, প্রকাশ যতক্ষণ করছেনই ততক্ষণই তিনি প্রকাশক, যেমন বই পড়েন বলেই পাঠক একজন পাঠক। বইয়ের সূত্রে এই তিনজন একত্র হন। পাঠক লেখক সৃষ্টি করেন এই কথায় নিশ্চয় সত্য আছে। কিন্তু অধিক-তর সত্য বরং এই কথা, লেখকই সৃষ্টি করেন তাঁর পাঠক, সেই যে সৃজন-ক্ষমতা ও সৃজ্যমানতা তাতেই তাঁর শক্তির পরীক্ষা এবং সার্থকতা। কিন্তু লেখক পাঠকের কাছে যেতে পারেন না সরাসরি, তাঁর মাধ্যম প্রয়োজন, প্রয়োজন প্রকাশকের।

আমাদের দেশে প্রকাশকরা উৎসাহী নন, তারা ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক, তাঁরা দ্রুত লাভ চান, লেখকের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সহযোগিতার নয়, ব্যবসায়ীর—এ সকল অভিযোগ আছে, এবং অভিযোগগুলো অবশ্যই অভিজ্ঞতালব্ধ। প্রকাশকদের এই অযোগ্য ও নিন্দার্হ মনোভঙ্গির পেছনকার কারণগুলোও অপরিচিত নয়—পুঁজি অপ্রতুল, বিতরণ ব্যবস্থা প্রায় অকেজো, এবং উপকরণসমূহ দুষ্প্রাপ্য—এ সবের উল্লেখ প্রকাশকরা করবেন, এবং তাঁদের বক্তব্যও বুঝতে হবে।

কিন্তু লেখকেরা কি করবেন এই পরিস্থিতিতে? তাঁরা কি উদ্যম নেবেন প্রকাশের? সমবায় গড়ে তুলবেন সম্মিলিত শ্রমে, যেমন কেউ কেউ বলেছেন? আমি নিজে উৎসাহী নই সমবায় বিষয়ে। সমবায় শুনতে ভালো শোনায়, আকর্ষণীয় মনে হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সফল হয় না, বাস্তব অভিজ্ঞতা এই কথাই জোরের সঙ্গে বলছে। পুস্তকের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যর্থ হবে বলে অনুমান করা যায়, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়েছে।

দেখা যাবে সমবায় যাঁরা গড়ছেন তাঁরা সময় ও প্রতিভা নষ্ট করছেন অনভ্যস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, লাভ হচ্ছে না বই বিক্রি করে, সন্দেহ বাড়ছে, পরস্পরের প্রতি, সৃজনক্ষমতার প্রতিযোগিতার সঙ্গে আবার যুক্ত হচ্ছে অবিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠবে বিদ্বেষ, উদ্যম ভেঙে পড়বে, আসবে হতাশাবোধ, ঘটবে পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব।

গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে সরকারের স্পষ্ট ভূমিকা আছে। আমাদের অধিকাংশ লেখকই সরকারী কর্মচারী, এবং সরকার নিয়ম করেছেন লেখা ছাপতে হলে নিজ নিজ উপরওয়ালার অনুমতি নিতে হবে আগে। পাকিস্তান আমলের প্রায় সর্বজন-নিন্দিত আট-ঘাটকেও ছাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে। অথচ পাকিস্তানের কালটা ছিল গোলামির কাল, স্বাধীনতা এল তবু গোলামি ঘুচল না লেখকের। এই ব্যবস্থা মর্মান্তিক। লেখকের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক লিখবার, গণতন্ত্রের দাবি সেটা, সমাজতন্ত্রের অনুরোধও তাই। স্বাধীন দেশে আমরা বন্দী লেখক চাই না, চাই স্বাধীন লেখক। লেখকের মুক্তি লেখকের জন্য যত না আবশ্যক, তার চেয়ে বেশী অপরিহার্য সমাজের জন্য। লেখকের জন্য আদালত থাকবে একটাই —জনতার আদালত।

কিন্তু শুধু নিষিদ্ধ করেই যে স্বাধীনতা খর্ব করা যায় লেখকের তা নয়। নিষিদ্ধ করলে অনেক সময় বরং বইয়ের কাটতি বাড়ে। যেমন, বেড়েছিল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র, বেড়েছিল নজরুল ইসলামের অনেক বইয়ের। 'পথের দাবী' এক সময়ে হাতে লিখেও প্রচার হয়েছে, এক কপির দাম উঠেছে ১০০ টাকা পর্যন্ত। সেই যুগে। নজরুল ইসলামের নিষিদ্ধ কবিতার বই ফিরি করেছেন রাজনীতির কর্মীরা। সরাসরি নিষিদ্ধ করার চেয়েও বেশী ক্ষতিকর হচ্ছে প্রকাশনা শিল্পের উৎপাদন-উপকরণসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা ও অত্যধিক মূল্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে গোপন কিন্তু কঠিন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু রাখা। কেননা এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায় না, জোরের সঙ্গে, অতি উচ্চকণ্ঠে, পুস্তক নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে যেমন করা যায়।

এই মারাত্মক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তার ক্ষতিকর কাজ করে চলেছে বাংলাদেশে। সরকারের এগিয়ে আসা প্রয়োজন অবিলম্বে। কিন্তু কিভাবে আসবেন সরকার? কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, সরকার সরাসরি প্রকাশ করুন গ্রন্থ। আমি এই প্রস্তাবের বিরোধী। শিল্প-সংস্কৃতির সরকারী পৃষ্ঠপোষণ-প্রচেষ্টাসমূহের ব্যর্থতা ও ক্ষতি এত বেশী জলজল করছে

সামনে ও পেছনে যে সেই জাজ্বল্যমানতাই আমাকে সন্ত্রস্ত করে, আমি উৎসাহী হতে পারি না চেষ্টা করেও। 'মাহে-নও' বা বি-এন-আর যদি আবার ফিরে আসে নতুন বেশে তবে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই দাবি উঠবে তাদের প্রত্যাহারের। শুধু যে অপব্যয় ঘটবে জাতীয় সম্পদের তা-ই নয়, দুষ্ট মুদ্রা উদ্যত হবে নষ্ট করে দিতে উৎকৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন। বি-এন-আর থেকে লাভ হয়েছে যেটুকু সেটুকু তার ছদ্মবেশ, অন্তরালে অপচয় ও ক্ষতির অত্যন্ত বড় একটা ইতিহাস আছে লুকিয়ে। লেখক ধরার নতুন ফাঁদ দাবি করাটাকে শুভবুদ্ধির পরিচায়ক বলি কি করে?

না, সরকারী প্রকাশনা চাই না, সরকারী সমর্থন চাই। সেই সমর্থন পুরস্কারের আকারে আসাটা অসমর্থনীয়, কেননা তা অবাঞ্ছিত, লেখকের পুরস্কার তার গ্রন্থের প্রকাশ, বিক্রয় ও সমাদর, অন্য সকল পুরস্কার গৌণ, অথবা ততটাই উপকারী যতটা বইয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে তারা সহায়ক। কিন্তু অবাঞ্ছিত তারা এই জন্য যে, পুরস্কার ফাঁদ হতে পারে বিবেকের, হয়তো-বা ফাঁসও। সরকার অর্থানুকূল্য দিতে পারেন প্রকাশনা শিল্পকে। উপাদান-উপকরণের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। বিনিময়ের মাধ্যমে পারেন পশ্চিম বঙ্গে বাজার সৃষ্টি করতে। সর্বোপরি পারেন বই কিনে দেশের পাঠাগারগুলোতে পাঠাতে। প্রান্তে-প্রত্যন্তে নতুন নতুন পাঠাগার দরকার, সরকার পারেন একই সঙ্গে পাঠাগার ও লেখককে সাহায্য করতে, বই কিনে দিয়ে,—সব বই, কারো কারো বই নয়, কোন কোন বই নয়। পাঠাগারগুলি শক্তি-কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে, বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের মত, পারে যোগাযোগের কেন্দ্র হতে কম্যুনিটি-সেণ্টারের চেয়ে অনেক গভীর অর্থে।

দেশের সংবাদ-পত্রসমূহের একটা ভূমিকা থাকবার কথা। এ-কথা মোটেই অযথার্থ নয় যে, বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশনা একটা ইভেণ্ট, সংবাদপত্র পারে এই ইভেণ্ট সকলকে জ্ঞাত করাতে, যেমন করে তারা জ্ঞাত করায় অন্য সব ইভেণ্ট। নিয়মিত পুস্তকসমালোচনা এবং সুলভে পুস্তকের বিজ্ঞাপন-প্রকাশের ব্যবস্থা করলেও সাহায্য করা এবং উৎসাহ দেওয়া হবে গ্রন্থ প্রকাশককে।

সমস্যাটি কি আমাদের অজানা নয়, অজানা নয় সমাধান, কিন্তু সমাধানের ক্ষমতা নেই, সমাধান আছে যাঁদের হাতে তাঁরা কি করবেন, কতটা তৎপর হবেন সেটা জানা নেই। আশঙ্কা সেইখানে, সেই অনিশ্চয়তাতে। লেখকের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা নয়, জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালী সমাজ

অনেক সময় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ লোক ছিলেন না অতিশয় দীনহীন এই বাংলাদেশের। পৌরুষে-প্রাণে, স্বভাবে-আচরণে, উদ্যম-উদ্ভাবনায় একক তিনি, একাকীও; তাঁর সঙ্গে এ-দেশের আর-পাঁচটি খর্বাকৃতি বস্তুর সাদৃশ্য নেই। মনে হয় অনেক উর্ধ্বে তিনি, এসেছেন ব্যত্যয় হিসেবে, অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার মত আকস্মিকতায়, অপ্রত্যাশিতরূপে।

কিন্তু তবু এই দেশেরই মানুষই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বাঙালীই ছিলেন, —ব্যক্তিজীবনে এবং ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় যদ্দ্বারা সেই সমাজজীবনে।

তাঁকে বলা হয়েছে বিশ্বকবি। নির্বিশেষ সর্বজনীনতা অবশ্যই আছে রবীন্দ্রনাথে, কিন্তু তাঁর বিশেষ পরিচয়, একান্ত ও অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর বাঙালীত্বের মধ্যেই। রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বভাব ও ঝোঁক তাঁর বাঙালীত্ব দ্বারাই অনিবার্য ও স্বাভাবিকরূপে প্রভাবিত, এবং সেই প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। বাঙলা ভাষায় তিনি শ্রেষ্ঠতম লেখক; ভাষার তিমি দাস ছিলেন না, ভাষা তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল—একথায় অসত্য নেই যদিও, তবু ভাষার যে-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তা অবজ্ঞেয় নয়, এ সেই ক্ষমতা শ্রেষ্ঠতম লেখকের ক্ষেত্রেও যা অপরিহার্য রূপে কার্যকর। কিন্তু আরো বড় সত্য আছে, একটি প্রধান সত্য, এমন-কি হতে পারে প্রধানতম সত্য। সে হচ্ছে এই ঘটনা যে, রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডির লেখক ছিলেন না, লেখক ছিলেন মহাকাব্যের। তাঁর অলৌকিক প্রতিভা ট্র্যাজিডির দিকে ঝুঁকে পড়েনি, ঝুঁকেছিল মহাকাব্যের দিকে।

ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়। তাঁকে সিদ্ধান্ত করতে হয়নি যে, তিনি ট্র্যাজেডির লেখক হবেন নাকি লেখক হবেন মহাকাব্যের। এই সিদ্ধান্ত এসেছে তাঁর নিয়ামক বাঙালীত্ব থেকে।

মহাকাব্য স্থানকে যত গুরুত্ব দেয় ট্র্যাজেডি তত দেয় না। সর্বজনীন হয়েও মহাকাব্য বিশেষ দেশের ও দেশান্তর্গত কালের। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশেরই মানুষ—দেশের অতীত ও বর্তমানের।

কিন্তু সে-কথা আমরা বিশেষভাবে ভাবছি না এখানে। বিশেষভাবে ভাববার কথা এটি যে, ট্র্যাজেডির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে অপক্ষপাত তাতে তাঁর বাঙালীত্বই প্রতিফলিত। বাঙালীর জীবনে নাটক অল্প, ট্র্যাজেডি স্বল্পতর। দুঃখ ও পীড়া বাঙালীর জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক বস্তু, কিন্তু যে দুঃসাহস, অশুভের সঙ্গে সংগ্রামে যে দৃঢ়তা থাকলে দুঃখ ও পীড়া ট্র্যাজেডিতে উত্তীর্ণ হয় অভাব তার, সেই প্রচণ্ড সাহসের, সেই অনমনীয় দৃঢ়তার। এই কারণে একদিকে যেমন তুষ্টি আসে সহজে অন্যদিকে তেমনি সন্ধি ও সহযোগিতাই প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়ায়। অশুভ অবশ্যই আছে, জানি সে আছে, তবু তাকে জানতে চাই না সম্পূর্ণরূপে, চিনতে চাই না পরিপূর্ণ পরিচয়ে, কেননা ভয় আছে দ্বন্দ্বে। সম্মুখ মুখোমুখিতে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অশুভ আছে, কিন্তু তাঁর চিত্রকলাতে যেমন আছে সাহিত্যে তেমন নেই। সাহিত্যে সে প্রায়ই অবগুণ্ঠিত, অনেক সময়ে কুণ্ঠিত, এবং যখন প্রকাশিত, যেমন 'শিশুতীর্থ', তখন শুভজন্মের জয়ধ্বনি দ্বারা বিধৌত। ভয়ঙ্করও সুন্দর হয়ে আসে তাঁর জগতে, যেমন এসেছে রাণী সুদর্শনার কাছে। অশুভ চরম নয় কোথাও, শেষ কথাও নয় কোন রচনায়। হৃদয়-হীন ও নিতান্ত পামর ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেননি, যেমন কি না অন্য লেখকরাও সৃষ্টি করেননি বাঙলা সাহিত্যে। মানুষের প্রবৃত্তিকে চিত্রিত করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে। তুলনাবিহীন পাশবিক অন্ধকারের চিত্র আছে 'চতুরঙ্গে'। কিন্তু সে প্রবৃত্তি মানবিকই, সে অশুভ নয় আধিদৈবিক। কোন বিবেচনাতেই পাপ না; পদস্খলনের সম্ভাবনা শুধু। বিপরীত পক্ষে সে ব্যাধিও নয় সমাজের।

জীবনে দুর্ভোগ এত বেশী রূঢ় যে আমরা নতুন করে দুর্ভোগকে দেখতে চাই না সাহিত্যে। আমরা পালাতে চাই। সস্তা চলচ্চিত্র, চটুল গান, যৌন মাসিক—এসব বস্তু মধ্যবিত্ত বাঙালীর পলায়ন-কেন্দ্র। সাহিত্যেও তাই আছে, পলায়নের আকাঙ্ক্ষা আছে, খুব বড় করে লেখা। আধ্যাত্মিকতাও পলায়নের বাসনা থেকেই উদ্ভূত। সেখানে, আধ্যাত্মিক চিন্তায়, আত্মার সদগতি কামনা নেই, দৈহিক সুখের গোপন ও ভীরু লালসা আছে বড় হয়ে। নাটক যে আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বলতম অংশ নয় তার কারণ অবশ্যই দ্বন্দ্ব-ভীরুতা।

(নাটকের জন্য মঞ্চ চাই, নাটক দেখতে যাওয়ার সুযোগ চাই, অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য চাই এক প্রকারের, সেই স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব যে আছে

জীবনে আমাদের তারও কারণ ঐ দ্বন্দ্ব-ভীরুতা)। রবীন্দ্রনাথের সফলতা নাটকেই সর্বাপেক্ষা স্বল্প। কেননা তাঁর নাটকে শুভের জয় পূর্বনির্ধারিত। আর তাঁর পাঠকও ট্র্যাজেডি চায়নি পড়তে, চেয়েছে রূপকথা—যা নাকি পুরস্কারে ও তিরস্কারে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের তাই ট্র্যাজেডি লিখবার কথা নয়—তিনি বাঙালী বলে। সেটা তাঁর দুর্বলতা নয়, সেটা তার প্রতিভার নিজস্ব স্বভাব। কোন রূপ-কল্পে লিখছেন লেখক তা দিয়ে তাঁর বিচার হয় না, বিচার হয় লেখার শিল্পমূল্য দিয়ে, তার শিল্পগত উৎকর্ষ দিয়ে। তদুপরি রূপকল্প হিসেবেও মহাকাব্য যে ট্র্যাজেডির পশ্চাদবর্তী এমন কথাও জোর দিয়ে বলবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথ একবারই লিখেছেন, 'গোরা'তে। তখন উদ্দীপনা ছিল সমগ্র দেশে, ঐক্য ছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। সেই ঐক্য ও উদ্দীপনা একটা বড় বস্তু, তেমন বস্তু যার অভাব ঘটলে মহাকাব্য রচনা হয় না। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন একই সঙ্গে ঐক্য ও উদ্দীপনা এনেছিল এই দেশে, অন্তত দেশের সেই অংশে যে অংশে সামাজিক অবস্থান ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু পরে উদ্দীপনার অবসান ঘটেছে, ঐক্যও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দো-লনে নেতিবাচক শক্তিই ছিল প্রধান, যখন তার লক্ষ্য অর্জিত হল তখন অবসানের ক্লান্তিতে জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ যতটা দ্রুত বিস্তারশীল হয়ে উঠল তত দ্রুত তার বিস্তার বোধ হয় আগে কখনো হয়নি। আপস-পন্থীরা একদিকে গেলেন, সন্ত্রাসবাদীরা অন্যদিকে। প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত হিন্দুর স্বার্থ এবং উন্মেষকামী মধ্যবিত্ত মুসলিম স্বার্থে সংঘাত হয়ে দাঁড়াল অপরিহার্য। গ্রাম ও শহরের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেল ক্রমশ। নতুন কোন 'গোরা' লেখা আর সম্ভব হল না রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য শিল্পীর পক্ষেও। সেই পথে আর গেলেন না তিনি, অসামান্য বলেই গেলেন না, সামান্য হলে, কায়কোবাদ হলে, যেতেন হয়ত এবং ব্যর্থ হতেন দৃষ্টিকটুরূপে। কেননা মহাকাব্য মহাকাব্যের নিজস্ব পটভূমি ছাড়া রচিত হয়নি কখনো, হতে পারে না কিছুতেই। অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি ছিল রবীন্দ্রনাথের, তাই খণ্ড কবিতা লিখেছেন অজস্র, ছোটগল্প লিখেছেন বহু, উপন্যাস লিখেছেন অনেক ক'টি, কিন্তু মহাকাব্য আর লেখেননি, উদ্যমও নেননি লেখার। পরের উপন্যাসে বিশেষ শ্রেণীর কথা আছে, সমস্যা আছে বিশেষ বিশেষ, চমক আছে নতুনতর। কিন্তু 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে',

'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা'—সমগ্র দেশ এদের কোনটিতেই আসেনি, এমনকি 'যোগাযোগে'ও নয়। ছোটগল্পে তো আসবার কথাই ছিল না, কবিতাতে ততোধিক।

মহাকাব্যিক প্রতিভা মহাকাব্য আর দ্বিতীয়বার লিখলেন না, 'গোরা'কে ছাড়িয়ে গেল না সেই প্রতিভা যা নিজেকে নিজে অতিক্রম করেছে সমগ্র জীবন। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজে নন, কারণ বাঙালী জীবনের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা, নির্বেদ ও গ্লানি। যে ঐক্য ও উদ্দীপনা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন একদিন সম্ভব করে তুলেছিল বাংলাদেশে আবার তার উদ্ভব হতে পারত যদি সূচনা হত নতুনতর, প্রবলতর কোন আন্দোলনের। সে আন্দোলনকে অবশ্যই হতে হত সমাজতান্ত্রিক। কেননা অন্য কোন আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব হত না শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ঐক্য আনয়ন করা। ইংরেজ বিরোধিতা বঙ্গভঙ্গ-রদের পরবর্তী সময়ে এক পথে অগ্রসর হয়নি, নানা পথে গিয়েছে—অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল হয়নি বাংলাদেশে। হলেও তাতে রবীন্দ্রনাথের থাকবার কথা ছিল না, বিপ্লব-পরবর্তী রুশ দেশ ভ্রমণ সত্ত্বেও নয়। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন মানুষের প্রতি মানুষের অবিচারের বিরুদ্ধে, সভ্যতার গভীরে যে সঙ্কট তাকে প্রকটিত করেছেন লেখার মধ্য দিয়ে, কিন্তু সমস্ত বক্তব্য যে একত্র ও এক হয়ে বৃহৎ কোন রচনার আকার নেবে তা আর হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেষ্ঠতম বাঙালী সে এই দিক থেকেও যে বাঙালী জীবনের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে তিনি যেভাবে প্রতীয়মান করে তুলেছেন শুধু লিখে নয়, না-লিখেও তেমনটি অন্য কেউ পারেননি। পরবর্তীকালে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে আরো, পাবে যে তার লক্ষণ রবীন্দ্রনাথেই ছিল। অন্যদিকে আবার এটাও লক্ষ্য করা খুব সহজ যে 'গোরার' লেখক যখন 'শেষের কবিতা' লেখেন তখন যে তাঁর শক্তি বৈচিত্র্য ও সৃজন-বিপুলতাই শুধু প্রকাশ পায় তা-ই নয়, তদ্দ্বারা মহাকাব্যের অপস্রিয়মাণতাও প্রমাণিত হয়। বাক্যবীর অমিত রায় সেই অপস্রিয়মাণতারই প্রতিভূ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বড় লেখকেরা দুই শ্রেণীর, শেক্সপীয়রের মত নাটকীয়, অথবা টলস্টয়ের মত মহাকাব্যিক। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের লেখক তবু তিনি টলস্টয়ের মত নন সম্পূর্ণত। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা টলস্টয়ের নেই। দরিদ্র দেশে আধ্যাত্মিকতা না থাকলেই

নয়। জীবনে যে স্বপ্নের মত সমৃদ্ধ তার পক্ষে স্বপ্ন না দেখলেও চলে; কিন্তু দরিদ্র যে স্বপ্ন না-থাকলে তার জীবন থাকে না। বস্তুর অভাব ঘটলে আধ্যাত্মিকতার সুবিধা হয় বিশেষ রকমের। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই আধ্যাত্মিক ছিলেন না ঐ নোংরা বস্তুতান্ত্রিক অর্থে। তাঁর জীবনে বস্তুর অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর বাঙালী সত্তা, তাঁর সামাজিক ঐতিহাসিক চরিত্র যে তাঁকে অনিবার্য হাতে আধ্যাত্মিকতার পথানুসরণে বাধ্য করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমৃদ্ধ দেশে জন্ম গ্রহণ করলে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদী হতেন না। হয়ত হতেন বীরত্ববাদী, হয়ত বা বুদ্ধিবাদের প্রবক্তা।

বাঙালী জীবনে শ্রেণীভেদ ও সামন্তবাদী সংস্কৃতির অত্যন্ত গভীর অবস্থান জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে, বলা যায় বীরকে, গুরুত্ব দিয়েছে অত্যধিক, এবং সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে সুবিধা-ভোগী শ্রেণীর নেতৃত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে। এই মানসিকতা এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও অব্যাহতি দেয়নি। একদিকে তিনি মহাপুরুষের কথা বার বার বলেছেন, প্রতীক্ষা করেছেন মহামানবের, অন্যদিকে আবার একক উদ্যম নিয়েছেন স্থাপন করবেন আদর্শ খামার, আদর্শ বিদ্যালয়, আদর্শ সমবায় ও গ্রাম। মহামানবিক একক উদ্যমে একাকী হয়ে পড়েছেন, সফলতা আসেনি, নাড়া খায়নি সমাজ। নেতৃত্ব থেকেছে ব্যক্তির হাতে, ব্যক্তি উপচে শ্রেণীর হাতে কখনো কখনো—হয়ত বা, কিন্তু তার বাইরে কখনো যায়নি, যায়নি জনসাধারণের কাছে। এবং ব্যর্থতার কারণও এইখানেই ছিল, জনসাধারণের এই অংশ গ্রহণ না-করায়। রবীন্দ্রনাথের পরে সামন্তব্যবস্থা ক্রমশ ক্ষীণ হয়েছে। প্রবল হয়েছে মধ্যবিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন তিনি রোমান্টিক। "আমারে শুধাও যবে, 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?' / আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোমান্টিক' (নবজাতক)। আরো স্পষ্ট কথা আছে 'সানাই'য়ে: "এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমাণ্টিক"। গলিতেই বসবাস বাঙালীর তবু সে জন্ম রোমান্টিক। গলিকে গলি বলে মানে না, থেকে থেকে খোঁজে দক্ষিণের বাতাস, খোঁজে অলক্ষ্য আকাশ। ফলে গলি গলিই থেকে যায়, বদলায় না, বাতাস থাকে অবরুদ্ধ, আকাশ অলক্ষ্য; শুধু কল্পনা থাকে সজাগ। হরিপদ কেরানীরা আকবর বাদশার সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকে। 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ পল্লীর চিত্র দিয়েছেন এই রকম:

"যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলে-মেয়েরা এখানে-সেখানে জলে-কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্য কর্ম করে যায়—তখন সে দৃশ্য কোন মতেই ভালো লাগে না! ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলে-ওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়।" কিন্তু এই পল্লী ভিন্নতর হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়, তার বাস্তবতার জায়গায় জেগে উঠেছে কাব্যময়তা। "যেতে যেতে পথপাশে / পানা পুকুরের গন্ধ আসে / সেই গন্ধে পায় মন / বহুদিন রজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।"—এমন ক্ষেত্রে পানা পুকুরের দুর্গন্ধ সত্য নয়, সত্য অন্য-এক অনুভবের আনন্দ। বাস্তববিনাশী এই রোমান্টিসিজমের মধ্যে যে বাঙালীত্ব আছে তা রবীন্দ্রনাথেও ছিল।

২

রবীন্দ্রনাথের অনেক অসামান্য গুণ থেকে যদি কোন একটি মাত্র গুণকে বেছে নিতে হয় সর্বপ্রধান বলে তবে তা বোধহয় হবে তাঁর অলোক-সামান্য প্রাণশক্তি। এই শক্তির কথা তিনি বারংবার বলেছেন তাঁর লেখায়। এবং সুদীর্ঘ আশী বছরের জীবনে তাঁর সকল রচনায়, হোক সে 'গোরা'র মত দীর্ঘ উপন্যাস, নয়ত 'লেখন'-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, সর্বত্র প্রাণের প্রবাহ পরিব্যাপ্ত। এই প্রাণশক্তি কল্পনাকে মিলিয়েছে যুক্তির সঙ্গে, গাম্ভীর্যকে সঙ্গী করেছে পরিহাসপ্রিয়তার, সৃষ্টি করেছে বৈচিত্র্যের ও মৌলিকতার। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, যেন গ্রীক পুরাকাহিনীর সেই বাদ্যযন্ত্র তিনি, বাতাসের কম্পনে গান করে ওঠেন। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা কখনোই দূরে রাখেনি অশান্ত পরিশীলন-ব্যগ্রতাকে।

তবু, এসব কথা একে একে বলার পরেও, বলতে হয় যে, প্রাণশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অবকাশবিহীন অগ্রসরমানতায়। বলেছেন তিনি, "আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক।" পর্বত নন,

যদিও পর্বতের মতই দৃঢ় ও দীর্ঘ; বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ নন, যদিও চলমানতা তাঁর সমগ্র সত্তায়। যেন তীর্থযাত্রী তিনি, সম্মুখবর্তী তীর্থের। সিপাহী বিদ্রোহের চার বছর পরে যাঁর জন্ম, তিনি জীবিত ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত। এই দীর্ঘসময়কালের সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোন-না-কোন যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সেই ঘটনার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেছেন তিনি, নিজের পথ ধরে। নিজেকে তিনি বলেছেন ঘরকুণো, কিন্তু তাঁর মত বিশ্বভ্রমণ তাঁর দেশের আর কেউ করেননি, দেহে যত-না করেছেন তারও বেশী মনে।

প্রাণের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক দ্বিমুখী। মৈত্রীর একদিক দিয়ে, অন্যদিকে দ্বন্দ্বের। প্রাণের পক্ষে বস্তুর অবলম্বন আবশ্যক। কিন্তু বস্তু যেখানে স্তূপ হয়ে ওঠে প্রাণ সেখানে নিহত হতে পারে তার চাপে। রবীন্দ্রনাথের গৃহে ও পরিবারে বস্তুর অভাব ছিল না, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন না তিনি। বস্তুর অবলম্বন গ্রহণ করেছেন, না-করলে অতবড় কবি হতে পারতেন না, কিন্তু বস্তুকে ছাড়িয়ে উঠেছেন সব সময়ে। 'রাজসিংহ' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে, সে উপন্যাসের জগতে ভার নাই, "আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে।" অন্যদিকে, "আজকালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর।" বস্তুর ভারবাহী ছিলেন না তিনি—জীবনেও নয়, সাহিত্যেও নয়। প্রমথ চৌধুরী যখন দুঃখ করে বলেন, "অন্নদামঙ্গল আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে মেঘনাদ-বধ", তখন বুঝা যায় তিনি সাহিত্যের সত্য ও বস্তুর সত্যকে আলাদা করে দেখছেন না, অন্নদামঙ্গলের চেয়ে মেঘনাদবধ যদি অধিক প্রিয় হয় পাঠকের তবে সে বস্তুর আবেদনে নয়, মেঘনাদবধের অন্তর্নিহিত প্রাণসম্পদের আবেদনে।

বস্তুকে রবীন্দ্রনাথ ভয় করেছেন। যেমন তিনি ভয় করেছেন মৃত্যুকে। সেই জন্য বস্তুর সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন করতে চেয়েছেন অনেক সময়, যেমন চেয়েছেন মৃত্যুর সঙ্গে। "যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান দিতে পেরেছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়ে উঠত।" কিন্তু বস্তুর অভাব যে-দেশের প্রধান সত্য, দরিদ্র যে দেশ অসম্ভব রকম, সেখানে প্রাণ বস্তুর সঙ্গে মৈত্রী করে প্রাণবন্ত হতে পারে না, বস্তুর সঙ্গে বিরোধিতাই তার একমাত্র পথ, বস্তুকে জয় করে তবেই সে জীবন্ত হয়ে

উঠতে পারে যথার্থ অর্থে। সেই দ্বন্দ্বের শিক্ষাই প্রয়োজন ছিল বাঙালী সমাজের। এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভয় করেছেন বস্তুতান্ত্রিক যন্ত্রকে। বস্তুর মত, যন্ত্রকেও ভয় করবার কথা যন্ত্র যদি অত্যন্ত প্রবল ভাবে থাকে তবেই। যে দেশে তাঁর জন্ম সে দেশে বস্তুর প্রাচুর্য আছে এমন বলা যাবে না; অসম্ভব দরিদ্র সে দেশ, দরিদ্রতমদের অন্যতম। সেখানে যন্ত্র প্রায় নেইই, রবীন্দ্রনাথের কালে কম ছিল আরো। বাংলাদেশের যান্ত্রিকতা যন্ত্রসৃষ্ট নয়, যন্ত্রের অভাব দ্বারা সৃষ্ট। সমস্ত দেশ প্রকাণ্ড একটা স্তূপের মত পড়ে আছে, নিশ্চুপ হয়ে, মাঝে মাঝে চেষ্টা হয়েছে জাগাবার। লেখকরা চেষ্টা করেছেন—মনে করেছেন তাঁরা, নিজেরা চেষ্টা করছেন জাগাবার; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের অভীপ্সিত জাগরণ আসলে ছিল আরেক ঘুমের প্রস্তুতি, এক ঘুম থেকে অন্য এক ঘুমে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁরা। রাজনীতিকেরা চেষ্টা করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথে, কিন্তু জাগরণ ঘটেনি। জাগতিক বস্তুর অভাব-পীড়িত দেশে রবীন্দ্রনাথ বস্তুকে উপেক্ষা করার কথা বলে নিজের মনীষার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন, কিন্তু অভাব মেটাবার কাজে দেশবাসীকে কাঙ্ক্ষিত সহায়তা দান করতে পারেননি। কাঙ্ক্ষিত বললাম এই জন্য যে, তাঁর ভূমিকা শুধু কবির ছিল না, ছিল শিক্ষাগুরুরও। যন্ত্রকে সন্দেহ করা তাঁর নিজের পথে অহেতুক নয়, কেননা তিনি যান্ত্রিকতা-বিরোধী, কিন্তু অন্য যে যান্ত্রিকতা সৃষ্টি হয় যন্ত্রের অভাব থেকে তার পক্ষে যন্ত্র শত্রুতো নয়ই, মিত্র বটে। বস্তু ও যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ভয়টা ছিল ধনীর, অভিজাতের, কিন্তু সেই ভয় তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যেও। আমাদের পক্ষে বস্তুকে নয়, আসলে ভয় করার কথা ছিল বস্তুহীনতাকে, যন্ত্রকে নয়, যন্ত্রহীনতাকে। তা হয়নি, হয়নি লেখকদের কারণে (যাঁরা আবার দার্শনিকও)। অসাধারণ লেখক রবীন্দ্রনাথ সাধারণ এখানে।

প্রাণের প্রকাশ সর্বত্র এক প্রকারের হয় না—হতেই পারে না, তা নিয়মবিরুদ্ধ। প্রাণ থাকে বিদ্রোহে, যেমন থাকে কর্মযোগে। যেমন ছিল বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, নজরুল ইসলামে এবং সন্ত্রাসবাদী কৃষক ও তরুণদের বিদ্রোহী উদ্যমে। অন্যদিকে ছিল রামমোহনের ও বঙ্কিম-চন্দ্রের নির্মাণ-কুশলতায়। রবীন্দ্রনাথ শুধু বিদ্রোহী নন, কর্মীও নন শুধু—যদিও বিদ্রোহ ও কর্ম উভয়ই ছিল তাঁর মধ্যে; তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি সৃষ্টিকারী, নির্মাণের তুলনায় সৃষ্টি করেছেন অধিক, যে সৃষ্টি বিদ্রোহ এক প্রকারের।

নদীর কথা বার বার এসেছে, তাঁর রচনায়। সেই নদীর মতই তিনি —নিরন্তর প্রবহমান, কিন্তু প্রমত্তা নন, পদ্মা যেমন অনেক সময়। সেই পদ্মা তিনি জনপদকে যা স্পর্শ করে কিন্তু জনপদে হারিয়ে যায় না, বজায় রাখে প্রবহমানতা ও নিজস্বতা। এই যে এসেছেন জনপদবাসীর নিকটে, প্রবেশ করেছেন সমাজের অভ্যন্তরে, সমস্যার বাঁকে—সেজন্যই প্রত্যাশা জেগেছে মানুষের তিনি দেবেন বাণী, জাগরণের। এবং বাণী অবশ্যই আছে রবীন্দ্রনাথে। তিনি বলেছেন, "আমার প্রধান সার্থকতা সবকিছু প্রকাশ করা—বাণীর দ্বারা করেছি, কর্মের দ্বারাও করেছি।" এমন সার্থকতা, বলাবাহুল্য, অন্যকারো জীবনে আসেনি এদেশে। কিন্তু—অনিবার্য ঝগড়াটা কিন্তু—এখানে যে, এই বাণীর প্রকাশে যতটা অভিনবত্ব আছে, চরিত্রে ততটা নেই। এর মূল সুর সনাতন ভক্তির, এর মূল উপাদান প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা তথা ভাববাদ। বস্তু ও যন্ত্রকে জয় না করে তাদের অবিশ্বাস করা কোন বহিরারোপিত ব্যাপার নয় এই মহামানবে, এই অবিশ্বাস ভাববাদেরই একটি স্বাভাবিক প্রকাশ এখানে যে, পরিবর্তনের বস্তুগত ভিত্তি থেকে অর্থাৎ সমাজের সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রদবদলের প্রসঙ্গ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তিনি বেশীর ভাগ সময়ে। জড়পিণ্ড দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালোবাসার, সেজন্য অভিমানের কখনো কখনো —কিন্তু ঘৃণার নয়, যদিও ঘৃণার অভাব ভালোবাসার প্রতিকূল।

৩

একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাঁর গোরা ছিল। গোরা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। গোরার জন্য বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—এঁরা প্রার্থী হতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমনকি এক্ষেত্রেও অসমান, নিতান্তই। গোরার সেই তেজস্বিতা, অসন্তোষ, ভারতসন্ধান; সেই ভেঙে বের হয়ে যাওয়া সংস্কার ও সামান্যতার অবরোধ—সমস্ত কিছু রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের মধ্যেই আছে। নিজের নির্জনতাও নিজেই ভেঙেছেন তিনি, এগিয়ে গেছেন জনগোষ্ঠীর দিকে, সংঘশক্তির অভিমুখে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গোরা টলস্টয়ের পীয়ের নয়। 'যুদ্ধ ও শান্তি'র সেই নায়ক, যার মধ্যে টলস্টয় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেননি, দিয়েছেন একাংশকে, অন্য দুই অংশ রেখেছেন আঁদ্রে ও নিকোলাসের জন্য, সেই

নায়ক নায়কোচিত নয় অনেক সময়েই; স্থূল তার দেহ, অনিশ্চিত চলা-ফেরা। যাত্রী সে গোরার মতই, কিন্তু প্রতিপদক্ষেপে বিভ্রম ও যন্ত্রণা, ধাপে ধাপে বিপদ, নরক থেকে চলেছে দুঃখকে সঙ্গী করে। পীয়ের যেমন করে অশুভকে জেনেছে, মুখোমুখি হয়েছে তার সরাসরি, গোরাকে তেমন হতে হয়নি; আর রবীন্দ্রনাথ নিজে তেমন হতে সম্মত হননি। গোরায় অস্থি-রতা আছে, কিন্তু এমন দীর্ঘ ভ্রমণ নেই, যন্ত্রণা নেই তুলনীয়, অসম্মান নেই দুঃসহ। পীয়েরকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে স্তরে স্তরে, গোরা প্রস্তুত হচ্ছে একটা শেষ পরীক্ষার জন্য, যে-পরীক্ষা অন্যকিছু নয়, তার জন্ম-সূত্রের উদ্‌ঘাটন, যে ব্যাপারে তার দায়িত্ব নেই কোন। আর সেই পরীক্ষায় ভূমিকম্প হয়েছে বটে, কিন্তু পতন হয়নি; ছোট দেবতাকে হারিয়ে বৃহৎ, সর্বভারতীয়, দেবতা খুঁজে পেয়েছে গোরা, ভক্তির ও প্রণামের মৌলিক অভ্যাস ও আনুষ্ঠানিকতায় চিড় ধরেনি আদৌ। পীয়েরের জন্মসূত্রও অসামাজিক কিন্তু তা মেনে নেয়া হয়েছে সূচনাতেই, পীয়ের নিয়েছে, অন্যরাও নিয়েছে, তা নিয়ে প্রবল উপপ্লব নেই যা আছে গোরার জন্ম-রহস্য নিয়ে।

স্ৃষ্টির চাইতে অবশ্য স্রষ্টা বড়। গোরার চেয়ে অনেক বড় গোরার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। গোরায় সেই নম্রতার অভাব ছিল যা রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ওই কোমলতাকে বাড়িয়ে, ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরা হয়েছে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে। কোমলতার দিকটা অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও রোমান্টিকতার সঙ্গে যুক্ত, ভক্তির রসে আপ্লুত। তাঁর ভাষায়, রূপকল্পে, বিষয়ের উপস্থাপনায়, এবং সর্বোপরি তাঁর সঙ্গীতে একটা নম্রতা আছে, যা প্রাণশক্তির বিরোধী নয়, বরং বলা যায় পরি-পূরক। নম্রতার মধ্যেও তিনি দৃঢ়, কোথাও কোন শব্দে, উপমায় কি রূপকল্পে, চিন্তার বিস্তারে কি যুক্তির সংগঠনে শিথিলতার প্রশ্রয় দেননি। প্রকাশ প্রাণকে বেষ্টন করে রেখেছে। সংহত করেছে বটে কিন্তু ক্ষতি-গ্রস্ত করতে পারেনি আদৌ। এই দুইকে, শক্তি ও প্রকাশকে, একত্র করে দেখা আবশ্যক। আলাদা করলে তারা উভয়েই প্রাণ হারায়; শক্তি প্রকাশের সঙ্গে এবং প্রকাশ শক্তির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে যুক্ত।

কিন্তু প্রবণতা আছে রবীন্দ্রচর্চায় প্রকাশকে বড় করে দেখবার, তার মনোহারিত্বের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবার। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক বীরস্বভাব ছিল যার জন্য তিনি একাকী ছিলেন ভিড়ের

মধ্যে থেকেও, যার একটা চকিত নাটকীয় প্রকাশ দেখেছি জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সময়, সেটিকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থাকেন না।

কোমল রবীন্দ্রনাথকে খোঁজার প্রধান কারণ যারা খুঁজছেন তাঁদের মানসিকতা। রবীন্দ্রভক্ত মধ্যবিত্ত বস্তুকে ভালোবাসে, এবং প্রায়-নির্জীব বস্তুর মতই অন্যের মধ্যে প্রাণের দেখা পেলে হয় বিব্রত হয় নয়ত বিচলিত। মধ্যবিত্ত রবীন্দ্রনাথকে যত না ভালোবাসে তার চেয়ে বেশী ভালোবাসে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিকে, যে-মূর্তিকে তারা নিজেদের প্রয়োজন মত কাট-ছাট করে গড়ে নিয়েছে। মূর্তির এই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কোমল, নিতান্ত নিরীহ, বাঙালীর চেয়েও বাঙালী, ভাববাদী ও উদাসীন, রোমান্টিক ও শান্ত, এবং গৃহবাসী। দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই মনোহরণের ক্ষমতা রাখেন অলোকসামান্য। আমাদের দেশে, আমরা গরীব বলেই হবে, পোশাক জিনিসটা অতিশয় মূল্যবান। পোশাকেই পরিচয় হয়; এবং সম্মান লাভ ঘটে মানুষের। এবং যেখানে ইচ্ছা করে পোশাক খুলে ফেলা হয়, যেমন খোলে সাধু, সঙ, ফকির-দরবেশরা, সেখানেও ঐ পোশাকের কারণেই অলৌকিক মাহাত্ম্যের আভাস দেখতে পাই আমরা। পোশাক না-থাকাও পোশাক হয়ে দেখা দেয় এক প্রকারের। রবীন্দ্রনাথে পোশাক আছে এমন মোহন যা বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। এই আবরণ তাই বড় হয়ে ওঠে বক্তব্যের চাইতে। আর সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যতটা না সংবিতগত তার চেয়েও বেশী ভাষাগত। অগ্রসরমানতার ও সৃজনশীলতার যে শিক্ষা আছে তাঁর রচনায় সে শিক্ষা পৌঁছায়নি, দেশবাসী সকলের কাছে; অনেকের কাছে পৌঁছায়নি, পৌঁছাবার কথাও নয়, দারিদ্র্যের কারণে; অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন যারা তারাও বাইরের শোভা নিতে চেয়েছে ভেতরের মর্মবাণীকে উপেক্ষা করে। তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ গানের রচয়িতাই মূলত, প্রবন্ধের নন।

মানতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রশ্রয় দিয়েছেন ভক্তের এই দুর্বলতার। তিনি আঘাত করেননি তেমন করে যেমন করে করলে আধ-মরারা বাঁচুক না-বাঁচুক বাঁচতে চাইত, তন্দ্রা ভেঙ্গে। একদা পল্লীগ্রামে গিয়ে গোরা একেবারে অনাবৃত দেখতে পেয়েছিল "সেখানকার নিশ্চেষ্টতার মধ্যে স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার মূর্তি"; এবং বুঝতে পেরেছিল সেই নিশ্চেষ্টতার কারণ এই যে, "পল্লীর মধ্যে বাহিরের শক্তিসংঘাত তেমন করিয়া কাজ করিতেছে না।" যে বৃহৎ পল্লী এই বঙ্গভূমি সেখানে

আঘাত প্রয়োজন ছিল বড় রকমের। প্রশ্ন উঠবে কবিকে কেন দায়িত্ব দিচ্ছি সমাজসংস্কারকের? দিচ্ছি এই কারণে যে তিনি কবিই নন শুধু, তাঁর ভূমিকা ছিল শিক্ষাগুরুর। নিজেকে সংগঠিত করেছিলেন তিনি একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে—শুধু প্রাতিষ্ঠানিক রূপে নয়, রচনার মধ্য দিয়েও; রচনার মধ্যেই বরঞ্চ প্রধানত।

সেই দুর্বলতার প্রশ্রয়দান প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের চলমানতা অসামান্য। 'রাশিয়ার চিঠি'তে, 'কালান্তরে', হরিপদ কেরানীদের কথকতায়, বিদ্রোহিনী এলাদের চিত্রায়ণে, 'গল্পসল্পে'র উপস্থাপনায় অনেক অনেক দূরে এগিয়ে এসেছেন তিনি অবশ্যই ভানুসিংহ ও প্রতাপাদিত্যদের জগৎ থেকে। কিন্তু এ অগ্রসরমানতা বৈপ্লবিক নয়। ভক্তির, ভাববাদের, আধ্যাত্মিকতার মূল কাঠামো ভেঙ্গে বের হয়ে যাননি তিনি, অসামান্য তিনি তাঁর সামান্য পাঠকদের সঙ্গে একই বৃত্তে অবস্থান করেছেন। একই বৃত্ত বলা ভুল হয়ত, তাঁর বৃত্ত অনেক বড়, কিন্তু একই তার চরিত্র। তীর্থযাত্রী নগরবাসী এখানে, নগরের মূল্যবোধ সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, এমন সম্ভব নয় যে, তিনি পৌঁছে যাবেন একেবারে অকল্পিত কোন নতুন দেশে। তাঁর অগ্রসর প্রকাশের ক্ষেত্রে যতটা সুবিস্তৃত, চেতনার ক্ষেত্রে ততটা নয়।

তবু তীর্থযাত্রা অত্যন্ত বড় সত্য। রবীন্দ্রস্তুতি সেই দিকটাকে ভুলিয়ে দিতে চায়, তাঁকে পরিণত করতে চায় অলস বিগ্রহে, অর্থাৎ নিস্তেজ বস্তুপুঞ্জে।

কিন্তু তীর্থযাত্রীকে নম্র শান্ত নিরীহ নগরবাসী করে তোলা অন্যায়—শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি নয়, সমগ্র দেশবাসীর প্রতি; কেননা রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে দেখতে গেলে তদ্দ্বারা অবজ্ঞা করা হয় তার প্রাণশক্তির প্রধানতম প্রকাশকে; এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে দেখতে গেলে এর ফলে অবজ্ঞা করা হয় পরিবর্তনের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনকে। রবীন্দ্রনাথ সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন এই বস্তাপচা বিবরণ দেওয়াটা অর্থহীন, তিনি মানুষের মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকারের পক্ষে ছিলেন দ্বিধাবিহীন—এই সত্যটাকেই উন্মোচিত করা আবশ্যক। আর সেই সত্য যত বেশী জানা হবে, গভীরভাবে, প্রবলভাবে, ততবেশী স্পষ্ট হবে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন করবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা। প্রাণশক্তি জয়ী হবে বস্তুপুঞ্জের উপর।

উন্মুক্ত পথের স্বচ্ছন্দ যাত্রী

'ঘরে-বাইরে'র বিমলা নিজের মনের মধ্যে অমরাবতীর যে-ছবি সযত্নে রক্ষা করেছিল সে-ছবিতে বিমলার মা ছিলেন, যে মা "বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়াজলের ছিটে দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা দিয়ে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন।" খোসা ছড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে কি কি ফল সাজিয়ে দিতেন বিমলার মা রবীন্দ্র-নাথ তা উল্লেখ করেননি, আর ঐ যে পান-জড়ানোর ন্যাকড়া আর খাবার সামনে মাছিদের নিরলস ব্যস্ততা এদেরকে স্বর্গের ছবিতে পরিণত করতে হলে কল্পনার যে-শক্তি ও মোহের যে-প্রসারতা থাকার প্রয়োজন তা অবশ্যি বিমলার ছিল; কিন্তু তা যদি কারো না-থাকে এবং সে যদি দেখে যে বিশেষ করে গুছিয়ে দিলেও বাংলাদেশের ফলগুলো নিতান্ত সাধারণ, পান-জড়ানোর কাপড়গুলো নিতান্তই নোংরা এবং খাবারের সামনের মাছিগুলো আমাদের আজন্ম রোগজীর্ণতার পরিচয়লিপি, তাহলে সে-দেখাকেও দোষ দেওয়া যাবে না। বস্তুত রাজবাড়ীতে, বিমলার যে জীবন তা অতিশয় সামান্য, যেমন কর্মহীন তেমনি প্রাণহীন। তার না আছে কাজ ঘরের ভেতর, না আছে সুযোগ বাইরের বড় জীবনে স্বাদ গ্রহণের।

কিন্তু যদি বিমলা সুযোগ পেত দেউড়ি পার হয়ে বাইরে যাবার, দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে মিশবার তাহলে কি বিমলা খোঁজ পেত অসামান্য কিছুর? মোটেই নয়, বরং বিমলা দেখত রাজবাড়ীতে তার জীবনের যে সামান্যতা তা সমগ্র দেশের জীবনের অভাব ও অনটন, দীনতা ও নির্জীবতারই একটি বর্ধিত, বলা যেতে পারে রাজকীয়, সংস্করণ। বাংলাদেশের জীবনের দীনতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যে খাদ্য নিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহে। খাদ্যের কথা সব দেশের সাহিত্যেই আছে, কিন্তু মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত আহারের বিষয় নিয়ে যে পরিমাণ ব্যস্ততা সাহিত্যের

চরিত্ররা প্রকাশ করেছেন তা একান্তই বঙ্গদেশীয়। এর একটা কারণ বোধ হয় সাধারণভাবে খাদ্যের অপ্রাচুর্য এবং দ্বিতীয় কারণ সাহিত্যের চরিত্রসমূহের, বিশেষ করে মেয়েদের, করবার মত কাজের অভাব। শরৎচন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যে খাদ্যাভাব বেড়েছে, অথবা বলা যায় খাদ্য-বঞ্চিতেরা নিজেদের এনে উপস্থিত করেছে।

খাদ্য নিয়ে এই ব্যস্ততার পেছনকার কারণটা অবশ্যই অর্থনৈতিক। বাঙালী-জীবনের অর্থনৈতিক দীনতার সত্যটিকে লেখকরা অনেক সময় স্বীকার করেননি হয়ত, কিন্তু লেখকদের লেখা স্বীকার করেছে সব সময়েই। লেখার মধ্যকার চিন্তার দারিদ্র্য ও প্রাণের অসদ্ভাবের ভেতর দিয়ে জীবনের দীনতা অনেক সময়েই নিজেকে প্রকাশিত করেছে। লেখকরা মিথ্যা কথা বলতে পারেন, লেখা কখনো মিথ্যা বলে না—ডি. এইচ. লরেন্সের এই মতের সত্যতা বাঙলা সাহিত্যে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রকৃতিও জীবনের প্রতি, জীবনের সচ্ছলতার প্রতি বিরূপ। এই প্রকৃতি বৃহৎকে সহ্য করে না। বৃহৎ কীর্তিকে নয়, বড় মানুষকেও নয়। যা কিছু বড় হয়ে উঠতে চায়, চায় উঁচু হয়ে থাকতে, তাকে সে আঘাত করে নীচে থেকে, দু'পাশ থেকে, উপর থেকে। ফলে আপস, সন্ধি, কোমলতা, এরা বড় বড় গুণ হয়ে প্রকাশ পায় জীবনে ও সাহিত্যে।

বড় চিন্তা অন্য যে অবস্থাতেই সম্ভব হোক অত্যন্ত শূন্য উদরে সম্ভব যে নয় এটা ঠিক। এ সত্যটা সত্যদর্শী এ্যাথেনীয়রা খুব স্পষ্ট করে বুঝে ছিলেন, সেই জন্য সে-দেশের দার্শনিকেরা মহৎ জটিল গভীর তত্ত্ব-সমূহের রহস্যোদ্ধার করতে বসার আগে আহার করে নিতেন, উদর যত পূর্ণ হত আলোচনাও তত উদাত্ত হয়ে উঠত। আহার করতেন, কিন্তু আহারের চিন্তাতে আবদ্ধ থাকতেন না, অন্য বিষয়ে চিন্তা করতে সুযোগ পেতেন অন্নচিন্তা ছিল না বলেই। বুদ্ধদেব হওয়া সিদ্ধার্থের মত রাজ-পুত্রের পক্ষেই সম্ভবপর, দরিদ্র ভিখারীর পক্ষে নয়। বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালীর জীবনে একবার যে একটা প্রবল উদ্দীপনা এসেছিল, যাকে বাড়িয়ে বলা হয় রেনেসান্স, সেই উদ্দীপনা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন যাঁরা তাঁদের জীবনে সচ্ছলতা ছিল অর্থের। রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এঁরা কেউই দরিদ্র ছিলেন না। বিদ্যা-সাগর কিছু কম অর্থ উপার্জন করেননি। রবীন্দ্রনাথের কোন অভাব ছিল না।

কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটা সত্য আছে জড়িত। এঁদের গৃহে সচ্ছলতা ছিল, কিন্তু এঁরা কেউই সদগৃহী ছিলেন না, গৃহীর মানসিকতা ছিল না এঁদের। সেই জন্যই এঁরা লেখক হয়েছিলেন, নইলে সচ্ছল ঘরের আর পাঁচজন সুসন্তানের মত স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের বেষ্টনীর মধ্যেই অর্থহীন জীবন যাপন করে নিঃশেষিত হয়ে যেতেন। শরৎচন্দ্র ধনী ছিলেন না, চেষ্টা করলে তিনি উকিল হতে পারতেন, হয়ত বা ডেপুটি, বংশ রক্ষা করে শেষে দেহ রক্ষা করতেন হয়ত একদিন। কিন্তু তা করেননি, নিজের গৃহে আবদ্ধ ছিলেন না, সেই জন্য দশ জনের ঘরের খবর নিয়েছেন, দশ ঘরের দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন। বংশ রক্ষা হয়নি বটে, কিন্তু অনেককে রক্ষা করেছেন, সাহিত্যে।

গৃহ ও গৃহী মানসিকতার দিক থেকে মুসলমান সমাজের অবস্থাটা ছিল হীনতর। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবাব আবদুল লতিফ উভয়ই ডেপুটি ছিলেন। কিন্তু আবদুল লতিফ এমনকি স্বীয় সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মানুষের কথাও ভাবেননি; নিজের অতিক্ষুদ্র শ্রেণীর উন্নতির বিষয়েই শুধু চিন্তা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের ভাগ্য দেখে পীড়িত হয়েছেন, বাঙালীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নেই দেখে ব্যথিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার সুফল যেটুকু তাকেও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন, সাহিত্যিক রূপ-কল্প এনেছেন বিদেশ থেকে, ডেসডিমনার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, ডেসডিমনাই পূর্ণতর চরিত্র কিশোরী বালিকার। অর্থাৎ কিনা নিজের ছোট গৃহে আটক থাকেননি, বার হয়ে গেছেন সম্পদের খোঁজে, ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে, জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণার সঙ্গে বৈদেশিক সম্পদ-আহরণকে যুক্ত করে আয়োজন করেছেন বৃহতের। আবদুল লতিফ ও কায়কোবাদের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য: কায়কোবাদ উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ পাননি, চাকরি করেছেন সামান্য, জীবনযাপন করেছেন গ্রামে, কিন্তু এই কুটিরবাসীর সঙ্গে বড় দালানবাসী আবদুল লতিফের আত্মীয়তা ছিল, মানসিকতার দিক থেকে উভয়েই ছিলেন বর্জনবাদী, ছিলেন চার পাশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রতিভার কথা বাদ দিলেও কায়কোবাদের পক্ষে বড় কবি হওয়ার পথে একটা বড় অন্তরায় ছিল। সে হল যে জীবনের মধ্যে তিনি বাস করতেন সেই জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে তাঁর অসম্মতি। এই জীবনের দিকে তিনি অন্তরের দিক থেকে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধি এসে তাঁকে শাসন করেছে।

শাসন করে প্রেরণ করেছে মুঘলদের অতীত ইতিহাসের তাঁর পক্ষে অবাস্তব জগতে। এই বুদ্ধি আর যাই হোক বাস্তব বুদ্ধি নয়।

অন্তরায় আরো ছিল। ছিল তাঁর দারিদ্র্য। 'মহাশ্মশানে'র উৎসর্গপত্রে কায়কোবাদ লিখেছিলেন যে একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন হজরত মোহাম্মদকে। দেখে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। 'যখন মূর্ছা ভাঙ্গিল, দেখিলাম বঙ্গের একটি ভগ্ন কুটিরে আমি আমার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি, আর কতকগুলি শীর্ণকায় অপোগণ্ড শিশু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আমার চারিদিকে কাঁদিতেছে।' এই উক্তির মধ্যে অভাবের বর্ণনা আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী করে আছে অভাববোধের প্রকাশ। এই অভাববোধকেই বলা হয় হীনমন্যতা। কায়কোবাদের কীর্তির সামান্যতাই বলি, কি তাঁর আয়োজন-উদ্যমের দীনতার কথাই বলি—সর্বক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান হয়ে আছে হীনমন্যতার এই বিনাশিক বোধ। দীনবন্ধু মিত্রও কাজ করেছেন ডাক বিভাগে, তিনিও ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন লেখক হিসাবে, কিন্তু গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র যখন দীনবন্ধু নাম নেন তখন তাতে দীনতা প্রকাশ পায় না; নিজেকে দীনের বন্ধু বলার মধ্যে যে পৌরুষ আছে তা-ই আরো স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'নীলদর্পণে'। কাজেম আল-কোরেশী বড় জোর 'মহাশ্মশানের' কবি হতে পারেন, 'নীলদর্পণ' লেখার মত জোর না আছে তাঁর পরিবেশে না তাঁর মানসিকতায়। এবং বলাই বাহুল্য পরিবেশ ও মানসিকতা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয় আদৌ। পরবর্তীকালে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের বৈষয়িক অবস্থাটা কিছুটা সচ্ছল ছিল, কিন্তু খুব বেশী নয়, এবং তাঁরাও গৃহীই ছিলেন আসলে, গৃহের মধ্যে থেকে পশ্চিমের জানালা খোলার তাঁদের আগ্রহ ছিল, উদ্যমও। কিন্তু ঘরের মধ্যে ছিলেন বলেই বড় কিছু লিখতে পারেননি তাঁরা, বড় কোন প্রভাবও রাখতে পারেননি সমাজের উপর।

২

নজরুল ইসলামকে যদি বিচার করতে হয় তবে এই পটভূমিতেই করতে হবে। নয়ত তাঁর পূর্ণ পরিচয় স্পষ্ট হবে উঠবে না আমাদের কাছে, আমরা জানতে পারব না তাঁর অসামান্যতাটা কোথায় ও কতটা।

নজরুল ইসলাম বড় প্রতিভা ছিলেন এ কথা বললে সবটা বলা হয় না তাঁর সম্পর্কে। সেই সঙ্গে তাঁর পক্ষে কবি কায়কোবাদ হওয়া যে

সহজ ও স্বাভাবিক ছিল এই কথাটা যোগ করলে নজরুল ইসলামের পরিচয়লিপিটি পূর্ণতর হয়। কায়কোবাদের তুলনায় দরিদ্রতর ছিলেন নজরুল ইসলাম। তিনি কোরেশ বংশের নন, কাজী বংশের। তাঁর বাবা মারা যান যখন তাঁর বয়স মাত্র নয়, মা চলে যান অন্য ঘরে। তারপরে গৃহ বলতে কিছু ছিল না নজরুল ইসলামের। সেই কারণেই মনের দিক থেকে অতিবড় গৃহী হবার কথা ছিল তাঁর। সম্ভাবনা ছিল তিনি কেরানী হবেন, আরো বড় হলে সাব-রেজিস্ট্রার, কথা ছিল অন্ন-চিন্তাতেই জীবন কাটবে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলের অতিপরিমিত পরিসরে। তাঁর পক্ষে সৈনিক হওয়া ছিল অস্বাভাবিক, কবি তার চেয়েও বেশী।

কিন্তু তিনি শুধু কবি হলেন না, হয়ে উঠলেন অসামান্য লেখক। তার কারণ তাঁর প্রতিভা ছিল, এবং সেই প্রতিভার একটা প্রধান লক্ষণ ছিল এই যে, তিনি সদ্‌গৃহী ছিলেন না। সেই যে তিনি ঘর ছাড়লেন অতি অল্প বয়সে, তারপর ভাগ্যকে গড়লেন নিজ হাতে, কিন্তু আর কোন দিন ফিরে গেলেন না ঘরে—না চুরুলিয়াতে, না অন্য কোথাও। দারিদ্র্য তাঁর অজানা ছিল না। কায়কোবাদের মত তিনিও দেখেছেন অনাহার-ক্লিষ্ট শিশুকে তাঁর চার পাশে কাঁদতে। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে সেই হীনমন্যতা ছিল না যা আপন সন্তানকে বলতে শেখায় "অপোগণ্ড শিশু", শেখায় করুণা করতে নিজেকে। দারিদ্র্য তাঁকে দুর্বল করেনি, মহৎ করেছে, তাঁকে দিয়েছে খৃষ্টের সম্মান। আত্মকরুণা যে নজরুল ইসলামে নেই তা নয়, আত্মকরুণা আছে, আছে অশ্রু ও অভিমান, ফুল নেব না অশ্রু নেব—এই প্রশ্ন, অর্থাৎ নানা প্রকারের ভঙ্গিমা; কিন্তু সব কিছু নিজের মধ্যে ধারণ করে, সব কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে, জীবনের সামান্যতাকে নীচে রেখে অনেক বড় হয়ে উঠেছেন তিনি।

তিনি গৃহের কবি নন, কবি তিনি উন্মুক্ত পথের, যদিও গৃহ তাঁর রচনার মধ্যে আছে। আগামী দিনের মানুষ নজরুল ইসলামকে কি ভাবে নেবে সেটা তাদের বিবেচ্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে নজরুল ইসলামের এই পরিচয়টাই প্রধান যে তিনি কবি উন্মুক্ত পথের। একেক যুগ একেক ভাবে নেয় একই প্রতিভাকে, আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত পথে স্বচ্ছন্দপদচারী নজরুল ইসলামই প্রধানতম নজরুল ইসলাম। এই পরিচয়টাই যে বড় করে চোখে পড়ে তার কারণ দুটি। প্রথম কারণ আমাদের জীবনে পথের অভাব, অভাব পথচারীর। আমরা সকলেই গৃহী, গৃহের বাইরে ছোট

ছোট গলি-ঘুপ্তি আঁক-বাঁক আছে বটে কিন্তু উন্মুক্ত পথ নেই খুব বেশী। পথ যেখানে বা আছে, অভাব আছে যাত্রীর। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গৃহহীন নজরুল ইসলামের পক্ষে গৃহী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, গৃহী না হওয়ার মধ্যে তাঁর অসাধারণত্ব যেমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমন বোধ হয় অন্য কোথাও নয়। সকলেই জানেন যে নজরুল ইসলামের উপর প্রভাব পড়েছিল ওয়াল্ট হুইটম্যানের। সেই প্রভাব একান্ত স্বাভাবিক, কেননা হুইটম্যানও কবি ছিলেন উন্মুক্ত পথেরই।

উন্মুক্ত পথের পথিক বলেই অতি-অনায়াসে সর্বত্রগামী হয়েছেন তিনি। হিন্দু-মুসলমানের মিলন তাঁর লেখার মধ্যে যেমন ঘটেছে, জীবনে, রাজনীতিতে, বা সাহিত্যে তেমন কোথাও ঘটেনি বাংলাদেশের। খৃষ্টানরাও বাদ যায়নি। সাধারণ মানুষের জীবনে তিনি যেমনভাবে প্রবেশ করেছেন তাঁর আগে অন্য কোন লেখক তেমনভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। তাঁর অসামান্য গল্প 'রাক্ষসীতে' তিনি শুধু বাগদী মেয়েকে আনেননি, এনেছেন তার মুখের ভাষাকেও। বাগদী মেয়েকে ভদ্র সাজে আসতে হয়নি, সাহিত্যে সে এসেছে অকুন্ঠ পদে, এসেছে নিজের ভাষায় কথা বলতে বলতে। সন্দেহ নেই নজরুল ইসলামের লেখা নাটকগুলোই তাঁর সাহিত্যের দুর্বলতম অংশ। সেখানে ভাবালুতা অধিক, কিন্তু সেই ভাবালুতার মধ্যেও নারী-শক্তির উদ্বোধন ভিন্ন যে মুক্তি নেই আমাদের এই কঠিন সত্যটিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছেন তিনি 'ভূতের ভয়' নাটকে। 'ঝিলিমিলিতে' বি-এ পাস করা না-করার যে প্রাণঘাতী বিতর্ক হত্যা করল ফিরোজাকে সে শুধু বিতর্ক নয় একটা, সে মুসলমান সমাজের গৃহাভ্যন্তরের যে প্রাণহীনতা, যে আনন্দহীনতা ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে অন্যায় শাসনের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে তারই কাব্যময় প্রকাশ। চিরকালের মেয়ে ফিরোজা নজরুল ইসলামের কালে এসে লাঞ্ছিত হয়েছে মুসলমানের গৃহে আটকা পড়েই।. সন্ত্রাসবাদী তরুণকে নজরুল ইসলাম যেমনভাবে বুঝেছেন তেমনভাবে এমনকি রবীন্দ্রনাথও বোঝেননি। 'চার অধ্যায়ের' তুলনায় 'কুহেলিকা'র সাহিত্যিক মূল্য স্বল্প সন্দেহ নেই, কিন্তু 'কুহেলিকা'য় যে সহানুভূতি আছে তরুণ সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি 'চার অধ্যায়ে' তা নেই। 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীর সমসাময়িক মুসলিম সমাজে ছিল না, নজরুল ইসলাম নানাদিক থেকে এগিয়ে ছিলেন তাঁর সমাজের তুলনায়। আনসার যখন নতুন রাজ-

নীতিকে গ্রহণ করেছে, কৃষক-শ্রমিকের রাজনীতিকে, তখন বোঝা যায় নজরুল ইসলাম এগিয়ে গেছেন সমসাময়িক লেখকদের অনেককে পেছনে ফেলে। আনসারকে তিনি সব্যসাচী করেননি, কল্পনার আতিশয্যকে পরিহার করার মধ্যে যে বাস্তব বুদ্ধি প্রকাশিত হয়েছে তা সাধারণ নয়। গোরার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটি অতিশয় তেজস্বী, নিতান্ত অবাঙালী পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন, যার কন্ঠস্বর মেঘমন্দ্র, আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড, সমাজের প্রতি যার দায়িত্বজ্ঞান সর্বদাই অবিচলিত সেই কল্পনার মানুষটি যেন বই থেকে বার হয়ে শরীর ধরে এসে দাঁড়িয়েছে নজরুল ইসলামের। সংস্কার-বিশ্বাসী গোরা নয়, সেই গোরা যে জেল খেটেছিল অন্যের কারণে, কিন্তু মাথা নোয়ায়নি কিছুতেই, বিশেষ করে সেই গোরা উপন্যাসের শেষে যাকে দেখি এসে দাঁড়িয়েছে সুচরিতা ও পরেশবাবুর কাছে, বলছে, তার আর ভয় নেই ব্রাত্য হবার। কেননা তার সমাজ নেই, সংস্কার নেই, সে সকল মানুষের, সে বৃহৎ ভারতবর্ষের।

কিন্তু গোরা তো কল্পনার সৃষ্টি। গোরার পিতামাতার খোঁজে রবীন্দ্র-নাথকে যেতে হয়েছে আয়ারল্যাণ্ডে, সংগ্রহ করতে হয়েছে আনন্দময়ীর মত স্নেহশীলা মাতাকে, কৃষ্ণদয়ালের মত অবস্থাপন্ন গৃহস্বামীকে। নজরুল ইসলাম দরিদ্র বাঙালী পরিবারের ছেলে, এবং সেই কারণে আরো বেশী অসামান্য। অসামান্য বলেই সামান্য সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলমান সমাজের মুরব্বিরা প্রথমে বলেছে তিনি ধর্মদ্রোহী। পরে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে, চেষ্টা হয়েছে তাঁকে সংস্কৃত করে সামান্য করে নেবার। কিন্তু তিনি অসামান্যই আছেন। উন্মুক্ত পথে তো চলেছেনই, নজরুল আরো একটা কাজ করেছেন, ডাক দিয়েছেন দেশবাসীকে, পথটাকে আরো বড় আরো দীর্ঘ ও প্রশস্ত করে নেবার। এই যাত্রী পথপ্রদর্শক, আবার তিনি নির্মাতাও।

প্রান্তবর্তী আলো

আমাদের পেছনের সামাজিক জীবনের যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত ছিল জীবনপ্রণালীর ও জীবনদৃষ্টির তারা নিজেদের পরিচয় নানাভাবে ব্যক্ত করে রেখেছে। এই দুই প্রান্তের বিশেষ দু'জন প্রতিনিধি হচ্ছেন এ. কে. ফজলুল হক এবং কাজী নজরুল ইসলাম; তাঁদের মধ্য দিয়েও সমাজের দুই প্রান্ত নিজেদের বৈপরীত্য তথা আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছে।

এঁরা দুইজন নায়ক পুরুষ, কেউই দূরে নন আমাদের জীবন থেকে, এবং এক সময়ে তাঁরা পরস্পর খুব নিকটে এসেছিলেন 'নবযুগ' পত্রিকার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁরা আবার বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়েছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। আমাদের সমাজের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা থেকেছে, কিন্তু তাঁরা একজন ঘনিষ্ঠ থাকতে পারেননি অপর জনের সঙ্গে।

এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা তাঁদের মধ্যে দূরত্ব ছিল দূরতিক্রম্য। আর সে দূরত্ব যে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের যে দূরত্ব তা-ই শুধু নয়, অথবা একজন বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্য একজন বড় ব্যক্তিত্বের যে স্বাভাবিক, স্বভাবগত দূরত্ব তাও নয় শুধু, এই দুই দূরত্বের চেয়েও বড় এক দূরত্ব ছিল—ছিল একই সমাজের দুই প্রান্তের দূরত্ব। দুই প্রান্তে তাঁরা ছিলেন, দুই প্রান্তকে আলোকিত করে ছিলেন।

তাঁদের দু'জনের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল বেশ কিছু ব্যাপারে। দু'জনেই তাঁরা প্রধান পুরুষ ছিলেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে—হক সাহেব যেমন ছিলেন রাজনীতিতে, নজরুল ইসলাম ছিলেন তেমনি সাহিত্যে। উভয়েই তেজস্বী ছিলেন, ছিলেন সাহসী, যেমন প্রতিভা ছিল তেমনি ছিল উদারতা। উভয়েই তাঁরা মানুষ ছিলেন প্রসারিত ও উন্মুক্ত জীবনের। দেশ ও দেশের মানুষের অবাধ গতিবিধি ছিল তাঁদের সংবিতে। আবদ্ধ ছিলেন না স্বীয় শ্রেণীতে। গণ্ডগ্রামে বলি, অথবা বিলাতে—হক সাহেব স্বচ্ছন্দ ছিলেন সর্বত্র। অত্যন্ত গরীব মানুষের সঙ্গে যেমন অতি বেশী অন্তরঙ্গ হতে পারতেন, তেমনি পারতেন অত্যন্ত ধনীর সঙ্গে। কৃষকের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন যেমন অনায়াসে, তেমনি লাট সাহেবের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে। কোথাও আটকায়নি। যেমন গ্রামের তিনি, তেমনি শহরের। নজরুলও তেমনি। অনেকের সঙ্গে মিশেছেন, অনায়াসে মিশেছেন; স্তর, শ্রেণী, সম্প্রদায়, এলাকা—আটক পড়েননি কোথাও। তার কারণ উভয়েরই আয়ত্তে ছিল ভাষা। ফজলুল হক অনেক ভাষা জানতেন, বাঙলাভাষারই অনেক রূপ ব্যবহার-দক্ষ ছিলেন তিনি। নজরুলের ভাষাও তেমনি হৃদয় জয় করেছিল অনেক বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী অবস্থানগত মানুষের। নজরুল ইসলামের এই স্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে হলে তুলনা করতে হবে তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের ও তাঁর সমাজের অন্যান্য কবিযশপ্রার্থীদের পাশে দাঁড় করিয়ে। তাঁরা উভয়েই বাঙালী ছিলেন মনে-প্রাণে। (হক সাহেবের দুই স্ত্রীই ছিলেন উর্দুভাষী, কিন্তু নিজে ছিলেন বাঙালী। নজরুল ইসলাম ফার্সী-উর্দুর প্রভাব গ্রহণ করেছেন, বাঙালীত্বকে সমৃদ্ধ করবার জন্য।) ধার্মিক ছিলেন তাঁরা, কিন্তু ছিলেন না সাম্প্রদায়িক। অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এই কথাটা আজ যত সহজে বলা গেল কার্যক্ষেত্রে সেদিন অসাম্প্রদায়িক হওয়া তত সহজ ছিল না কোন-মতেই। ১৯০৫ সালের পর দেশে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রাজ-নীতিতে, এবং রাজনীতিরও আগে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল নিজেকে। হক সাহেব ও নজরুল ইসলাম দু'জনেই কাজ করছেন নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য, তাঁদের প্রভাব সবচেয়ে গভীরভাবে পড়েছে স্বীয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপরই, কিন্তু তাঁরা কেউই সংকীর্ণ ছিলেন না, ছিলেন না ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট। লাহোর প্রস্তাব হক সাহেবের হাত দিয়েই উত্থাপিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু যাকে বলে পাকি-স্তানবাদী হক সাহেব কোন দিনই তা ছিলেন না। আর নজরুল ইসলামের মত অসাম্প্রদায়িক লেখক বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় জন জন্ম গ্রহণ করেনি —এ সত্য তাঁর পক্ষে যেমন বিশেষ গৌরবের বিষয় তেমনি অগৌরবের বস্তু তাঁর দেশবাসীর পক্ষে। এ ছাড়া তাঁরা উভয়েই ছিলেন ইংরেজ-বিরোধী।

ব্যাপার আরো ছিল। ছিল তাঁদের প্রচণ্ড সাহস। ফজলুল হক 'শের' ছিলেন বাংলার, আর নজরুল ইসলাম ভয়কে কখনো স্বীকার করেননি জীবনে। এবং ছিল তাঁদের স্ববিরোধিতা। এই স্ববিরোধিতা এসেছে তাঁদের সমাজ থেকে, তাঁদের সমাজের মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল নানাপ্রকারের, যা এখনো আছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু স্ববিরোধিতা এঁদেরকে দুর্বল

করতে পারেনি—এইখানেই তাঁদের শক্তির বিশেষ পরিচয়—স্ববিরোধিতা তাঁদেরকে, উভয়কে, বরং প্রবলতা ও ব্যাপকতা দিয়েছে।

তাই এঁরা একত্র হয়েছিলেন 'নবযুগ' পত্রিকায়। একত্র হয়েছিলেন বটে কিন্তু এক হতে পারেননি আদৌ। বরং তাঁরা যে বিচ্ছিন্ন হবেন অচিরেই এই সম্ভাবনা উপ্ত ছিল তাঁদের সংযোগের মধ্যেই। পার্থক্য ছিল বয়সের। দু'জনের মধ্যে যখন যোগাযোগ ঘটে হক সাহেবের বয়স তখন সাতচল্লিশ, নজরুল ইসলামের একুশ। কিন্তু তার চেয়েও বড় পার্থক্য—বলা যায় বিরোধ—বর্তমান ছিল। তাঁরা ছিলেন দুই বিভিন্ন, পরস্পরবিরোধী জীবনপ্রণালী ও জীবনদৃষ্টির প্রতিভূ। সমস্ত জীবন নজরুল ইসলাম ছিলেন বাধাবন্ধনহীন যুবক, হক সাহেব সব সময়েই প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। একজন এসেছেন পশ্চিম বঙ্গের এক নিঃস্ব পরিবার থেকে; অপর জন পূর্ব বংগের সম্পন্ন গৃহ থেকে। হক সাহেবের শিক্ষাগত মেধা কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হয়েছে; নজরুল ইসলাম পার হতে পারেননি স্কুলের সীমা। বিষয় সম্পত্তির দিক দিয়ে ফজলুল হকের প্রায় সব কিছুই ছিল; নজরুল ইসলামের প্রায় কিছুই ছিল না। ফজলুল হক দুইবার বিবাহ করেছেন, দুইবারই উর্দুভাষী পরিবারে; নজরুল ইসলামেরও দুই বিয়ে—দুইবারই মফস্বলের বাঙালী পরিবারে। হক সাহেব সম্পূর্ণত রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর কালের রাজনীতি সুরেন ব্যানার্জীর কালের রাজনীতি ছিল না অবশ্যই, রাজনীতির ধারা এগিয়ে এসেছিল জনজীবনের দিকে, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন আরো বেশী, তিনি কৃষকের কথা, প্রজার কথা ভাবতেন, তাদের নিয়ে রাজনীতি করতেন। তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি, কিন্তু তাদের রাজনীতি নয়, তাদের জন্যও রাজনীতি নয়। কেননা তাঁর রাজনীতিতে ব্যক্তিই ছিলো প্রধান, মন্ত্রীত্বই ছিল মূল লক্ষ্য। কৃষকের ভাগ্যোন্নয়ন তিনি চাইতেন, কিন্তু ভূমিসম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিপ্লব তিনি কামনা করেননি দেশে। সেটা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। হক সাহেব মানুষ ছিলেন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর, আর নজরুল ইসলাম হচ্ছেন বাংলাদেশের একমাত্র প্রধান কবি যিনি এসেছেন বিত্তহীন শ্রেণী থেকে।

তরুণ নজরুল ইসলাম বিপ্লব চাইতেন। তিনি শুধু বিদ্রোহী ছিলেন না, বিপ্লবীও ছিলেন। 'নবযুগের' পরে তিনি 'লাঙল' বের করেছেন, তারপর 'গণবাণী'। তিনি যতদূর গেছেন, যত দ্রুত গেছেন, ততদূর

যাওয়া তত দ্রুত যাওয়া সম্ভবপর ছিল না হক সাহেবের পক্ষে। প্রথম কথা, নজরুল ইসলাম কবি ছিলেন, হক সাহেবে ছিলেন রাজনীতিক। কবিতার সঙ্গে রাজনীতির দূরত্ব কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের দূরত্বের মতই, কবিতায় যতদূর যাওয়া যায় বাস্তবে ততদূর যাওয়া অকল্পনীয়। সেই সঙ্গে ছিল তাঁদের শ্রেণী পটভূমি। হক সাহেবের 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি' এবং নজরুল ইসলামদের 'মজুর স্বরাজ পার্টি'র মধ্যে সাদৃশ্য শুধু নামেরই, আসলে তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন পথাভিসারী। তদুপরি, নজরুল ইসলাম ছিলেন কর্মী, হক সাহেব নেতা।

নজরুল ইসলাম ছিলেন সম্পূর্ণত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। রুশ বিপ্লবের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল যখন তিনি সৈনিক ছিলেন সেই সময়েই। পরে যখন কলকাতায় এসেছেন, সখ্য হয়েছে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে, তখন তাঁর উপর সেই প্রভাব দৃঢ় হয়েছে আরো, স্পষ্ট হয়েছে অধিকতর। রুশ বিপ্লবের অতটা প্রভাব অন্য কোন কবির উপর পড়েনি তাঁর কালে। ফজলুল হকও ইংরেজবিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না সেকালের পটভূমিতে যাকে বলতে হয় চরমপন্থা সেই চরমপন্থা অবলম্বন করা। 'নবযুগের' ব্যাপারে হক সাহেব নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমদকে পূর্ণ সম্পাদকীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সরকার যখন ক্রমান্বয়ে চাপ দেওয়া শুরু করল পত্রিকার উপর তখন তিনি সতর্ক না হয়ে পারেননি। 'নবযুগ' তিনি এক উদ্দেশ্যে বার করেছিলেন, নজরুল ইসলামরা তাকে অন্য উদ্দেশ্যে চালনা করতে চেয়েছিলেন। সেকালে রাজনীতি করতে হলে পত্রিকা থাকলে সুবিধা হত; নজরুল ইসলাম ও মজফ্‌ফর আহমদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন প্রকারের। তাঁরা চেয়েছিলেন বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি করবেন দেশে। নজরুল ইসলামকে তাই 'নবযুগ' ত্যাগ করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, নজরুল ইসলামের চরমপন্থা পরে আরো চরম হয়ে উঠেছে, পরে তিনি 'ধূমকেতু' বের করেছেন, লিখেছেন, পূর্ণ স্বরাজ চাই, লিখেছেন সশস্ত্র বিপ্লব চাই, যে সব কথা সেকালের বাংলা দেশে অন্য কেউ লেখেননি। নজরুল ইসলাম লিখেছেন, লিখে চলে-গেছেন জেলে। এই রাজনীতি হক সাহেবের রাজনীতি থেকে পৃথক ছিল নিঃসন্দেহে।

মিলনের চাইতেও এঁদের বিরোধটাই অধিক সত্য, অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। মিলিত হয়েও তাঁরা যে বিচ্ছিন্ন রইলেন এর কারণ, আগেই বলেছি,

ব্যক্তিগত, ব্যবধানই শুধু নয়, প্রধান কারণ হচ্ছে জীবনপ্রণালী ও জীবন-দৃষ্টির উভয় ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধ। যদি তাঁরা মিলিত হতে পারতেন, যদি একজনের প্রতিষ্ঠা ও অন্যজনের উৎসাহ একত্র কাজ করতে পারত সমাজের জন্য তবে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁরা যে-কীর্তি রেখে গেছেন তার চেয়ে অনেক বড় পরিবর্তন আনতে পারতেন সামাজিক অবস্থায়। দুই আলো এক বড় আলো জ্বালাতে পারত নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেই মিলন সম্ভব ছিল না একেবারেই। অধিক স্বাভাবিক ছিল বিরোধ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে, সামাজিক শক্তি হিসাবে। দুই প্রান্ত যদি সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হত তবে মিলনের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ ও শুভ হত সেই বিরোধ। কিন্তু তার জন্যও প্রস্তুত ছিল না তাঁদের কালের সমাজ। তাই না-ঐক্য না-বিরোধের দুই বিচ্ছিন্ন আলোর শিখাকে আমরা পেয়েছি। সে পাওয়ায় দুঃখ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় পাওয়ার আবশ্যক ছিল। এখনো আছে।

চলে গেছেন, অপরাজেয়

ফররুখ আহমদ আর যাই হোন ভদ্রলোক ছিলেন না। ভদ্রলোকের যে একটা অনমনীয় মাপ আছে—নমনীয়তার, বিনয়ের, "আত্মসচেতনতার", সন্ধির ও সুবিধাবাদিতার—সেই মাপে তাঁর মাপ হয় না—না তাঁর জীবনের, না তাঁর কাব্যের। সেইখানে, সেই অভদ্রতাতেই তাঁর অসামান্যত্ব।

যাঁরা জানতেন তাঁকে, ছিলেন তাঁর নিকটবর্তী, তাঁরা কেউ কেউ কখনো কখনো আক্ষেপ করেছেন শুনেছি যে যদি তিনি ভদ্র হতেন, হতেন সহনশীল, যদি কবির অসামান্য শক্তির সঙ্গে মিলত ভদ্রলোকের খাপ-খাইয়ে-চলা লোকরঞ্জন গুণাবলী তবে আরো অনেক বেশী আকর্ষণীয় হত তাঁর ব্যক্তিত্ব। হত কি না জানি না, হয়ত হত, কিন্তু মিলত যদি সেই দুই অতি-বিপরীত—অসামান্য শক্তি ও সামান্য ভদ্রতা, প্রচণ্ড শক্তি ও ভদ্র পরমুখাপেক্ষিতা তবে ফররুখ আহমদ ফররুখ আহমদ হতেন না, কবি হতেন না তিনি নিজের মত। প্রবল ছিল তাঁর আবেগ, প্রাকৃতিক শক্তির মত তীব্র কল্পনাশক্তি, এবং অনমনীয় ছিল চরিত্র—সমঝোতা, সুবিধাবাদিতা, নম্রতার পথানুসন্ধান তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না আদৌ। এই অনমনীয়তা তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে অনেকের কাছ থেকে, বিরূপ করেছে অনেককে, কিন্তু এই অনমনীয়তা রক্ষা করেছে তাঁর নিজস্বতাকে।

যদি চরমপন্থী না হতেন, হতেন যদি যখন-যেমন তখন-তেমন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ত অনেক পরিমাণে; সাজানো গোছানো স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারতেন, যেমন করেছেন তাঁর তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন অনেক কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। এখনো করছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদ ভিন্ন ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর কবিতা যাঁরা পড়েছেন—এবং সকলেই পড়েছেন, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর কাব্য-প্রতিভা আর কারো ছিল না এই পূর্ববঙ্গে—তাঁরা দেখেছেন তাঁর প্রবল, প্রচণ্ড, অস্থির আবেগকে। বার বার তিনি যাত্রার কথা বলেছেন—অবিচল যাত্রার কথা। স্বর্ণ-ঈগল, আকাশ, মাঝি-মাল্লা, নাবিক, তেজী ঘোড়া তাঁর কবিতায় ঘুরে ঘুরে এসেছে। তাঁর

সিন্দাবাদ, হাতেম তা'য়ী, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যাত্রীই আসলে। সেই আশ্চর্য কবিতা 'ডাহুক'-এ সামান্য পাখি অসামান্য হয়েছে তার ডাকে— "রাত্রির অরণ্যতটে হে অশ্রান্ত পাখী/যাও ডাকি ডাকি/অবাধ মুক্তির মত"। অন্যদিকে

ভারানত
আমরা শিকলে
শুনিনা তোমার সুর, নিজেদেরি বিষাক্ত ছোবলে
তনুমন করি যে আহত।
এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও,
তুমি বও
তোমার শৃঙ্খল-মুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবনমৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।

তাই

তুমি মুক্তপক্ষ নিভৃত ডাহুক,
পূর্ণ করি বুক
রিক্ত করি বুক
অমন ডাকিতে পারো। আমরা পারি না।

'পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদী' বলেছে হাতেম তা'য়ীকে:

কিন্তু কে যাবে সে মাঠে সুখ-তপ্ত গৃহকোণ ছেড়ে?
কে আছে এমন যাত্রী; আছে কার মর্দমী এমন
রাত্রির বিলাস শয্যা ছেড়ে যেতে পারে যে সহজে
দুর্গম সড়কে? কে আছে দরাজ দিল, মুক্ত মন
অন্যের দুর্বহ বোঝা নিতে পারে প্রাণান্ত প্রয়াসে
সর্বত্যাগী? কে আছে প্রবৃত্তিজয়ী, তীব্র লালসায়
স্খলিত হয় না যার স্থির সত্তা দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে?
দৌলৎ, ইজ্জত, খ্যাতি অনায়াসে মাড়িয়ে কে পারে
মৃত্যুর সম্মুখে যেতে ব্যথাদীর্ণ ইনসানের কাজে?
পাই নাই সাড়া তার এতদিনে; জিন্দানখানায়
আসে নাই সে এখনো পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যার;
তবু দীর্ঘ বিশ সাল আছি আমি তার ইন্তেজারে।

এই দুর্লভ যাত্রী ছিলেন ফররুখ আহমদ নিজে। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব চেয়েছেন, এবং সেই লক্ষ্যানুসন্ধানের কালে বিরোধী যে শক্তি—অন্ধকার, অত্যাচার, হতশ্বাস—তাকে আঘাত করেছেন সর্বশক্তি দিয়ে। সেই নদীর মত ছিলেন তিনি, যে-নদী

প্রবহমান জীবনের নব জাগরণে
ভাসায়ে তরঙ্গ ভঙ্গে জড়তা, জরার আক্রমণ,
চলে সে উদ্দামগতি শংকা নাই সংঘাতের ক্ষণে

মুখাপেক্ষী নয় কারো, মানে না সে শৃঙ্খল বন্ধন।
অবরুদ্ধ হয় যদি যাত্রা পথে কভু অতর্কিতে
প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙে সব বাধা, সমস্ত বারণ

বন্যাবেগে মুছে ফেলে নেয় খুঁজে মুক্তি পৃথিবীতে
(অথবা সে যায় মুছে যত বাধা দৃঢ় বা ভঙ্গুর)।

সর্বোপরি বিরোধী ছিলেন তিনি মৃত্যুর। হারামী মওতকে দেখেছেন তিনি, কিন্তু তাকে মেনে নেননি। 'লাশ' কবিতার সেই পঙ্‌ক্তিগুলো সুপরিচিত ঃ

হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়

তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নামের দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও;
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।

এই উক্তিতে কোন ভদ্রতা নেই, ক্ষমা নেই কোন প্রকারের, সহনশীলতার, নিম্নকন্ঠ আলাপের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। ইবলিশ ও জাহান্নাম সত্য, কিন্তু তারা ঘৃণার পাত্র। শুধু তাদেরকেই নয়, এই কবি

আঘাত করেছেন তাদেরকেও "জিঞ্জিরে আটক চিড়িয়া" যারা, "হীন কামনায় বুড়া"। এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনাচারী যারা তাঁর বিবেচনায় তাদেরকেও। হায়াত দারাজ খান ছেড়ে কথা কয়নি কাউকে, ক্ষমা করেনি কখনো। কাব্যচর্চা লড়াই ছিল তাঁর পক্ষে—ছিল জঙ্গের ময়দান।

এই লড়াইয়ে সৌন্দর্যবুদ্ধির স্থান গৌণ নয়। লড়াই আসলে সুন্দর জীবনের জন্য। ফররুখ আহমদের প্রখর শুভ-বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায়ের নির্ঘুম চেতনা কোন অবস্থাতেই শিথিল হয়নি। অন্যদিকে সৌন্দর্যচেতনা ছিল তাঁর কল্পনাশক্তির অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য ছিল; দ্বন্দ্ব ছিল অবশ্যই, কিন্তু ভারসাম্যও ছিল, যে-ভারসাম্য না-থাকলে রচনা সার্থক কাব্য হয় না, প্রচারের দলিল হয়, নয়ত হয় বিশুদ্ধ কল্পনাচারী সত্তা। কিন্তু এই ভারসাম্য রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছিল এই কবির পক্ষে, ক্রমশ তিনি প্রচারবিদ হয়ে পড়ছিলেন বেশী করে, ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছিলেন মোল্লা-জীবনের দিকে, যে-জীবন সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়, যে জীবনের পক্ষপাত সুন্দরের দিকে নয়। সেই জন্য কাব্যসৃষ্টি বিঘ্নিত হয়েছে। 'হাতেম তা'য়ী' পরিকল্পনায় মহৎ এবং উচ্চাভিলাষী, কিন্তু সৃষ্টিতে 'সাতসাগরের মাঝি'র তুলনায় কম সুন্দর। তার কারণ ততদিনে ভারসাম্য, সেই প্রথম জীবনের ভারসাম্য, বিচলিত হয়েছে আদর্শবাদী প্রচারকের অত্যন্ত দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ ক্ষমতা প্রয়োগে। ফররুখ আহমদকে ভাবা যায় না তাঁর বিশিষ্ট, অননুকরণীয় সৌন্দর্যবুদ্ধি বাদ দিয়ে। 'সাত-সাগরের মাঝি'র প্রত্যেকটি কবিতায়, 'মুহূর্তের কবিতা'র প্রত্যেকটি সনেটে সেই মনের অবারিত চিত্র আছে যে-মনকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দূর যাত্রার স্বপ্ন, যে-মন একান্তভাবে রোমান্টিক।

ফররুখ আহমদের শব্দ-ব্যবহার বিতর্কিত। তিনি আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন, পুঁথি থেকে চয়ন করেছেন বাগ্‌বিধি। কিন্তু সেই সঙ্গে তদ্ভব ও তৎসম শব্দ আছে গা ঘেঁষাঘেষি করে। এবং তারা, সব শব্দ, একত্র হয়েছে তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধির সতর্ক শাসনে। এই শাসনে কোথাও শিথিলতা নেই। তাঁর আদর্শানুসারী অন্য কবিরা ব্যর্থ হয়েছেন প্রায়ই, এই সৌন্দর্যচেতনার অভাবে। ফররুখ আহমদ হননি। পুঁথির বাগ্‌বিধি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু গ্রাম্য স্থূলতা কি বিশৃঙ্খলাকে প্রবেশাধিকার দেননি কাব্যে। তদ্ভব শব্দ ও পুঁথির শব্দ বাস গড়েছে

সৎ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিবেশীর মত। তার কারণ তাদের স্বভাবে আছে একই পৌরুষ, দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা। পুঁথি আর পুঁথি থাকেনি, সামান্য-অসামান্য হয়ে উঠেছে। অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি, এই কবি আপোস করেননি। তাঁর জীবনযাত্রার উপকরণে দারিদ্র্য ছিল অবশ্যই, সামান্য ছিল গৃহ, অকিঞ্চিৎকর ছিল আয়োজন, কিন্তু তার মধ্যে, সেই দারিদ্র্যের মধ্যে অত্যন্ত ধনী ছিলেন এই কবি, সবকিছু ছাপিয়ে, ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছেন, দীনতা কখনো স্পর্শ করতে পারেনি, আত্ম-করুণা সাহস পায়নি কাছে এগুতে। রেজিয়ার সেই চায়ের দোকান, কমলাপুরের সেই মাঠ এরা নিজেরাও বড় হয়ে উঠত ফররুখ আহমদ যখন হাসতেন, অথবা হাঁটতেন। পুঁথির শব্দও তাই; ফররুখ আহমদের হাতে তারা অন্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সামান্যতা হারিয়ে।

ফররুখ আহমদ ইতিহাসকে ভালোবাসতেন। কিন্তু অনৈতিহাসিক ছিল তাঁর ইতিহাসচর্চা। তিনি পেছনে চলে যেতে চেয়েছেন, ভেবেছেন উদ্ধার করবেন অতীতের গৌরব। অনির্দিষ্ট, নাম-না-জানা জগতে যাবার কথাই বলেছেন কবিতায়, যেতে চেয়েছেন অনির্বচনীয় রহস্যালোকে, কিন্তু আদর্শবাদের অনিবারণ পরিচালনায় যে-জগতকে স্থাপন করেছেন সামনে তাতে অজানার স্থান ছিল না, কেননা সে এক পুরাতন, মৃত ও পূর্বনির্দিষ্ট জগৎ। ভ্রমণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু যে পথে যাবেন সে পথটা বন্ধ ও অন্ধ, সে-পথ শেষ হয়েছে অনিবার্য দেওয়ালে।

যে-ইসলামকে তিনি চেয়েছেন পুনরুজ্জীবিত করতে, সে-ইসলাম অবশ্যই শাসক ও শোষকের প্রচারক্লিষ্ট জীর্ণ ধর্ম নয়। ব্যবসায়ের জন্য নয়, নিপীড়ন তো নয়ই, ইসলামকে চেয়েছেন তিনি শোষণমুক্ত সমাজের নির্মাতা হিসাবে। এই চাওয়া, নিষ্ঠুর পরিহাস ভাগ্যের, তাঁকে শাসকদের কাছে নিয়ে গেছে, তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলদের কাতারে। তিনি ব্যবহৃত হয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে। পয়সা করেননি। তাঁর সকল ভ্রমণই মানসিক। পাকিস্তান সৃষ্টি বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্য দেশ-ভ্রমণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, ফররুখ আহমদ সেই প্রশস্ত পথের পথিক হননি। আরব-ইরান দূরের কথা তিনি পশ্চিম পাকিস্তানেও যাননি। সরকারের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা ছিল না, সে সহযোগিতা অনেক 'প্রগতিশীল' করেছেন, করে বিত্ত গড়েছেন নিজের, এবং প্রগতি-শীলতাকেই সন্দেহভাজন করে তুলেছেন লোকসমক্ষে। কিন্তু ফররুখের

নিজের কাজ, শোষণমুক্তি-পথের কাজ, সহায়তা দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল-তাকে। এবং সেই কাজ তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছে দেশের প্রবহমান জন-জীবন থেকে। তাঁর ইকবাল অবশ্য শাসকদের ইকবাল নন। তিনি বেছে বেছে অনুবাদ করেছেন শোষণবিরোধী ইকবালের। কিন্তু ইকবাল তো দূরের মানুষ, ইকবালের পাকিস্তান তো চূড়ান্ত বিচারে মিত্র ছিল না এদেশবাসীর। সৎ অভিপ্রায় এবং সততার সঙ্গে আদর্শবাদের চর্চা তিনি যত বেশী জোরে আঁকড়ে ধরেছেন ততই তিনি দূরে সরে গেছেন জন-জীবনের কাছ থেকে। তিনি জনতার স্তরেই ছিলেন, জনতার বন্ধু ছিলেন মনে মনে; কিন্তু তাঁর আদর্শবাদী সাধনা জনতার লাইন থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রশ্ন ওঠে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে, তখন পাকিস্তানবাদী এই কবি একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, "এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকি-স্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয় তাহলে একথা নিশ্চিত-ভাবেই বলা যায় যে, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।" (সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪)। আরো বলেছেন যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী চাইবে না বাঙলাভাষার সাংস্কৃতিক দীনতা ঘুচুক। কিন্তু তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন, "নিরক্ষর জনগণকে সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত করবার চেষ্টা এঁদের এ পর্যন্ত সফল হলেও, আর সম্ভব হবে না। সময়ের চাকা তার গতি পরিবর্তন করেছে। জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে চেপে রাখা কারুর সাধ্যেই কুলোবে না।"—এ-দুঃখ আমরা কোথায় রাখব যিনি এমন স্থিরনিশ্চয় ছিলেন জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, পক্ষে ছিলেন সাধারণ মানুষের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, তাঁর পরিবর্তিত না-হোক পরবর্তী আদর্শবাদ তাকে পরিচালিত করেছে সেই পথে যে-পথ ঐ নিন্দিত প্রতিক্রিয়াশীলদেরই উৎফুল্ল বিচরণ-ভূমি। আল-বদরেরা এ-পথেরই পথিক।

এই পথ-নির্বাচনে ক্ষতি হয়েছে তাঁর কবিতারও। কল্পনার তেজী ঘোড়াকে তিনি আটক করে রেখেছেন অসুস্থ, দুর্গন্ধযুক্ত আস্তাবলে। তাতে নষ্ট হয়েছে স্বাস্থ্য। যে-মৃত্যুকে তিনি অমন ঘৃণা করতেন সেই মৃত্যু প্রবেশ করেছে তাঁর কল্পনার জীবনে সবলে, সদম্ভে।

সমাজে অর্থনীতির যে প্রবল ও নিয়ামক প্রতাপ তাকে অবজ্ঞা করতেন ফররুখ আহমদ। সেইখানে তিনি অনেক দূরে মার্ক্সবাদীদের পথ থেকে,

আরণ্যক দৃশ্যাবলী-

যদিও তিনিও পুঁজিবাদীকে ঘৃণা করতেন পুরোপুরি। সেইখানেই প্রধান দুর্বলতা তাঁর ইতিহাসচেতনার। অর্থনীতিকে তিনি মূল্য দেননি ব্যক্তি জীবনে, দেননি সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রেও। যে জড় সভ্যতাকে তিনি পদাঘাত করতে চেয়েছেন প্রচণ্ড ঘৃণায় সেই সভ্যতার শক্তি ছিল তাঁর অর্থ-নীতিতে। তিনি যেমন ক্ষমা করেননি সভ্যতাকে, সভ্যতাও ক্ষমা করেনি তাঁকে। ফিরিয়ে দিয়েছে আঘাত, প্রত্যাঘাত করে।

জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে হয় যদি জড় সভ্যতাকে তবে সে-কাজ একা করলে চলবে না, চলেনি কোনদিন, করতে হবে আরো অনেকের সঙ্গে মিলে। সম্মিলিত হাতে টান দিতে হবে তাকে ধরে। ফররুখ আহমদ এই প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি একাকী নেমেছেন লড়াইয়ে। নেমে পাশে পেয়েছেন যাদের তারা প্রগতিবিরোধী, অনেকেই আধ্যাত্মিক বস্তুবাদী, অর্থাৎ বিষয়ের ব্যাপারে উৎকটরূপে লোভী। ফররুখ আহমদের পক্ষে ঘৃণা করবার কথা এই সব স্বার্থবাদীদের। কিন্তু তিনি ঘৃণা করতে পারেননি। আর পুঁজিবাদকে জড়বাদ বলে চিহ্নিত করায় ভ্রান্তি এই যে তাতে পুঁজিবাদের শোষণকারী চরিত্র অস্পষ্ট হয়ে যায়। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ একই চেহারায় ধরা দিয়েছে ফররুখ আহমদের কাছে, কেননা উভয়কে দেখেছেন তিনি বস্তুবাদী হিসাবে—এই দেখায় দুয়ের মধ্যকার বিপুল তফাৎটা অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

তা ছাড়া তিনি লড়েছেন ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পেছনের দিকে ফিরে। সেই দিকটা মৃত্যুর দিক। তিনি লিখেছিলেন,

> এবার যদি এ তাজী হয় বানচাল
> তক্তায় ভেসে পাড়ি দেব কালাপানি,
> হাজার জীবন হয় যদি পয়মাল
> মানব না পরাজয়।

মানেননি পরাজয়। কিন্তু সমাজ বসে ছিল না। সে মৃত্যুকে প্রবিষ্ট করে দিয়েছে তাঁর কল্পনায়, যে কথা আগে বলেছি। কবিকে সে পরিণত করতে চেয়েছে কাঠমোল্লায়। ফররুখ আহমদের কল্পনায় অসুন্দর প্রবেশ করেছে। অন্তত রুষ্ট, অকাব্যিক, অমিত্র এক সত্তা যে জেগে উঠেছে তাঁর মধ্যে সেটা সত্য। "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে নায়ক হবার কথা হাতেমেরই। কিন্তু অর্থপুস্তক-প্রণেতারা যে দেখিয়েছেন নৌফেল, প্রবল ও প্রচণ্ড প্রতিপক্ষ, নায়কবৈরী নৌফেলই আসলে নায়ক ঐ নাটকে

সেটা সত্যদর্শনই বটে। এতে অসন্তুষ্ট হবার কথা ফররুখ আহমদের। কিন্তু নীতিবাদীতে কবিতে যে বিরোধ গড়ে উঠেছিল তিনি মানুন না মানুন তা বাস্তবিক। ফররুখ আহমদ মাইকেলকে ভালোবাসতেন। সাদৃশ্য ছিল দুজনের। অমিত্রাক্ষর প্রিয় ছিল ফররুখের, দৃঢ় ছিলেন তিনিও, যশোরের ছিলেন তদুপরি। কিন্তু মাইকেল যেমন করে রাবণকে পছন্দ করেছেন রামকে ফেলে তেমন কর্ম সম্ভব ছিল না এই কবির পক্ষে।

তিনি চলে গেছেন তাঁর নিজস্বতা নিয়ে, সন্ধি না-করে, পরাজয়কে না-মেনে। অভদ্র জগৎ ভদ্রাচরণ করেনি তাঁর সঙ্গে, যেমন তিনি নিজেও করেননি জগতের সঙ্গে। অত্যাচারী সভ্যতার ধ্বংসের প্রত্যাশিত মুহূর্ত আসেনি এখনো এদেশে, কবে আসবে কে জানে। একজন লড়েছিলেন তার বিরুদ্ধে, পরাজিত হননি তিনি, কিন্তু পরাভূত হয়নি শত্রু সভ্যতাও।

বিভাজনের অপচয়

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পর্কে নজরুল ইসলামের সেই উক্তি সঙ্গত কারণেই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, "এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা, সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল....এই....বাংলায়, তা ভেবে পাইনে।" কমরেড আহমদ আজ আর ইহলোকে নেই, কিন্তু তিনি অবশ্যই জীবিত আছেন তাঁর আন্দোলনে ও লেখায়।

নিঃস্বার্থ শ্রম ছিল, ছিল সর্বস্বত্যাগী জীবন-মরণ সাধনা, একা মুজফ্‌ফর আহমদের নয়, অনেক অনেক জানা-অজানা মানুষের। তবুও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি তাঁদের আন্দোলনে। আগুনের শিখা ছিলেন, কিন্তু বহ্ন্যুৎসব ঘটাতে পারেননি অন্যায় ও অসাম্যের স্তূপে। ত্যাগের তুলনায় লক্ষ্যার্জনে অগ্রগতি হয়েছে সামান্য। কেন ঘটেছে অসফলতা তার কারণ মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর নিজের স্বল্পসংখ্যক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লেখার মধ্যে উন্মোচিত করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস এবং মুজফ্‌ফর আহমদের জীবনেতিহাস এক সঙ্গে মিশে গেছে অনেক বিন্দুতে। সেই ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ দেখিয়েছেন পার্টির প্রধান দুর্বলতা ছিল এর প্রাথমিক নেতৃত্বে। নেতারা বাইরে ছিলেন দেশের। ভেতরে এসেছেন, কিন্তু ভেতরের হয়ে যেতে পারেননি। এম. এন. রায় বিদেশীই ছিলেন—যখন দেশের ভেতর কাজ করেছেন তখনো। দূরত্ব ছিল শিক্ষার, জীবনপদ্ধতির ও রুচির। এই নেতৃত্ব দলের ভেতরে যথার্থ লোক নির্বাচন করতে পারেনি। অনেকে এসেছেন, কিন্তু এসে আক্রান্ত হয়েছেন হতাশায়। সন্ধি করেছেন, সমঝোতার পথে গেছেন, বিপ্লবের পথকে ছেড়ে দিয়ে। সুবিধাবাদী হয়েছেন কেউ কেউ, কেউ বা এসেছেন শত্রুপক্ষের চর হিসেবে, কাজ করেছেন সেই ভূমিকায়। ষড়যন্ত্রের সঙ্কীর্ণ পথে আসতে হয়েছে আন্দোলনকে, গণআন্দোলনের প্রশস্ত সুবিস্তৃত পথে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। বহিঃশত্রুর জন্য তো বটেই, ভেতরের দুর্বলতার কারণেও। নেতৃত্বের সেই দুর্বলতা উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এমন বলা যাবে না। পার্টি ভাগ হয়েছে। প্রচার হয়েছে, এবং লোকে কারণ দেখেছে

সেই প্রচারে বিশ্বাস করবার, যে পার্টিকে বাইরের দিকে বারে বারে তাকাতে হয়, চারপাশের বাস্তব অবস্থাকে তার দেখা হয়না পূর্ণরূপে, দেখা হলেও দৃষ্ট প্রয়োজনের ভেতর থেকে গড়ে তুলতে পারে না নীতি। ফলে পার্টিতে-জনসাধারণে সেই ঐক্য গড়ে ওঠেনি যা অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে বিপ্লবকে। বিভাজনের সূক্ষ্ম কিন্তু কুফলপ্রসূ রেখা অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে। দেশের মানুষের অসন্তোষ ও কল্পনাশক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে, নিজের লক্ষ্যার্জনে ব্যবহার করতে অসমর্থ হয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলন। অসন্তোষ ও কল্পনাশক্তি একত্রে জড়ো হয়েছে সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী এবং বিশেষভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে, প্রবল থেকে প্রবলতর করে তুলেছে সেই দুই আন্দোলনের প্রবাহ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অসফলতার এই কারণটি স্পষ্ট।

কারণ আরো ছিল। সেই কারণের সন্ধানও আছে মুজফ্ফর আহমদের লেখাতেই। মুজফ্ফর আহমদের লেখার বিশেষ গুণ যেটি সেটি ছিল তাঁর আন্দোলনের একটি প্রধান দুর্বলতা। মুজফ্ফর আহমদের লেখার গুণ তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, বিবরণের যাথার্থ্য এবং প্রকাশের অনুত্তেজনা। নজরুল ইসলাম ধ্যানীর দূরদৃষ্টির কথা বলেছেন। সেই দূরদৃষ্টি কমরেডের অবশ্যই ছিল। স্থির জানতেন লক্ষ্য কি, বিশ্বাস রাখতেন লক্ষ্যে এবং আবেগ ছিল পৌঁছাবেন সেই লক্ষ্যে। আবেগ ভিন্ন মহৎকর্ম সম্ভব নয়—এই হেগেলীয় মতবাদে অসত্য নেই। আবেগ ভিন্ন কমিউনিস্ট হওয়া যায় না একথাও সত্য। মুজফ্ফর আহমদ প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন, প্রচণ্ডরূপে ভালবাসতেন। সেই জন্যই তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আবেগকে তিনি বিশ্বাস করেননি। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই মুহূর্তটি উল্লেখযোগ্য, যখন এক শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার পর সকালে সেই কবিতা পড়ে শোনালেন তাঁর বন্ধু মুজফ্ফর আহমদকে। সেখানে নাটক ছিল, সম্ভাবনা ছিল নাটকীয়তার। "নজরুল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকে প্রথম পড়ে শোনাল, অথচ, আমার স্বভাবের দোষে না পারলাম তাকে আমি কোন বাহবা দিতে, না পারলাম এতটুকু উচ্ছ্বসিত হতে। কি যে কথা আমি উচ্চারণ করেছিলাম তা এখন আমার মনেও পড়ছে না"। নাটক জমেনি। নজরুল তাঁর বন্ধুকে চিনতেন, তবু তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। উত্তেজনা মুজফ্ফর আহমদের স্বভাবে নেই। নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেননি তাঁর বন্ধুর একটি বিশেষ গুণের—তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতার।

সেই গুণই তাঁকে অবিশ্বাসী করেছে আবেগে। হৃদয়াবেগের মূলধন নিয়ে আন্দোলনে আসেননি মুজফ্‌ফর আহমদ; তাঁর পুঁজি ছিল বিচারশক্তি। তাঁর লেখার মধ্যে দেখি কি অসামান্য ধৈর্য ও অভিনিবেশ সহ তিনি সাল তারিখ ঠিক করছেন, হাতড়াচ্ছেন স্মৃতি, পড়ছেন অন্যের বই, মিলিয়ে দেখছেন তথ্যের সঙ্গে তথ্য, সংশোধন করছেন, পৌঁছাতে চাইছেন যথার্থ সত্যে। নামের ও শব্দের উচ্চারণে যেমন, শব্দের ব্যবহারেও তেমনি সতর্ক—তিনি সব সময়ে সত্যকে চান দেখতে, নিরাভরণ সত্যকে। এই অতিকথন ও উত্তেজনার দেশে মিতভাষণে বিদেশী তিনি।

কিন্তু এই গুণেই তাঁর দুর্বলতা—যদি বলতে চাই বলতে পারি। তিনি নিজেই বলেছেন এমনই স্বভাব তাঁর, বাহ্‌বা দিতে পারেন না, পারেন না উচ্ছ্বসিত হতে। ওদিকে অতিঅন্তরঙ্গ ও গুণমুগ্ধ বন্ধুও বাহ্‌বা চান, চান উচ্ছ্বাস। এটা তাই অবধারিত ছিল যে, যে-নজরুল ইসলাম তাঁর বন্ধু ছিলেন, সহকর্মী ছিলেন সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে, তিনি ভিন্ন পথে যাবেন, চলে যাবেন অন্যত্র, অন্যের সঙ্গে—যারা হৈ চৈ ভালবাসে, উল্লাস করে, তাদের সাহচর্যে।

মতবাদের দিক থেকে যতই নিকটবর্তী হোন না কেন, স্বভাবের দিক থেকে দুই ভিন্ন গ্রহের মানুষ তাঁরা। 'গণবাণী' ও 'লাঙ্গলে' লিখেছেন দুজনে, কিন্তু দুজনের লেখা দুই প্রকৃতির। মুজফ্‌ফর আহমদের "প্রবন্ধ সঙ্কলনে", 'কৃষক ও শ্রমিক এবং শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়' নামে রচনা আছে একটি—এক যুব সমাবেশে প্রদত্ত অভিভাষণ সেটি। এর আবেদনের সঙ্গে নজরুল ইসলামের উদ্দীপক অভিভাষণসমূহের সাদৃশ্য নেই। মুজফ্‌ফর আহমদের বক্তব্য স্পষ্ট, কিন্তু তাঁর লেখার চিত্তহরণ ক্ষমতা যৎসামান্য। ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে-ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি তা আর কেউ লিখতে পারতেন না, দলিল হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য অসাধারণ। কিন্তু এই গ্রন্থ পড়ে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় না—না কমিউনিজমের প্রতি, না ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি। শ্রদ্ধাও বাড়ে না। বরং একটা বিষণ্ণতার সৃষ্টি হয় মনে। ধারণা জন্মে যে স্বার্থবাদী, বিপথগামী, প্রতারক ও বিকলাঙ্গরাই যেন বেশী বেশী করে ভিড় করেছেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে, এবং বিফলতাই এর ললাটলিখন। কখনো কখনো মনে হয় যেন একটি তথ্য-সরবরাহ কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছেন মুজফ্‌ফর আহমদ, বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেছেন খুঁটিনাটি তথ্যের সুনিপুণ সংগ্রহে; হৃদয় দিয়ে দেখছেন না কিছুই, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কোন বিশ্লেষণ দিচ্ছেন

না আদৌ। শুধু বিষণ্ণতা নয়, করুণারও উদ্রেক হয় অজান্তে; লেখকের জন্য করুণা, তাঁর আন্দোলনের জন্য করুণা। অপচয় দেখে হতাশা আসে।

নজরুল ইসলামের সেই চলে যাওয়া একজন বন্ধুর বিচ্ছেদ শুধু নয়, এযাত্রা একটি যুগের, বাংলাদেশের যৌবনের। যৌবন চলে গেছে জাতীয়তাবাদের পথ ধরে সন্ত্রাসের বিপজ্জনক ঠিকানাতে। প্রাণ দিতে এবং প্রাণ নিতে। তরুণ চায় উত্তেজনা, চায় সদ্য সদ্য ফল। মোটা মোটা সত্যকে বড় বড় হরফে লেখা দেখতে চায় সে। চায় না সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ। তার সময় নেই, ধৈর্য নেই, মৌন সাধনায় যেতে চায় না সে। এবং তরুণ বাহবা চায়, চায় উচ্ছ্বাস, চায় স্বীকৃতি। সে আত্মত্যাগী যেমন একদিকে, অন্যদিকে বুভুক্ষুও বটে; তা ছাড়া পৌত্তলিকও। বিগ্রহ চায়, চায় নেতা।

মুজফ্‌ফর আহমদও প্রতীক—তাঁর আন্দোলনের। শ্রমে ও সাধনায়, ত্যাগে ও নিষ্ঠায় এই আন্দোলনের মতই তিনি। সেই সঙ্গে আছে তত্ত্বে আগ্রহ। কমিউনিজম ছিল অচেনা অজানা পথ, তত্ত্বের আলো ফেলে তাকে চিনে নিতে হয়েছে পদে পদে। কিন্তু যৌবনের আবেগ কোথায় যাবে, যদি বুদ্ধি তাকে সরিয়ে রাখতে চায় দূরে? আবেগ চলে গেছে যেখানে যাবার, সুভাষ বোসের পথে নয়ত বুদ্ধদেব বসুর দিকে। সন্ত্রাসবাদী হয়েছে সে, অথবা হয়েছে 'আধুনিক'। অর্থাৎ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের এই বিচ্ছিন্নতায় রাজনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তা অসামান্য, প্রায় অপূরণীয়। বুদ্ধির সাহায্য না পেলে আবেগ তার দৃষ্টিশক্তি হারায়, অন্যদিকে আবেগের অবলম্বন ভিন্ন বুদ্ধি হারায় চলৎশক্তি। বুদ্ধি ও আবেগ উভয়ের দুর্বলতা রাজনীতিতে এসে লেগেছে, একের দৃষ্টিশক্তি যে মিলবে অন্যের চলমানতার সঙ্গে তা হয়নি। ফলে ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি সাধারণ মানুষের। জাতীয়তাবাদী নেতারা গ্রাস করে নিয়েছেন মানুষের কল্পনা, তারা ভোট নিয়েছেন, জিন্দাবাদ নিয়েছেন, বিনিময়ে দিয়েছেন সামান্য, দুর্ভোগ ভিন্ন।

নজরুল বলেছিলেন কি করে জন্মালেন মুজফ্‌ফর আহমদ বাংলাদেশে। বুদ্ধির প্রতি নিষ্ঠায় তিনি বিদেশী-ই। এবং সেখানে, করুণ ঘটনা এমনও ঘটে, তিনি এম. এন. রায়ের মতই, যদিও দুজনের মধ্যে অনেক দিক দিয়ে ব্যবধান দুস্তর। (যদিও এম. এন. রায়ের মত 'বিদেশী' নন তিনি কোন দিক দিয়েই, স্যুট পরতেন না, তাঁর স্ত্রী ছিলেন না বিদেশিনী, ভাষা ছিলনা ইংরেজী)।

জাতীয় ঐক্যের সমস্যাটা খুব বড় সমস্যা আমাদের দেশের জন্য। কিন্তু জাতীয় সংবেদে বুদ্ধি ও আবেগে এই বিচ্ছেদ আরো বেশী ক্ষতিকর, কেননা এ ঐক্যের অভাবেই অন্য ঐক্য আসছে না, সম্ভব হচ্ছে না আসা। পার্টিতে-জনসাধারণে দূরত্বও অনেকাংশে সেই কারণেই।

কৃষ্ণ সাহেবদের ক্রোধ ও লড়াই

নীরদ সি. চৌধুরী বহুবার বাবু বলেছেন নিজেকে, বাবু যে নন একেবারেই এই কথাটা পরিষ্কার করে বলার জন্যই। এই যে নিজেকে বাঙালী বাবু বলা বারংবার, এর মধ্যে বিনয়টা ছদ্মবেশ, যথার্থ বিনয় নেই এতটুকু, বরং যুযুৎসা আছে পুরোপুরি। যেমন বিনয় ছিল না নিজের যখন পরিচয় দিয়েছিলেন an unknown Indian বলে, The Autobiography of an Unknown Indian (1951) বইতে। সে-বই লিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করতে চেয়েছেন a well-known Indian হিসাবে। যেমন বিনয় নেই, থাকে না, প্রহসনের পূর্ববঙ্গীয় চরিত্রে, যারা পূর্ববঙ্গীয় নয় এই কথাটা বলে এমন উচচারণে যাতে মুখ খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই অনবগুণ্ঠিত হয়ে পড়ে তাদের প্রকৃত পরিচয়।

নীরদ চৌধুরীর পরিচয়ও গোপন নেই তাঁর রচনাবলীতে। তিনি বাবু একজন, বাঙালী বাবু—যথার্থ। কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন, প্রচণ্ড ও নিশ্ছিদ্র ঐকান্তিকতার সঙ্গে সচেষ্ট রয়েছেন, সাহেব হবার জন্য; আর ঐ আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই বেরিয়ে আসছে আসল মানুষটি—প্রহসনাধিবাসী পূর্ববঙ্গীয়দের বাঙাল পরিচয়ের মতই। প্রকৃত বাবুর এই খাঁটি সাহেব সাজার প্রাণপণ প্রচেষ্টা, প্রচেষ্টা-সৃষ্ট ও বর্ধিত ক্রোধ, তার আক্রমণ, সমস্তটাই যুদ্ধ এক প্রকারের। এবং এই যুদ্ধ নীরদ চৌধুরীর একার নয়, তিনি অনেকের একজন; তিনি প্রতিনিধি একটি বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতার যার হাত থেকে আজো আমরা অব্যাহতি পাইনি। এশুধু ইংরেজের আচার-আচরণ বা ভাষার নকলনবিশী নয়, এ হচ্ছে আত্ম-অবিশ্বাসী হীনমনের পৌত্তলিক বীর-পূজা, সহজ করে বলতে গেলে, দাস-মনোবৃত্তি। (বলাই বাহুল্য, বাবুতে মিয়াতে বিশেষ কোন তফাৎ নেই এ-ক্ষেত্রে, প্রধান তফাৎ নামের।) নীরদ চৌধুরী যদি একা হতেন, একাকী হতেন তবে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হতেন না, যতটা হয়েছেন তিনি প্রতিনিধি বলে।

প্রথমেই মীমাংসা করতে হয় একটি স্বাভাবিক প্রশ্নের। বাবুদের এই সাহেব হতে-চাওয়া এর কারণ কি? কারণটা স্পষ্ট, বাবুরা হচ্ছেন কলাবরেটর, দালাল তারা সাহেবদের, এবং ঐ-কাজ করতে যেয়ে, করার মধ্যে

নিমগ্ন থেকে, তাঁদেরও শখ হয়, আহ্লাদ জাগে চিত্তে যে, সাহেব হবেন। সাম্রাজ্য যাতে টিকে থাকে ও চালু থাকে সে ব্যাপারে তাঁদের একটা ভূমিকা ছিল সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ। এরা একেবারে নিজেদের লোক ছিলেন ইংরেজদের।

কিন্তু সম্ভব তা হয়নি সাহেব হওয়া, অবশ্যই, এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই। হয়নি যে তা বোঝা যায় যখন এরা মতামত ব্যক্ত করেন স্বদেশ ও স্বদেশবাসী সম্পর্কে, একদিকে প্রকাশ করেন ক্রোধ ও বিরক্তি, অন্যদিকে প্রশংসা করেন এমন সব বিষয়ের যেগুলো প্রগতিবিরোধী বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। বোঝা যায় সাহেব সাজার গলদঘর্ম প্রচেষ্টায় এবং স্বদেশ-বাসী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নকারী আত্মকরুণায় এককালে ইংল্যাণ্ডের রাজা যেমন স্বদেশে রাজা, বিদেশে সম্রাট, এঁরাও তেমনি ঘরেতে বাবু, সাহেব বাইরে। গত বছর (১৯৭৪) Times Literary Supplement-এ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে যেয়ে নীরদ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, It has been the misfortune of every great Bengali of modern times to be persecuted or haunted out of the country by his countrymen. Jerusalem which stoned its prophets was not a patch on Bengal in this respect. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই বলছেন, রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্যের কথা; কিন্তু এ দুর্ভাগ্য নীরদ চৌধুরীর নিজেরও, তাই তিনি মনে করেন; তিনিও মর্যাদা পাননি স্বদেশে, দিল্লীতে থাকতে হয়, সুখী হতেন ইংল্যাণ্ডে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে পেলে। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আরো একটি আক্ষেপ আছে তাঁর। এই কবি ইংল্যাণ্ডে নিজের স্থান করে নিতে পারলেন না, হেনরী জেমস না-হোক, জোসেফ কনরাডের মত একটি স্থান তিনি পেলেও পেতে পারতেন, কিন্তু হায়, তা তিনি পেলেন না। না পাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে একটি হল, he could never have lived in England, for he could not have adjusted himself to English life. He had to live among Bengalis even though he quarrelled with them. আরো একটি কারণ এই যে, he could not develop his English. মোটকথা আক্ষেপ এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি নীরদ সি. চৌধুরী হওয়া, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যি তা হতেও চাননি, বাবু সাহেবদের সুখ-স্বর্গের স্বপ্ন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজী সাহিত্যের জোসেফ কনরাড হতে চাননি তিনি, বাঙলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ হওয়াকে তার চেয়ে বড় কাজ বিবেচনা করেছেন। ঐখানেই

ব্যবধান বাবু সাহেবদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের, এবং এই ব্যবধানের কারণেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন। বাবু সাহেবদের পক্ষে বড় জোর নীরদ সি. চৌধুরী হওয়া সম্ভব বিস্তর শ্রমে, বহু সাধনায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নৈব চ নৈব চ।

বাবুদের সঙ্গে হবু সাহেবদের একটা মৌলিক তফাত আছে। বাবুরা দালালি করেন, হবু সাহেবেরা নকলনবিশী। নীরদ সি. চৌধুরী দালালি ছেড়ে নকলনবিশী ধরেছেন। এবং শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ যে, নকল করবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁরা দেননি এবং সুযোগ যখন সামান্য কিছু দিয়েছেন তখনও প্রচুর উৎসাহ দেননি। এই নিয়ে প্রচণ্ড একটা অভিমান জমেছে বুকের মধ্যে।

The Continent of Circe (1965) তিনি অভিযোগ করেছেন, there was hardly one Englishman in India who liked, or even as a matter of policy thought it desirable, that we should write English or absorb Western culture. They had a feeling that by being imitated by us their traditions would be polluted; an even so generous an Englishman as Bethune advised a Bengali who had written in English to go over to Bengali. Of course, this led to the creation of modern Bengali poetry, but it was no service to the British empire (পৃঃ ১২৭)। ইংরেজের এই সঙ্কীর্ণতায় বাঙালীর লাভ হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে ইংরেজের। কিন্তু বাবুদের বিবেচনা তো বাঙালীর লাভ লোকসান নিয়ে নয়, তাদের দিবস-রজনীর সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রভূমিতে আছে ইংরেজের স্বার্থ। ইংরেজ যে স্বীয় স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন এমন অভিযোগ অবশ্যি বাবুরা ভিন্ন অন্য কেউ করবে না। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ইতিহাসও সে-কথা কখনো বলবে না। কিন্তু বাবুদের ব্যাপারই ওই, প্রভুরা বিদায় নিলে তাদের ভীষণ অসুবিধা, বিপাক ভারি।

কিন্তু শুধু বেথুন সাহেব তো নয়, শুধু ইংরেজরা নয়, বাঙালীদের মধ্যেও যাঁরা বাবু হলেও সাহেব হতে চাননি কিছুতেই, সাহেব-সাজার সামান্যতাটা যাঁরা ধরে ফেলেছিলেন শুরুতেই তাঁরা, যেমন মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁরা বুঝে নিয়েছেন ইংরেজী চর্চা কতটা করা যেতে পারে, বুঝে নিয়েছেন এই সত্য যে সাহিত্যসৃষ্টি করতে হলে মাতৃভাষার দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। ইংরেজীতে লেখা শুরু করেছিলেন তাঁরা,

কিন্তু অগ্রসর হননি অধিক দূর, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান ছিল প্রখর, বেথুন সাহেবদের মতই। যে জ্ঞান সাহেবীয়ানার যশপ্রার্থীদের আয়ত্তে নেই।

অভিমান আরো আছে, আরো বেশী তপ্ত। ঐ বইতেই নীরদ চৌধুরী লিখেছেন, ইংরেজরা সম্যকরূপে ব্যর্থ হয়েছে এ দেশবাসী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে। এই ব্যর্থতা, এই Failure, stands in astounding contrast with their knowledge in the non-human sphere, when it is a question of a kind of fauna only, and not a fellow mind. Since I have spoken with undisguised admiration of that knowledge I think I have earned the right to criticize the failure. ইহার চেয়ে হতেন যদি বনের কোন পশু। হায় বাবু-সাহেব, এত জেনেছেন এটুকু জানেননি, বাগানের ফুল বা বনের পশু অনেক বেশী সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক গৃহভৃত্যের তুলনায়! ভারতবর্ষীয়দের সম্পর্কে ইংরেজ অবশ্যই জানতে চাইত যদি তারা আমাদেরকে fellow minds মনে করত। মুস্কিল এই যে তা তারা করে না, স্বাভাবিক কারণেই, যেমন নাকি নীরদ চৌধুরী মানুষ মনে করেন না তাদের গৃহভৃত্যদের। অর্ধেক মানুষ পশুরও অধম। নীরদ চৌধুরী যে বলেছেন তিনি সমালোচনা করার অধিকার অর্জন করেছেন এই কারণে যে ইংরেজদের পশু-বিষয়ক জ্ঞানের তিনি অকুণ্ঠ সাধক, সে-দাবি যথার্থ নয়; তাঁর দাবির প্রকৃত ভিত্তি এইখানে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যের তিনি একজন বিশ্বস্ত ভক্ত। সে-সাম্রাজ্যর রাজনৈতিক অপসারণে তিনি মর্মাহত হয়েছেন—যেমন ভৃত্যেরা হয় প্রভুর পতনে, প্রভুর কারণে নয়, নিজের কারণে আসলে, বাস্তুহারা হবার সমূহ ও বাস্তবিক আশঙ্কায়।

ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যাওয়া দুঃসহ হয়েছে নীরদ চৌধুরীদের পক্ষে। Autobiography বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্মৃতির প্রতি: To the memory of the British Empire India which conferred subjecthood on us but withheld citizenship ; because all that was good and living within us was made, shaped, and quickened by the same British rule. অধীনতা, subjecthood দিয়েছে, দেয়নি নাগরিক অধিকার। না দিক, তবু কৃতজ্ঞ, কেননা all that was good and living within as was made, shaped, quickened by the same British rule. পিতৃভূমি কিশোরগঞ্জের অবদান সামান্য, সবটাই বিদেশী। যতটুকু ভালো, জীবন্ত যেটুকু তার সবটাই

আমদানী করা। জ্ঞান নয়, সংবাদ নয়, বুদ্ধিমত্তা নয়, মূলসত্তাই গড়ে উঠেছে বিদেশের হাতে। শুধু আজ বলে নয়, নীরদ চৌধুরী দেখেছেন যুগে যুগে আমাদের ভালো যেটুকু যতটুকু তার সবটাই বিদেশীরা এদেশে এসে গড়ে-পিটে নিজ হাতে তৈরী করে দিয়ে গেছে। Autobiography-তে তিনি বলেছেন আর্যরা এসেছে, এসেছে মুসলমান, তারপর ইংরেজ, এসে উপহার দিয়েছে new ethnic elements, new languages, new cultures, new social organisation and new political concepts and organisations (পৃঃ ৪৯৫)। এই সকল অবদানের বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক; যে-সন্তুষ্টচিত্ততা নিয়ে বলছেন কথাগুলো, যে-কৃতজ্ঞতাচ্ছন্নতা স্বরভঙ্গিতে আমাদের আপত্তি সেখানেই। এখানে প্রকাশ পেয়েছে এমন একটা পরাশ্রয়পরায়ণতা ও পরমুখাপেক্ষিতা, আত্ম-সম্মানজ্ঞানের এমন একটা পীড়াদায়ক অভাব যা অত্যন্ত ক্ষতিকর যে-কোন জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির পক্ষে। নীরদ চৌধুরীরা স্বাধীনতা চান না; সেই না-চাওয়ার উপযোগী মানসিকতা নিজেরাই গড়ে নিয়েছেন তাঁরা, এবং সেই মানসিকতার পক্ষে প্রচারণা করছেন মহোৎসাহে। তবে লিখেছেন ইংরেজীতে; বাঙলাভাষায় এ-ধরনের রচনা ১৯৪৭-এর পরে লেখা কঠিন হত, ভাষার স্বকীয় প্রতিভা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। ইংরেজদের রাজ-নৈতিক পতনের দায়-দায়িত্ব তিনি ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কাঁধেই চাপাতে চেয়েছেন, প্রধানত। এটা অবশ্যই অসঙ্গত। কর্মচারীরা যদি আরো বেশী বিজ্ঞ হতেন, যদি হৃদয় জয় করতে আরো বেশী আগ্রহী হতেন তবে আরো অধিক সংখ্যক নীরদ চৌধুরী হয়ত তৈরী হত, ভারতবর্ষে, কিন্তু ইংরেজকে চলে যেতে হতই, সে-সূর্যের অস্তলগ্ন ঘনিয়ে এসেছিল অনিবার্য রূপে। ইতিহাসের অতিবড় পাঠক নীরদ চৌধুরী অতীত ইতিহাস অনেক পড়েছেন, কিন্তু লক্ষ্য করেননি বর্তমান কালের ইতিহাস। করলে দেখতেন সাম্রাজ্যবাদের পতন বাবু-সাহেবদের সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পতার উপর নির্ভর করে না, করে বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্বের উপর। বাবু-সাহেবরা নিজেদের সম্বন্ধে যা ইচ্ছা ভাবুন বা লিখুন না কেন তাঁদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই, তাঁরা নিতান্তই পরগাছা।

কিন্তু শুধু কর্মচারী নয়, দোষ খোঁজার উত্তেজিত ব্যগ্রতায় দোষ চাপাতে চেয়েছেন ভারতবর্ষ বিষয়ে সাহিত্যরচনাকারী ইংরেজ লেখকদের অপ্রশস্ত স্কন্ধেও। যেমন ই. এম. ফর্স্টারের সেই প্রসিদ্ধ উপন্যাস A Passage to

India সম্পর্কে তাঁর ধারণা (Encounter পত্রিকায় লিখেছেন, পঞ্চাশ দশকে) : the novel helped the growth of the mood which enabled the British people to leave India with an almost Pilate-like gesture of washing their hands of a disagreeable affair. অতএব খুবই অন্যায়, ভীষণ ন্যক্কারজনক কাজ করেছেন ফস্টার এই উপন্যাসটি লিখে। কিন্তু অন্য কেউ, এমনকি কোন ইংরেজও, বলছেন না একথা, বলছেন একজন ভারতবর্ষীয়। কোন ইংরেজ লেখক একথা লিখতে পারতেন না, ভদ্রতায় বাধত, কিন্তু বাবু-লেখকরা সাহেবী ভদ্রতায় বিশ্বাস রাখেন না, তাঁদের একটাই আক্ষেপ, হায় ইংরেজের কেন পতন হল, এবং সেই আক্ষেপের বাষ্পাচ্ছন্নতায় একে দোষ দেন, ওকে দোষ দেন, যাকে পান তাকেই দায়ী করেন।

উপন্যাসের রাজনৈতিক শক্তি বিষয়ে যে অতিশয়োক্তি আছে উপরের উক্তিতে সেটাও বাবুদের বৈশিষ্ট্য। বাবুরা সাহিত্য ও জীবনকে আলাদা করতে পারেন না, জীবনকে দেখেন বইয়ের দৃষ্টিতে, যেমন ৫৭ বছর বয়সে ইংল্যণ্ডে গিয়ে তিনি বাস্তবিক ইংল্যাণ্ড দেখতে পেলেন না, দেখতে পেলেন পুস্তকের দেশকে। তারাশঙ্করের একটি স্বাস্থ্যান্বেষী চরিত্র বলেছে, অম্ল, ডিসপেপসিয়া হচ্ছে বাঙালীর প্রধান অসুখ। সব বাঙালীর না হোক বাঙালী বাবুদের অবশ্যই। তা তিনি যত বড় বাবুই হোন না কেন।

কিন্তু উদ্যম-সাধনা মান-অভিমান, এত কিছু করেও প্রকৃত ইংরেজ হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল কি? ছিল না যে তা বোঝার জন্য বড় রকমের বুদ্ধির আবশ্যক হয় না। যতই তিনি ইংরেজী শিখুন, বই পড়ুন, স্তব করুন ইংরেজের, নাড়া-চাড়া করুন মদ ও বেড়াল নিয়ে, পোশাক পড়ুন যতই সাহেবী, হাঁটুন যতই জোরে সাহেবী চালে (তাঁর বই পড়ে জানা যায় এসব বিষয়ে), কিশোরগঞ্জে যাঁর বাল্যকাল কেটেছে, যাঁর পিতার আয় ছিল না অত্যধিক, ইংল্যাণ্ড যাঁর কাছে স্বপ্নের দেশ শুধু (৫৭ বছর বয়স হওয়ার আগে সুযোগ হয়নি সে-দেশে যাবার), ইংরেজী যিনি শিখেছেন বাঙালী শিক্ষকদের নড়বড়ে হাতে (বার বার বলেছেন সে-কথা), তাঁর পক্ষে ইংরেজ হওয়া পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের তুলনায় সহজ হবার কথা নয়। সেই তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল, উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ চলে, জহরলাল নেহেরুর পক্ষে, ইংরেজী যাঁর আয়ত্তে ছিল মাতৃভাষার মত, শিক্ষা-দীক্ষা যাঁর হয়েছে হ্যারো ও ট্রিনিটিতে, পিতা যাঁর ছিলেন মতিলাল নেহেরু।

Statesman পত্রিকা তাঁকে লেখক করেছে, বলেছেন নীরদ সি. চৌধুরী, The 100 years of the Statesman, 1874-1974 বইতে; ঐ বইতেই দেখা যাচ্ছে ১৯৩৬ সালের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত নেহেরুর বক্তৃতা পড়ে পত্রিকাটির মনে হয়েছিল যে, This is not an Indian speaking. In no sense whatever are these words of an Indian. নেহেরুর সমস্যা ও নীরদ চৌধুরীর সমস্যা দুই বিপরীত প্রান্তবর্তী: নেহেরুর চেষ্টা ছিল আরো বেশী ভারতীয় হওয়ার, নীরদ চৌধুরীর আরো বেশী ইংরেজ হওয়ার। তবু, শেষ পর্যন্ত, ঐ সম্পাদকীয়তেই বলা হয়েছে, They speak and write like Englishmen ; they think and feel like Englishmen ; but in the last resort they are not Englishmen, they are Indians. নীরদ চৌধুরীদের সম্পর্কে এতটুকুও বলা যাবে না। বলতে গেলে বলতে হবে, তাঁরা কথা বলেন না ইংরেজদের মত, লিখেনও না, চিন্তা বা অনুভবে ইংরেজ নন তাঁরা, কিন্তু চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন প্রতিনিয়ত, চেষ্টা করেন ইংরেজ হবেন। পারেন না হতে, না-পেরে রুষ্ট হন। যত রাগেন ততই ধরা পড়ে বাবু তাঁরা আসলে, ইংরেজের অনুগ্রহভিক্ষুক, উৎপাদনশক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুত, পরগাছা তাঁরা —স্বভাবে চরিত্রে।

বাবু-পরিচয়ের বিস্তর প্রমাণ নীরদ চৌধুরীর লেখায় আছে। অনুগ্রহ-ভিক্ষার উল্লেখ করেছি, ইংরেজ যাতে টিকে থাকে তার পক্ষে কাজও করেছেন প্রত্যক্ষ। যেমন, Statesman-এর শতবার্ষিকী-গ্রন্থে তাঁর প্রবন্ধ-পাঠে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ-চালনা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এমন প্রবন্ধ লিখেছিলেন Statesman-এ যে, সরকারী চাকরি হয়েছিল অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে, প্রচার-সংক্রান্ত চাকরি। পুলিশের রিপোর্ট কিন্তু সুবিধার আসেনি; পুলিশ বলেছে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ওঠা-বসা আছে এই ব্যক্তির। তবু বড় ইংরেজ মানেনি সে-আপত্তি, চাকরি দিয়েছে বিনা দ্বিধায়। এবং নীরদ চৌধুরী কাজ করেছেন প্রচারণার, সন্তুষ্ট মনে।

এই পুলিশী ঘটনায় কৌতুক আছে একটু। নীরদ চৌধুরী যদি কমিউনিস্ট হন, অথবা সহযাত্রী, তবে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট বিরোধী কে বা কারা? ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে প্রশংসা করবার অনেক সুযোগ সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে সুযোগ নেই প্রশংসার। (কিন্তু ইংরেজ ভারতীয়দের বিশেষ করে যে ভারতীয়রা লেখাটেখা করে

তাদের, কি চোখে দেখতো সেটা জানা যায় এ ধরনের পুলিশ রিপোর্ট থেকে। কিন্তু, বলাবাহুল্য, সেটা জানতে চান না বাবু-সাহেবেরা, জানলে অসুবিধা হয় ভক্তি ও অনুরাগ-ভিক্ষাকে অক্ষুণ্ন রাখতে।)

কিন্তু সাহেবী দিকটার অমর্যাদা ঘটালে আমরা অন্যায় করব। হবু-সাহেব হিসাবে তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ **lay with a more or less complete westernisation**। আজ নয়, একথা বলেছিলেন তিনি ১৯২৫ সালে, তাঁর প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী লেখায়। কিন্তু আজ যে বদল করেছেন এ-মত তা নয়, যদিও দেখেছেন যে ঐ পথে, ঐ **a more or less complete westernisation**-এর পথে অগ্রসর হয়নি ভারতীয় সমাজ। অগ্রসর হয়নি বলেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এবং ক্রুদ্ধ। এই মতটি তিনি ব্যক্ত করেছিলেন (তিনি বলেছেন **proclaim** করেছিলেন, তা **proclamation** বটে, তিনি কথা বলেন না, বক্তৃতা করেন, কেননা লিপ্ত আছেন যুদ্ধে, বাক-সংগ্রামে) ব্যক্ত করেছিলেন একজন ইংরেজের, বড় ইংরেজেরই, উক্তির প্রতিবাদ করে। সেই সাহেব (খাঁটি) লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষে **westernisation** সম্ভব নয়, কেননা **Hinduism was the strongest emotional force in India, and (that) its influence would triumph over the cultural impact of the west.** খাঁটি সাহেব যে খাঁটি কথা বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই; এই উপমহাদেশে আধুনিকতাকে (যে চরিত্রেরই হোক না-কেন, পশ্চিমী কি সমাজতান্ত্রিক) এখনো প্রচণ্ড লড়াই লড়তে হচ্ছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার সঙ্গে, এবং এই রক্ষণশীলতা—কৌতুক এখানেও—আছে নীরদ চৌধুরীদের মত সাহেব হওয়ার প্রাণপণ-সাধক বাবুদের মধ্যেও। অনেক ক্ষেত্রেই এঁরা সামাজিক অগ্রগতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারণকারী। যেমন, **The Continent Circe**-তে অতি যত্নে লিখিত ইংরেজীতে তিনি প্রশংসা করেছেন গরুর গোহালের কাব্যময়তার। গোহালে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালানো—সে-**ritual** ভুলবার নয়, তাঁর কাছে। আক্ষেপ করে বলেছেন, **Once upon a time three Kings came to a cowshed to see a great beauty. Let alone kings, nobody has ever come to our cowsheds, and our new rulers are trying to destroy the beauty without seeing it.** (পৃঃ ১৭৮)। অর্থাৎ ডেইরী ফার্ম গড়তে যান যদি কেউ দুর্বাশার অভিশাপ দেবেন তাঁকে নীরদ সি. চৌধুরী, যে-চৌধুরী পুরোদস্তুর সাহেব একজন বহিরঙ্গ আচরণে। যদি তিনি কবি হতেন, ভাবতাম, এ নিছক-সৌন্দর্য-

বিলাস, ধবলীকে গোহালে আনা, অথবা গোধূলির ক্লান্ত আগমন দেখা, এমনকি গোচোনাও কাব্যে সুন্দর। কিন্তু সমাজবিষয়ক প্রবন্ধে ব্যাপার ভিন্ন। শুধু গরুর নয়, সেই বহুনিন্দিত ও অত্যন্ত অভিশপ্ত বর্ণাশ্রম প্রথারও ভক্ত তিনি। বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে দুটো প্রচলিত অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। (১) বর্ণাশ্রম প্রথা has been creating diversity and disunity; এবং (২) it interferes with economic freedom। উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু মেনে নেননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে অতি-দ্রুত ও সুনিশ্চয়তার সঙ্গে, নাকচ করে দিয়েছেন উভয় অভিযোগ। উল্টো বলেছেন, Taking the system as a whole I would describe it as a social organisation which contributes to order, stability and regulation of competition। তিনি এ সমস্ত জিনিসই চান কায়মনোবাক্যে—আইন, শৃঙ্খলা, স্থিতাবস্থা, যে যেখানে আছে তার সেইখানে থাকা। সামাজিক পরিবর্তনের শত্রু তিনি অতি-প্রকাশ্যে। এবং যে সমস্ত হতভাগারা caste system-এর বিরুদ্ধে লেখালেখি করে সেই সমস্ত reformers of Hindu society and their imitators-দের সম্পর্কে তাঁর হুঁশিয়ারি: please keep your tongues and pens off the caste system (পৃঃ ৬২)। আরো বলেছেন, If I could believe that the caste system was going to be destroyed by the palaver I could have added. Please do not pulverize a society which have no other forcce of cohesion into amorphous dust. অর্থাৎ শংকা এমত যে, যদি বর্ণাশ্রম যায় তবে সমাজ-সংসার সব যাবে, বালুকণায় পরিণত হবে সমস্ত কিছু। স্মরণীয় যে, ষাট দশকে 'দেশ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি, হিন্দু রমণীদের মুসলমানী পোশাক গ্রহণে প্রবল আপত্তি করে। মোট কথা, নীরদ সি. চৌধুরী সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেন কি না সে খবর জানাননি, তবে দিলে কোন দলে দেবেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব ভজনালয়স্থিত বীরদের কথা আসে। তিনি বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। কিন্তু কেন? বঙ্কিম সাহিত্য-সম্রাট বলে? তেমন সাধারণভাবে দেখার লোক বাবু-সাহেবেরা নন। নীরদ সি. চৌধুরীর কাছে বঙ্কিম হচ্ছেন, the creator of Hindu nationalism (Encounter এ লিখিত প্রবন্ধ)। The Continent of Circe-তে লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র হলেন the most powerful intellect produced by India in the nineteenth century, and one of the

greatest of Hindus, perhaps equalled in the past—the whole of the Hindu past—only with great Shankara (পৃঃ ৮৭)। শঙ্করাচার্য শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কিনা, যে আধ-ডজন নাম তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গে আসবে তাঁদের মধ্যে কে বড় কার চেয়ে এ সকল প্রশ্ন এখানে মীমাংসা সম্ভব নয়; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে এমনকি শ্রেষ্ঠতম বাঙালী মনীষী, এ সিদ্ধান্তই বা কবে কে করল? রবীন্দ্রনাথ এই তুলনার বাইরে কিনা সেটাও জানা আবশ্যক। তা জানাননি লেখক। Times Literary Supplement-এ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নীরদ চৌধুরীর বক্তব্য এবং অন্যান্য রচনায় বক্তব্যের অভাব দেখে অনুমান করা নয় যে, রবীন্দ্র-পূজারীদের একজন তিনি নন। বঙ্কিম সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়, তাঁর দৃষ্টিতে। এবং তাঁর কোন লেখাতে চোখে পড়ার মত উল্লেখ নেই বিদ্যাসাগরের, এমনকি সাহেব-হতে-চাওয়া মধুসূদনেরও নয়। তবে উল্লেখ আছে রামমোহনের ও বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দ ধর্মীয় পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন, নীরদ চৌধুরীর মধ্যে যে ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতা আছে সেখানে বিবেকানন্দ পূজনীয় হবেন এতে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু আরো একটি বিশেষ দাবি আছে বিবেকানন্দের, নাকি তিনি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন ইংরেজদের। Autobiography-তে আনন্দের সঙ্গে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন নীরদ চৌধুরী বিবেকানন্দের একটি উক্তির, 'They (ইংরেজরা) are a nation of heroes, they are the Kshatryas"। নাকি আরো বলেছেন বিবেকানন্দ যে, একই কাণ্ডের দু'টি শাখা প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু। তাঁরা had settled in two widely separated lands, and worked out in different circumstances the problems of life, each in its own particular way. But now they were meeting—the ancient Hindu was meeting the ancient Greek on Indian soil as a result of the English conquest of India, because Indian civilization was Greek in everything (পৃঃ ৪২৪-২৫)। তাহলে, এরপরে আর কি চাই? ইংরেজের ভারত বিজয়ে এত বড় উপকার হল, দুই শাখা একত্র হল, আধ্যাত্মিক জগতে বিপ্লব সাধিত হল তবু, তবু কী আমরা নিন্দা করব উপনিবেশবাদের, বলব সে হচ্ছে শত্রু মানুষের, অথবা এই অবদানটিই বা কম কিসে যার কথা নীরদ সি, চৌধুরীর বিবেকানন্দ বলেছেন এক বক্তৃতায়, Had it not been

for the power of the Anglo-saxons we should not have met here today to discuss, as we are doing today, the influence of our spiritual thought (পৃঃ ৪২৬)। একি কম কথা! না হয় উপবাসী রইলাম দেহে, কিন্তু আত্মার উদরপূর্তি তাকে অবজ্ঞা করব কোন মুখে? অন্য-এক বিবেকানন্দ অবশ্যি আছেন যিনি নর-নারায়ণের কথা ভাবেন, পীড়িত-দুঃখীদের যিনি বন্ধু, সেই বিবেকানন্দ বিবেচ্য নন বাবু-সাহেবদের। অনুরূপভাবে যে রামমোহনের বিশেষ ভক্ত নীরদ চৌধুরী তিনিও বিশেষভাবে ইংরেজানুরাগী। Autobiography-তে আছে সে-খবর। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহন একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিককে সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন, যার খবর অনেকে জানেন না। সেই সাক্ষাতকারে বলেছেন রামমোহন, Conquest is very rarely an evil when the conquering people are more civilized than the conquered, because the former bring to the latter the benefits of civilization. India requires many more years of English domination (পৃঃ ৪২৩)। ইংরেজ আমাদেরকে কিছুই শেখায়নি একথা বললে অন্ধত্ব প্রকাশ করা হবে, কিন্তু ইংরেজ শুধু সভ্যতাই বিস্তার করেছে আর কিছু করেনি—শোষণ বা নিপীড়ন—এই কথা বললেও অনুরূপ অন্ধত্বই প্রকাশ পাবে। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে ১৮২৯ সালে একজন ভারতবর্ষীয়ের যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল ১৯৫১ সালে সেই একই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন অন্য-একজন ভারতবর্ষীয় তবে বুঝতে হবে সময় ও ঘটনার স্রোত কিছুই শেখায়নি তাঁকে, দ্বিতীয় জনকে। ভারতবর্ষীয় চিন্তায় সময়-জ্ঞান নেই, এই সত্য চমৎকার ভাবে উদঘাটন করেছেন নীরদ চৌধুরী (Circe, পৃঃ ৯৫); হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর কিছুই নয় ভারতীয় মনের কাছে; এই সত্য আপন সত্যতার প্রমাণ দিচ্ছে অতি-আধুনিক বাবু-সাহেবদের চিন্তাধারাতেও। ১৮২৯-এ রামমোহন বলেছিলেন ইংরেজদের domination প্রয়োজন হবে আরো many more years ধরে। সেই many more years সোয়া শ' বছরেরও শেষ হয়নি—বলছেন এঁরা, বোধ হয় শেষ হবে না কখনো—এঁদের ধারণা।

হাঁস যেমন পানি থেকে দুধকে নিতে পারে আলাদা করে, বাবু সাহেব-রাও তেমনি পারেন মহৎ মানুষদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটিকে পৃথক করে নিতে, নিয়ে প্রশংসা করতে। বঙ্কিমচন্দ্রও বাবু ছিলেন, তবু চন্দ্র ছিলেন, সি ছিলেন না, নীরদ সি, চৌধুরীর মত, কায়মন-বাক্য সমর্পণ করেননি

সাহেব-হওয়ার সাধনায়। (অবশ্যি একথা স্বীকার্য যে ঋষি বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রভাব নীরদ সি, চৌধুরীদের প্রতিক্রিয়াশীলতার তুলনায় অধিকতর ক্ষতিকর হয়েছে বাঙালী জীবনে, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং সেই কারণে প্রভাবশালী, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে বিস্তৃত করেছেন সংবিতের অনেক গভীরে, এবং প্রভাবিত করেছেন এমনকি রাজনীতিকেও। নীরদ চৌধুরী যে বাঙলাভাষায় লিখেননি এবং সাহিত্যিক নন—সেটা সৌভাগ্যের বিষয়।)

চৌধুরী মহাশয় যে বাবু আসলে তার প্রমাণ আরো আছে। যেমন, আছে তাঁর রাজনীতিবিমুখতা। রাজনীতিকে বাবুরা ভয় করতেন, তা ইংরেজ বিরোধী বলে; বলতেন নোংরা, ভান করতেন ঘৃণার, যে ঘৃণা ভয়েরই ছদ্মবেশ। Autobiography-তে বলেছেন, **On the other hand, with rare exceptions, political activity and agitation became the business of an insufficiently educated, insufficiently intelligent, and insufficiently cultured, though serious and earnest minded, class, and this gradually brought down the standard of political life till it seemed to have become the monopoly of pig-headed fools and faddists** (পৃঃ ২৫০)। যদি যথার্থ বাবু ও অভীপ্সিত সাহেব না হতেন, হতেন যদি শুধুই বাঙালী, তবে দুঃখিত হতেন এই মন্তব্য করার সময়, যতবেশী সত্য জ্ঞান করতেন মন্তব্য ততবেশী দুঃখিত হতেন মনে মনে। কেননা পরাধীন ভারতবর্ষে রাজনীতিই ছিল নিয়ামক শক্তি—সভ্যতা বলি, অথবা অর্থনীতি, তাদের মানের অবরোহণ রাজনৈতিক জীবনের নিম্নগতি থেকেই উৎসারিত। এই নিম্নাগমন দেখে তাই উল্লসিত হবার কথা নয় কোন দেশপ্রেমিকের, এ-সম্পর্কে নিরাসক্তিও সম্ভব নয়। এবং কেনই বা এই অধোগতি? কেন শুধু এই তথাকথিত **insufficiently educated, insufficiently intelligent, and insufficiently cultured** লোকদের ভিড় ও কর্তৃত্ব রাজনীতিতে? অনেক বেশী সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সুসংস্কৃত নীরদ চৌধুরীদের মত লোকেরা কেন এলেন না রাজনীতিতে? এর কারণ যে নিহিত আছে ঔপনিবেশিকতার নিন্দিত অক্টোপাশে সেই সরল সহজ মোটা সত্যটা দেখতে পেলেন না নীরদ চৌধুরীরা, দেখতে চাইলেন না বলে, কেননা পণ করেছেন তাঁরা ইংরেজদের **seamy**

side দেখবেন না কিছুতেই! (সেটা তখনো দেখেননি যখন ৫৭ বছর বয়সের সমস্ত জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা নিয়ে ইংলণ্ডে গেছিলেন ৫ সপ্তাহের জন্য, যদিও এ ৫ সপ্তাহ থাকা নিয়ে বই লিখতে কষ্ট হয়নি A Passage to England নামে।)

Autobiography-তে অত্যন্ত সুন্দর করে মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহিণীদের একটি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন তিনি। সেটি হচ্ছে শুচিবায়ুগ্রস্ততা। পাঠক দেখবেন চিকিৎসককেও ধরেছে অসুখে। কিন্তু চিকিৎসক রাখেন না সে-খবর, কেননা তিনিও একই শ্রেণীরই, বাবুই তিনি, মধ্যবিত্ত, যতই বিরুদ্ধ কথা বলুন না কেন জোর গলায়। মহিলারা ময়লা দেখেন, দেখে ধোয়াধুয়ি করেন, হাত ধোন, কাপড় ধোন, আসবাব ধুতে থাকেন, ধোয়া-ধুয়িতেই কেটে যায় সমস্তটা জীবন। নীরদ চৌধুরীকেও ঐ বাতিকে পেয়েছে, হস্তপদাদি প্রক্ষালন করেছেন, চলছেন গা বাঁচিয়ে, না-জানি কোথায় কখন নষ্ট হয় শুচিতা, চিড় ধরে সাহেবীয়ানায়। ছিঃ ছিঃ এত্তো জঞ্জাল! আতঙ্কই বলা যায়—এক প্রকারের। সেই জন্যই দূরে দূরে থাকেন দেশের মানুষ থেকে, গালাগাল করেন, মনে হয় লড়ছেন তিনি দেশের ময়লার বিরুদ্ধে। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর শুচিবায়ুগ্রস্ততার উল্লেখ করেছি। তাঁর কালে রাজনীতিতে মস্ত মস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু তাদের কোন ছায়াপাত নেই তাঁর রচনাবলীতে। যেমন ধরা যাক, এম, এন রায় কাজ করছিলেন সে-কালে, কাজ করছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। তিনি অনেক দূরে—এত দূরে যে অন্য দেশে, যেন ভিন্ন এক গ্রহের তিনি বাসিন্দা। বলেছেন, In the whole course of my life there have been three periods during which I fully shared the passions of the nationalist movement (Autobiography, পৃঃ ৪০৪)। ব্যস, ঐ পর্যন্তই, তার বেশী নয়। এমন কি সেই যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প, জালিয়ান-ওয়ালাবাগ, সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যঃ With my respect for discipline and love of order, I saw nothing wrong in the resolute suppression of anarchy. But as information trickled out from the Punjab I, like the rest of my countrymen, was horrified and infuriated by the disproportionate severity of the punishment.। না; একটু ভুল বললেন; the rest of his countrymen জালিয়ানওয়ালাবাগে dis—

proportionate severity of punishment দেখেনি, দেখেছে অতিশয় বর্বর, ঘৃণারও অযোগ্য, নৃশংসতা। দুর্ভাগ্য নীরদ চৌধুরীদের, ভারতবর্ষের সকল মানুষ বাবু-সাহেব ছিলেন না তাঁদের মত, নইলে ভারত সাম্রাজ্যের পতন ঘটত না। বলাই বাহুল্য বাবু-সাহেবেরা ডায়ার সাহেবের কাজকে সমর্থন করতে পারতেন, বলতে পারতেন এ হচ্ছে a resolute suppression of anarchy ; কিন্তু ডায়ার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন, দোষের তুলনায় শাস্তিটা দিয়েছেন কিছু বেশী, ছাড়িয়ে গেছেন মাত্রা। অন্যদিকে নীরদ চৌধুরী নিজে না হোন, তাঁর পরিচিতদের অনেকেই, many of my acquaintances, দুঃখিত হয়েছেন by the excesses of the passive resistance movement. । অন্যায় শুধু সমস্ত ডায়ারই করেননি, করেছেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকারীরাও। (দোষ প্রায় সমান সমান!) সন্দেহ কি, বাবুরা সিপাহী বিদ্রোহের কালেও সিপাহীদের বিপক্ষে এবং সাহেবদের পক্ষে ছিলেন।

কেবল রাজনীতি নয়, বাংলাদেশে খুব বড় যে একটা কর্মযোগ চলছিল সাহিত্যের তার 'ময়লা' থেকেও দূরে রেখেছেন তিনি নিজেকে। রাখতে পেরেছিলেন বলেই বোধ করি মন্তব্য করতে পেরেছেন, In Bengali poetry...the first modern forms were based on Shakespeare and Milton (Autobiography, পৃঃ ৪৮৭)। দূরে না থেকে কাছে এলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন যে বাঙলা কবিতায় মিল্টনের প্রভাব কিছুটা এসেছে বটে মধুসূদনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু শেকস্‌পীয়রের প্রভাব সে প্রায় নেই বললেই চলে। শেকসপীয়র এমন ধরনের লেখক যিনি প্রথাগত উপায়ে প্রভাব বিস্তার করতে চান না, মিশে যেতে চান পাঠকের জীবনের সঙ্গে, তদুপরি, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন শক্তি ছিল না, ছিল না infra-structure যে সে সাহায্য নিতে পারবে শেকসপীয়রের, নিলে পারবে করতে সদ্ব্যবহার। আবার যখন বলেন নীরদ চৌধুরী, আগে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি, যে, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ফলপ্রসূ হয়েছে আধুনিক বাঙলা কবিতার জন্যে, তখন এই সত্যকে তিনি অবহেলা করেন যে সেই যোগাযোগ কবিতার তুলনায় অধিকতর সার্থক হয়েছে গদ্যের উদ্ভাবনায়। অবহেলা করা সম্ভব হয় বাঙলা সাহিত্যের জগৎ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন বলে। এবং সাহিত্যের মধ্যে আত্মপরিচয় ধরা পড়ে এই সত্য যদি মানি তবে বলতে হবে এই

অজ্ঞতাও বাবু-সাহেবদের স্বভাবসুলভ। বাবুরা আত্মসচেতন, কিন্তু আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন নন; তাঁরা নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকেন, কিন্তু নিজের সম্পর্কে গভীর কোন জ্ঞান রাখেন না। সেই জন্যই আশা করেন সাহেব হবেন চেষ্টা করে। পৌঁছে যাবেন তীর্থে।

সাহিত্য থেকে নিজেকে দূরে রাখার অন্য একটি তাৎপর্য নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা দেশের প্রবহমান চেতনা-স্রোত থেকে। তিনি ঠিক তেমনি দূরবর্তী যেমন ছিলেন, ধরা যাক, 'ঋষি' অরবিন্দ, সন্ত্রাসবাদের কালে, পণ্ডিচেরী যুগে, এবং বিলেতপ্রবাসী পর্যায়ে তো বটেই। অথচ সেই তিনিই দুঃখ প্রকাশ করেন ইংলণ্ডে যেযে এই ঘটনা দেখে যে, সেখানে তাঁর দেশবাসী মেলে না ইংরেজের সঙ্গে, বিচ্ছিন্ন থাকে স্বেচ্ছায় (**A Passage to England** দ্রষ্টব্য)। কেন মেলে না সে প্রশ্নের জবাবটা অবশ্য সোজা। ইংলণ্ডে যারা যায় তারা কেউই ৫৭ বছরের প্রস্তুতি নিয়ে ৫ সপ্তাহ থাকার জন্য **B. B. C.**র অতিথি হয়ে যায় না, তাদেরকে যেতে হয় অল্প বয়সে, অনেক বেশী সময়ের জন্য, অনেক বেশী কষ্ট করে। থাকতে হয় কষ্টেসিষ্টে, অধিকাংশ সময় সংগ্রাম করে, যে **working class**কে নীরদ চৌধুরী দেখতেই পান না, তাদেরকেই দেখতে হয় প্রধানত উপমহাদেশীয় বিলেতবাসীদেরকে। (এই **class**-এর সঙ্গে মিললে নীরদ চৌধুরীদের ধারণা কিছুটা বদলালেও বদলাতে পারত।) কিন্তু বড় প্রশ্ন সেটা নয়। বড় প্রশ্ন বরং ঐটা যে সারা জীবন দেশে কাটিয়ে যিনি বিচ্ছিন্ন দেশবাসী থেকে, বাবু-সাহেবী আত্মকরুণায়, তিনি কি করে অভিযোগ করেন বিদেশ-প্রবাসী ভারতবর্ষীয়দের স্থানীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়ে?

বাবুদের আরো একটি অমোঘ পরিচয় পরিস্ফুট নীরদ চৌধুরীর আচরণে। সে হচ্ছে অনর্গল কথা বলা। বাঙালী বাবু যত কথা বলতে পারেন, সুযোগ পেলে, তত বোধহয় আর কেউ নয়। বাঙালীর আড্ডা কি বস্তু তার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে **Autobiography**-তে, কিন্তু আড্ডার চাইতেও বড় সত্য ক্লান্তিহীন অবারণ বাকনিঃসরণ। এম. এন. রায় অনেক দূরে নীরদ চৌধুরী থেকে, কিন্তু সেই রায় সম্পর্কে মাও-সে-তুং যে বলেছিলেন এড্‌গার স্নোকে (**Red Star Over China, Penguin,** পৃঃ ১৯০), "রায় কথা বলতে জানতেন," এবং "খুব কথা বলতেন, যদিও কি করে কাজ হবে তার সন্ধান দিতে পারতেন না"; সেই কথা খেটে যায় নীরদ চৌধুরী সম্পর্কেও। জীবনাদর্শের দুই বিপরীত প্রান্তবর্তী দুজন মানুষঃ

এক হয়ে গেছেন তাঁদের বাঙালী মধ্যবিত্ততার ভিত্তিতে। কিন্তু এম. এন. রায়ের লেখা নীরদ চৌধুরীর লেখার পাশে লজ্জায় অধোবদন হবে, চৌধুরী অনেক বেশী কথা বলতে পারেন অনেক সামান্য সামান্য বিষয়ে। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যের গভীরতা এম. এন. রায়ের তুলনায় খাটো, কিন্তু প্রগলভতায় তিনি অনেক বড়। তিনি নিজেই বলেছেন স্বীয় প্রগলভতার বিষয়ে, **A Passage to England** বইতে: **Even when I had the opportunity for meeting Englishmen, some of them very distinguished, I did not allow them to talk, but talked all the time myself** (পৃঃ ৭০)। বুঝেছেন, বলেছেন, কিন্তু কৌতুকবোধ নেই বলে সংশোধন করতে সচেষ্ট হননি। এক জনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল ইংলণ্ডে, **a very great English intellectual, whose name is known all over the world.** ইনি লেখক, এবং নোবেল পুরস্কার বিজেতা, নাম বলেননি, তবে অনুমান করা যায় ইনি বার্ট্রাণ্ড রাসেল। রাসেল কথা বলার জন্য জগদবিখ্যাত, কিন্তু সেই অতিবড় দুর্ধর্ষকেও ধরাশায়ী করে দিয়েছেন তিনি বাক্যাঘাতে। দেখা যাচ্ছে নিজ হাতে চা তৈরী করে দিচ্ছেন তিনি চৌধুরীকে এবং পাইপ টানছেন, এবং মাঝে মাঝে মন্তব্য করছেন শুধু। বোঝা যায় রাসেল যতই অহঙ্কারী হোন না কেন, রাজা ছিলেন না ব্রবডিগনাগের, হলে রাজা সাক্ষাৎকার শেষে হয়ত কিছু **home truth** শুনিয়ে দিতেন।

কিন্তু ছেলেদেব চাইতেও বেশী বলে মেয়েরা, ভদ্রঘরের। আমাদের দেশ চিরকালই স্মৃতির ও শ্রুতির দেশ। ধর্মকথায়, লেখা-পড়ায়, সামাজিক জীবনে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লোকে; কে কাকে শোনাতে পারে, অর্থাৎ পারে হতবাক করতে প্রতিযোগিতা তারই। নীরদ চৌধুরীর সমস্ত লেখায় স্মৃতি নিখুঁত। স্মৃতির যদি প্রশংসা করতে হয় তবে পুরো নম্বর তাঁর প্রাপ্য। স্মৃতির মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তাকে অত্যধিক মূল্যবান বিবেচনা করা অসঙ্গত, কেননা স্মৃতির উপর নির্ভর না-করলেও অনেক সময় সহজেই কাজ চলে—দেখে নেয়া যায় গ্রন্থাগারের বই, নয়ত হাত দেওয়া যেতে পারে বিশ্বকোষে। স্মৃতির চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান ব্যাখ্যা। অনর্গল মুখস্থ বলে যাওয়ার শক্তিকে প্রশংসা করতে আমরা কখনো কার্পণ্য করিনি; বস্তুত অতীতে মুখস্থ বলতে পারাই বিদ্যাবুদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াত অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু সে-মাপকাঠি বদলে নেয়া আবশ্যক।

এই অতিরিক্ত কথা বলার পেছনে একটি মোটিভ স্পষ্ট। হতবাক করে দেওয়া, যাকে তিনি বলেছেন Self-advertisement। এবং বলেছেন তাঁর সমাজে মানুষকে self-advertisement করতে হয় বাধ্য হয়ে। Self-advertisement is forced on us by the urge for survival, the traditions of our society are such that a man is not credited with anything unless he can display it with effect (A Passage, পৃঃ ৯২)। এই কাজই করছেন তিনি. display দিচ্ছেন with effect। সেই জন্য পাতায় পাতায় বিদ্যার চমক, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক উদ্ধৃতি, ইতিহাসের উদাহরণ। সেইজন্যই অ-সাধারণ মন্তব্য করার প্রাণপণ চেষ্টা। ১৯৭১-এ যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল বাংলাদেশে তখন এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন তিনি, সম্ভবত ঐ একই উদ্দেশ্যে, ষ্টান্ট দেবার জন্য, নিজেকে জাহির করবার অভিপ্রায়ে। দেখতে দেখতে মায়াও হয় কখনো কখনো, প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছেন ইনি, বাবুরা যেমন করেন—প্রমোশনের আশায়। TLS-এ লিখেছেন যে, বাঙালী মানসিকতার একটা বড় দুর্বলতা হল, its degrading servility to foreign recognition। এই degrading servility থেকে আর যেই মুক্ত হোন, নীরদ চৌধুরী যে মুক্ত নন, তা মানতেই হবে। 'নিজেকে জানো' এই মটোটি অনেক কটি ভাষায় লিখেছেন তিনি The Continent of Circeতে। কিন্তু নিজেকে জানার অপবাদ কেউ তাঁকে দিতে পারবে না। তার কোন অন্তর্জীবন নেই। সবটাই বাইরের। বহিরাগত, বহিরারোপিত।

এই সমস্ত কাজ একটা যুদ্ধের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যোদ্ধা হিসাবে বাবুরা ডন্ কুইকজোট নন, তাঁদের আদর্শবাদ স্বল্প; তাঁরা সাঙ্কো পাঞ্জা অনেক সময়ে, কেননা তাঁরা বস্তুবাদী ভীষণভাবে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে লড়ছেন তিনি? কার উপরে রাগ? লড়ছেন প্রধানত নিজের বিরুদ্ধে, রাগও প্রধানত নিজের উপরেই—কেননা তিনি সাহেব হতে পারেননি পুরোপুরি, আত্মজ্ঞানের অভাব থাকলেও ঐটুকু জানেন। বাবুদের যেমন তাঁরও তেমনি, জ্ঞানের সঞ্চয় আছে, কিন্তু ঐক্য নেই; ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিত্ব নন। বিশেষ করে বাবু যদি সাহেব হতে চান তবে যুদ্ধ বাধা স্বাভাবিক এই দুই প্রান্তের মধ্যে। ছাত্র জীবনে তাঁকে অনেক অনেক বই পড়তে দেখে লাইব্রেরীর হেড্ পিয়ন মন্তব্য করেছিল, "The Babu wants to read the elephant" (Autobiography, পৃঃ ৩৫৬)। এই বাঙালী বাবু হাতীতে চড়েছেন, ভেবেছেন সাহেব হবার লক্ষ্যে পৌঁছিবেন

সওয়ার হয়ে। না, বিদ্যার হাতীতে চড়ে সাহেব হওয়া যায় না। সাহেব বরং তারাই বেশী যাদের বিদ্যা অল্প—এবং বয়সও।

নীরদ চৌধুরীর সাম্প্রতিক বই **Scholar Extraordinary**। বিষয়বস্তু ম্যাক্স মুলার। বইয়ের নাম তাৎপর্যপূর্ণ, চোখ পড়েছে বিদ্যার উপর, ম্যাক্স মুলার যে নির্বাচিত হয়েছেন সেও বিদ্যার কারণেই। কিন্তু ম্যাক্স মুলার বলেছিলেন আমরা আর্য, যেমন ছিলেন তিনি নিজে, এবং ম্যাক্স মুলার পণ্ডিত ছিলেন সংস্কৃতের। আর্যত্বের ও সংস্কৃতের প্রতি নীরদ চৌধুরীর আকর্ষণ অত্যন্ত গভীর। যতই আধুনিক হোন না কেন, এ আকর্ষণ কাটবার নয়। এ বড় বিচিত্র মিশ্রণ। আরো আছে এক কারণ ম্যাক্স মুলার প্রীতির, **Right Honourable** ছিলেন মুলার, সদস্য ছিলেন প্রিভি কাউন্সিলের, যে সংবাদ **Scholar Extraordinary** বইয়ের শিরোনামেই আছে ম্যাক্স মুলারের **Honourable** পদবীর উল্লেখে। এই প্রীতিও অবিচ্ছেদ্য অংশ—নীরদ চৌধুরীদের মানসিক সংগঠনের: রক্ষণশীলতা, বীর-পূজা, পুনরুত্থান-বাদ, বুদ্ধিবাদ-বিরোধিতা, পরস্পরবিরোধীদের একত্রীকরণ-প্রবণতা এই সকল বস্তুকে আধুনিকতার একটা ক্ষীণ আবরণ চেষ্টা করছে ঢেকে-ঢুকে রাখতে—কোনমতে। ইউরোপ সম্পর্কে এত যে গভীর জ্ঞান তাঁর সে-জ্ঞান তাঁকে প্রাচ্যের প্রাচীন ভাববাদের কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারেনি তাঁকে। পরিমল গোস্বামীকে লিখেছেন তিনি এক চিঠিতে, " **nothing but the spirit counts** " (পরিমল গোস্বামী, 'পত্রস্মৃতি', পৃঃ ৩২১)। তাই যদি হবে, যদি **spirit** ভিন্ন আর কোন কিছুরই মূল্য না থাকবে তবে ইউরোপ শেখাল কি, ইউরোপ উন্নতিই বা করল কিসের জোরে?

কিন্তু আসলে লড়ছেন কার বিরুদ্ধে নীরদ চৌধুরীরা? শুধু কি নিজের বিরুদ্ধে? লড়ছেন দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধেও। স্থিতাবস্থার সমর্থক এঁরা, বিদেশীদের স্তাবক। পরিবর্তনের বিরোধী। যদি একা হতেন, একাকী হতেন তবে উপেক্ষা করলেও চলত, কিন্তু একটি মানসিক-তার প্রতিনিধি যেহেতু, এবং সেই মানসিকতা যেহেতু সাম্রাজ্যবাদীদের চাইতেও অধিক শত্রুভাবাপন্ন দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি এবং গাত্র-বর্ণের কারণে যেহেতু আত্মগোপনকারী তাই এই মানসিকতাকে চিনে রাখা আবশ্যক অগ্রগতির শর্ত হিসাবে। এঁরা যে বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখেন নিজেদেরকে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক—নিঃসন্দেহে। ভদ্র-লোকত্ব বস্তুটি যে আসলে কী তা বুঝতে হলে বাবু-সাহেবদের ক্রোধ ও লড়াইয়ের দিকে তাকানোর একটা উপযোগিতা আছে।

বাংলাদেশে ইংরেজীর অতীত ও ভবিষ্যৎ

এতদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর দুষ্ট একাধিপত্যের অবসান ঘটেছে। এই ঘটনার একটি শুভ তাৎপর্য অবশ্যিই এই যে, আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে ইংরেজী এখন তার স্বাভাবিক স্থান খুঁজে নেবে, ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অবকাশ পাবে স্বাভাবিক হয়ে উঠবার। ইংরেজীর যে জবরদখল এতকাল চলছিল তার ফলে এদেশে ইংরেজীর ভাবভঙ্গি আচার-আচরণে ছিল অহমিকা, ছিল দম্ভ; অন্যদিকে সক্রিয় ছিল ইংরেজীর প্রতি ঈর্ষা ও অসন্তোষ, ছিল সন্দেহ ও ভয়। আজ আমরা আশা করব যে, পুরাতন সম্পর্কের স্থলে সূচনা হবে নতুন ও স্বাভাবিক এক সম্পর্কের।

ইংরেজীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কটা কি?

বাঙলাভাষা ও বাঙলাভাষীর সঙ্গে ইংরেজী যুক্ত ঐতিহাসিক ভাবে, যুক্ত ঐতিহাসিক কারণে। ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়ই। ইংরেজ আমাদেরকে ভুল ইতিহাস শিখিয়েছে, ইংরেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা নকলসাহেব সাজবার ভীষণ কঠিন প্রয়াস করেছি প্রাণপণে। ইংরেজের বিদ্যালয়ে গিয়ে এক ধরনের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের মনে, যার ফলে স্বদেশে পরবাসী হয়ে থাকতে হয়েছে প্রায় সময়; ঘরে সনাতন বাঙালী, বাইরে নিখুঁত সাহেব—এই বিভক্ত চেতনা ও আনুগত্যের বিড়ম্বনা বিস্তর অসঙ্গতি, বিভ্রম ও ক্ষতির সৃষ্টি করেছে। ইংরেজী শিক্ষা যত না মানুষ তৈরী করেছে তার চেয়ে বেশী তৈরী করেছে আমলা। ইংরেজী শিক্ষাকে ভিত্তি করেই এদেশে একদা 'ভদ্র' লোকের ধারণা গড়ে উঠেছিল। যারা ইংরেজী জানে তারাই শুধু ভদ্রলোক, যারা জানে না তারা ইতরজন। এই বৈষম্য পূর্বোক্ত আত্ম-সচেতনতারই একটা সামাজিক প্রকাশ। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে এমন দুরতিক্রম্য ব্যবধান ইংরেজ আগমনের পূর্বে ছিল না। অন্য ব্যবধান ছিল, এবং এও অবশ্যই সত্য যে শিক্ষার ব্যবধান না থাকলে দূরত্বের ভিন্নতর কোন মানদণ্ড নিশ্চয়ই তৈরী হত। কিন্তু শিক্ষা যে মানুষে মানুষে দূরত্বের চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মিলনের সূত্র না হয়ে হয়ে উঠেছিল

বিরোধের কারণ তার শিক্ষানৈতিক তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয় কোনমতেই। রামমোহন রায় এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাস করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু সকল ইউরোপীয়কে নয়, উচ্চ ও শিক্ষিত ইউরোপীয়কেই কেবলমাত্র। শুধু উচ্চ হওয়া পর্যাপ্ত নয়, শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ যখন বড় ইংরেজ ও ছোট ইংরেজের তফাৎ করেন তখন সেই তফাৎটাও মূলত দাঁড়ায় শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের তফাৎ। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে এক সময়ে 'ফিল্টার ডাউন' তত্ত্বের প্রচলন ছিল। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল পানি যেমন উপরের স্তরে ঢাললে নীচের স্তরে নেমে যায় অনিবার্য রূপে, শিক্ষাও তেমনি প্রবেশ করবে উপর থেকে নীচে। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন, "বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে।" কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন, "কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?" ফলেনি, ফললেও ফলেছে খুব সামান্য পরিমাণে, ভাষার ঐ অন্তরায়ের কারণে। ইংরেজীর এই জবরদখল অব্যাহত ছিল তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পরও। ঐ স্বাধীনতা যে প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া গেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, পাওয়া গেছে, অতিশয় স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, যেখানে ইংরেজী তার অন্যায় একাধিপত্য কায়েম রেখেছিল। তার বিরুদ্ধে অসন্তোষের অনেক দমকা হাওয়া উঠতে দেখেছি, তবু সে ছিল প্রায় অটল হয়ে। আজ যে ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের পুরাতন সম্পর্কে পরিবর্তন আসছে, বাংলাদেশে বাঙলা যে তার নিজের স্থান ফিরে পাচ্ছে—এই ঘটনার তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে, এবারকার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দূরদিগন্তপ্রসারী। বাংলাদেশে বিদেশী ভাষার প্রতিপত্তির ইতিহাস নতুন নয়, প্রতিপত্তি ছিল সংস্কৃতের, ফারসীর, ইংরেজীর। এই প্রথমবার বাঙলা সুযোগ পেল রাষ্ট্রভাষা হবার, এই বোধ হয় প্রথমবার আমরা সুযোগ পেলাম যথার্থ স্বাধীনতার পথে চলবার। আবশ্যক হবে অনেক দূরে যাওয়ার, সেই যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র।

আজ যেহেতু ভয় নেই যে ইংরেজী আমাদের পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে আবার পা ঝুলিয়ে বসবে আমাদের ঘাড়ে তাই ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভালোর দিকটায় তাকানো যায় নির্ভয়ে। তাকালে দেখব

আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির, অনুভব ও উপলব্ধির ধ্যান ও ধারণার অনেকাংশ জুড়েই ইংরেজীর প্রভাব পরিব্যাপ্ত। বলাবাহুল্য, ভাষা ভাবের বাহন মাত্র নয়, যে সকল ভাবনা ও ধারণা ভাষা বহন করে তাদের সঙ্গে, তাদের অন্তর্লগ্ন জীবনদৃষ্টি ও ইতিহাসের সঙ্গেও ভাষা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। যখন কোন ভাষা শিখি তখন সেই ভাষার সমস্ত অনুষঙ্গের সঙ্গেও পরিচিত হই, যত গভীর হয় ভাষা-জ্ঞান, তত গভীর হয় এই পরিচয়। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার শিক্ষাকে তাই বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। ইংরেজের কাছ থেকে যেসকল ভাবনা-ধারণা, প্রতিষ্ঠান ও মূল্যজ্ঞান আমরা গ্রহণ করেছি তারা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই এসেছে। তাদের যে-স্থান আমাদের সংস্কৃতিতে, ইংরেজীর স্থান তার চাইতে সঙ্কীর্ণ হবার কথা নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও সংশয়কে সজাগ রাখার শিক্ষা আমরা ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। ইংরেজের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল একটা কারণ যার ফলে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয়, আবার সংশয় ছিল বলেই ইংরেজ ঐ বিপ্লবের খারাপ দিকটা দেখতে অপারগ হয়নি। ব্যক্তির মর্যাদাবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষাও ইংরেজ দিতে চেয়েছে—এই শিক্ষার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আমাদের আস্থা আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, ইংরেজী শিক্ষারই ফলশ্রুতি। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ইংরেজী ভাষা বহন করে এনেছে আমাদের চেতনার দ্বারদেশে। প্রয়োগবাদ ও যুক্তিনির্ভরতার শিক্ষা ইংরেজদের কাছে পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে এই মূল্যজ্ঞানের শিক্ষাও যে গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় অধিক মূল্যবান হলেন একজন শেকস্‌পীয়র। এই সকল উপকরণের যেমন প্রভাব আছে আমাদের সামাজিক ও মানসিক জীবনে, ইংরেজী ভাষার প্রভাবও তেমনি না-থেকে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা, ইংরেজী ভাষার সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে উন্মোচন ঘটেছে আমাদের দৃষ্টির, সম্প্রসারণ ঘটেছে আমাদের দৃষ্টিশক্তির। নিজেদের দৈন্য ও হীনতা আমরা দেখতে পেয়েছি। ইংরেজের স্বাধীনতা দেখে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতবাসী পরাধীনতার মর্মজ্বালায় বিদ্ধ হয়েছে। শুধু ইংলণ্ড বলে নয়, ইংরেজী যেখানে চালু নয় সেই সব দেশের ছবিও আমরা লাভ করেছি ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়েই। জাতীয়তাবাদ তাই ইংরেজই আমাদেরকে শিখিয়েছে—দুশো বছর ধরে। গ্লানি ও বেদনার গভীর থেকে জন্ম নিয়েছে যে স্বাধীনতা-

আন্দোলন তার প্রবল আঘাতে এদেশ ছাড়তে হয়েছে ইংরেজকে, ছাড়তে হয়েছে ইংরেজের রেখে-যাওয়া বংশবদ পাঞ্জাবীকেও। রাজত্ব চালু রাখার প্রয়োজনেই ইংরেজ আমাদের ইংরেজী শিখিয়েছিল, শিখিয়ে ইংরেজ তার সেই রাজত্বটাকেই দুর্বল করেছে। খাল কেটে কুমীর আনার এমন ঘটনা শুধু এদেশে নয়, ইংরেজের রাজত্ব যেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলোর সব কটিতেই ঘটেছে। এ না হয়ে উপায় নেই; কেননা ইংরেজী ভাষা ইংরেজের অধীনস্থদের চোখ খুলে দিয়েছে, এবং একবার যখন চোখ খুলেছে তখন সেই খোলা চোখের কাছ থেকে ইংরেজের পক্ষে তার নিজের কাছে অপ্রিয় সত্যগুলোকে লুকিয়ে রাখবে এমন ক্ষমতা অতিদক্ষ ইংরেজেরও ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল তার নিজের মাতৃভাষা।

অন্ধকার যেমন ছিল তেমনই ছিল আলোকও। ইংরেজীর সঙ্গে সম্পর্কের আলোর দিকটা এই রকমই। নতুন ভারতবর্ষের ইতিহাসে নায়ক পুরুষ ছিলেন যে সকল ভারতীয়েরা তাঁদের কাউকে ভাবা সম্ভব নয় তাঁদের ইংরেজীজ্ঞান ছাড়া। গান্ধী ও সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ বোসের মত বিভিন্ন ধরনের মনীষা যে ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা লালিত হয়েছেন এই সত্যকে যখন খেয়াল করি তখন ইংরেজী সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্যের মুখোমুখি হই। (গান্ধীজী অবশ্যি মনে করতেন রামমোহনের মত মহৎ মানুষেরা মহত্তর কীর্তি রেখে যেতে পারতেন যদি তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা না-পেতেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা বাদ দিয়ে রামমোহন যে রাম-মোহন পর্যন্তই অগ্রসর হতে পারতেন না সেটা বোধ হয় অধিকতর ও বাস্তবিক সত্য)। ঐ বৈশিষ্ট্য হল একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী শক্তির প্রতিপালন-ক্ষমতা। ইংরেজী সংস্কৃতির একই ধারার মধ্যে আছে সংরক্ষণ ও পরিবর্তন; আর এই বৈশিষ্ট্য ইংরেজী ভাষার মধ্যেও ব্যাপ্ত। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংরক্ষণের শিক্ষা ইংরেজী সংস্কৃতি ও ভাষার কাছ থেকে নিতে পারি আমরা। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনের কথাটা ইংরেজী ভাষাই জানিয়েছিল আমাদের, ঐ পথ ধরে এগিয়ে যাবার পাথেয় যখন জোগাড় করব তখন ইংরেজী ভাষা আমাদের সাহায্য করবে।

এই আলোকিত ইতিহাসের সম্প্রসারণে বাধা কোথায়? বাধা নিশ্চয়ই ছিল, বাধা ছিল পরাধীনতার, ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের এখন আর সে-বাধা থাকবার কথা নয়।

ইংরেজী শুধু ইংরেজের ভাষা নয়—এই যুক্তিতেও জোর আছে। মানবেতিহাসের পরিচিত যাত্রাপথে একেক সময় একেক ভাষা প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন একবার প্রধান ছিল ল্যাটিন, পরে আরবী, মাঝে চেষ্টা করেছে ফরাসী, পরে প্রধান হয়েছে ইংরেজী। এই প্রাধান্যকে মান্য না করে উপায় নেই, মান্য না করলে ক্ষতি আছে। ইংরেজী ভাষার গৌরবের পেছনে তার জগৎজোড়া সাম্রাজ্যের সমর্থন অবশ্যই ছিল, কিন্তু আজ যখন সেই সাম্রাজ্য গুটিয়ে এসেছে, তখনো ভাষার গৌরব অস্তমিত হয়নি। ইংরেজী তাই ইংরেজের যে ঘোরতর বিরোধী তারও ব্যবহারের ভাষা বটে। তদুপরি ইংরেজী ভাষা নিজেই গড়ে উঠেছে নানান সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রভাবসমূহকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে: প্রভাব আছে পরস্পর-বিরোধী পৌত্তলিকতার ও খৃষ্ট ধর্মের, আছে হিব্রু ও গ্রীকদের, আছে সমগ্র ইউরোপের। গ্রহণের এই ক্ষমতার জোরেই ইংরেজী এমন শক্তিশালী ভাষা। ভ্রমণ, ব্যবসায় ও সাম্রাজ্যবিস্তারের বহুবিধ কৌশলে বহু দেশ থেকে সম্পদ এনে ইংরেজ সমৃদ্ধ করেছে তার দ্বীপবাসী জীবনকে, সেই সঙ্গে শক্তিমন্ত করেছে তার ভাষাকে। জীবনকে সমৃদ্ধ আমরাও করব, শুধু জাগতিক উপকরণের দিক দিয়ে নয়, মানসিক উপকরণে, চেতনা ও সম্বিতের সম্প্রসারণে ও গভীরতায়। আর এই কাজে ইংরেজী ভাষা সহায়ক হবে আমাদের। ইংরেজীব মাধ্যমে স্থান ও কালের যে-সকল স্রোত এসে মিশেছে ইংরেজীর প্রবাহে তাদের সঙ্গেও যুক্ত হওয়া যাবে। একথা তো সর্বজনমান্য যে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল অন্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, অন্যের অভিজ্ঞতার মানসিক অংশভাগী হওয়া। ছোট ও বড় কবির গ্রহণ কৌশলের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে টি, এস, এলিয়ট বলেছিলেন যে, ছোট কবিরা ধার করেন, বড় কবিরা করেন চুরি। ইংরেজ বড় কবির কাজ করেছে, আমরাও তা-ই করব।

শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ফলপ্রসূ হয়েছে অনুভবের ক্ষেত্রেও। ইংরেজ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাঙলা দেশেই এসেছিল, ইংরেজকে বাঙালীরাই ঘৃণা করেছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু বাঙালীর একটা বাস্তববুদ্ধি ছিল, সে বর্জন করেনি ইংরেজী শিক্ষার শুভ ফলকে, বর্জন করেনি বাঙলা ভাষাকেও। ইংরেজের নিজের ইতিহাসে নর্মান বিজয়ের পর যেমন ঘটনা ঘটেছিল তেমনটাই ঘটেছিল এই ক্ষেত্রে। নর্মান বিজয়ের পর ইংরেজ না বর্জন করেছে নিজের ভাষাকে, না বিজয়ী

-নর্মানদের ভাষাকে, বরঞ্চ বিদেশী ভাষাকে স্বদেশী ভাষার প্রয়োজনে লাগিয়ে একটি অভিনব বিপ্লব সাধন করেছে। মধুসূদন যখন ইংরেজী চর্চা ছেড়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টিতে মন দেন তখন বাঙালীর যে-বাস্তববুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে, সেই বুদ্ধিরই প্রকাশ দেখেছি তখন যখন বিদ্যাসাগর ইংরেজীর পাঠ নিয়েছেন। বাঙলা ভাষার একটি বিশেষ গুণ এই যে, সে ইংরেজী ভাষার অনেক গুণ অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের যে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য, এই সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে কার্যকর যে-মানসিকতা এবং সাহিত্য পাঠের জন্য আমরা অর্জন করেছি যে-ক্ষমতা তার অনেকটাই এসেছে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগের সূত্র ধরে। বস্তুত বাঙলা গদ্যের কথা ভাবাই যায় না, ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে। বাঙলা ভাষার যতি-চিহ্নের অধিকাংশই এসেছে ইংরেজী থেকে যেমন এসেছে তার প্রবহমানতা, গতি ও চাঞ্চল্য। এমন কি গদ্যের উদ্ভবও হয়েছে ইংরেজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে।

অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান প্রকাশের নব নব কৌশল, মহৎ মানুষের সঙ্গে সংযোগ—এসবকিছু লাভ করা গেছে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়েই। আমাদের নাটক ছিল না, বিশেষ করে ছিল না বিয়োগান্ত নাটক; এই অভাব মেটাবার চেষ্টা হয়েছে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করার পরেই। নিজস্ব মহাকাব্য রচনাও ঐ পাঠ-গ্রহণের পরের ঘটনা। উপন্যাস এবং ছোটগল্পও তাই। বাঙলা ভাষা ইংরেজী ভাষাকে যেমন ভাবে নিজের কাজে ব্যবহার করেছে তেমন ভাবে অন্য কোন ভারতীয় ভাষা করেনি।

সাহিত্য আমরা আরো অনেক সৃষ্টি করব। মানুষের সঙ্গে মানুষের অতিপ্রয়োজনীয় ঐক্যসংস্থাপনের জন্য একদা আমরা আঁকড়ে ধরেছিলাম ধর্মকে। শক্ত হাতে ধরেছিলাম, রজ্জু আমরা ছাড়িনি, রজ্জু নিজেই ছিঁড়ে গেছে। আমরা ছিটকে পড়েছি দুঃখভোগের গভীর খাদে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে একমাত্র অবলম্বন করবার মাশুল দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে, একবার নয় দুইবার, ১৯৪৭-এ ও ১৯৭১-এ।

আমাদের জীবনে প্রগতিশীলতার সূত্রপাতে ইংরেজী শিক্ষার একটা ভূমিকা ছিল। অন্যদিকে জামাতে ইসলামী ধরনের ধর্মান্ধ মানব-রক্তপিপাসুদের অনেকেই এসেছে তাদের মধ্য থেকেই যারা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী। মানুষের সঙ্গে মানুষকে আমরা যুক্ত করব কার সাহায্যে?

করব রাজনীতি ও সাহিত্যের বন্ধনে। সাহিত্যকে এগিয়ে এসে ধর্মের পুরাতন স্থানটির কিছুটা দখল করতে হবে আমাদের জীবনে। এ কথাটা ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন একদিন, তাঁর দেশের সম্পর্কে—উনবিংশ শতাব্দীতে। একশ বছর পর আজ এই প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নেবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। ধর্মের আরো একটা ভূমিকা ছিল, ধর্ম ছিল সামাজিক অনুশাসনের উৎস। ধর্মের এই ভূমিকা সক্রিয় থাকবে এটা আজ আর নয়; আজ তাই নতুন উৎস চাই, আরো বেশী গভীর এক উৎস। এই উৎস হবে আমাদের বিবেক, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মমত্ববোধ। সেই বিবেক ও মমত্ববোধ সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধনে সাহিত্য যতটা কাজ করতে পারে ততটা কাজ করবার ক্ষমতা রাজনীতি ভিন্ন আর কারো নেই। বাংলাদেশের বিবেক ও হৃদয়কে খুঁজতে হবে বাংলাদেশের সাহিত্যে। রাজনৈতিক ঐক্য প্রকৃত অর্থে ঐক্য হতে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে। এই মিলনকে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাকে ব্যাপক ও গভীর করার প্রয়োজনীয়তাকে যদি স্বীকার করি তবে মূল্য দিতে হবে সাহিত্যকে, মনোনিবেশ করতে হবে সাহিত্যের সৃষ্টিতে। আর এই কারণে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ফলপ্রসূ সম্পর্ক সুযোগ পাবে আরো পুষ্ট ও প্রসারিত হবার। অন্যসব কারণ বাদ দিলেও, সাহিত্যের কারণে ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তো কমবেই না বরং বাড়বে দিন দিন।

কিন্তু শুধু ইংরেজী সাহিত্য নয়, ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা চিনতে শিখেছি গ্রীক ও রোমান সাহিত্যকে, ফরাসী ও রুশ সাহিত্যকে, এমনকি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশসমূহের সাহিত্যকেও। বাঙলার বাইরে অন্যান্য ভাষার ভারতবর্ষীয় সাহিত্যও আমাদের হাতে এসেছে ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে। এটাও স্বাভাবিক। যেখানে যা কিছু ভালো রচনা দেখেছে ইংরেজ তাকে নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়েছে তৎক্ষণাৎ। সকল ভাষা ও সাহিত্যের সকল প্রকার জ্ঞান অনুভবের সমুদয় অভিজ্ঞতা আমরাও নিয়ে আসব মনের অন্তঃপুরে, আনব অনুবাদের সাহায্যে। অনুবাদ করতে হবে, কেননা মূল ভাষা শিখবার মত প্রচুর সময় বা সুযোগ আমাদের হাতে নেই। আর ঠিক ঐ একই কারণে ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষার বই মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না, অনুবাদ করতে হবে ইংরেজী অনুবাদ থেকে।

পড়বার জন্য বা সাধারণভাবে বোঝার জন্য যে-ভাষা জ্ঞান থাকলে চলে, তা দিয়ে অনুবাদ সম্ভবপর নয়। অনুবাদের জন্য বিশেষ জ্ঞান, ভাষার বিশিষ্ট ব্যবহারবিধি, তার বাঁকাচোরা কৌশল, শব্দের পেছনকার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ, অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের উপর ভাষার নিজস্বতা নির্ভরশীল তাদের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় থাকা আবশ্যক। তা না থাকলে অনুবাদ শুধু অযথার্থ নয়, হাস্যকরও হতে পারে। ইংরেজীতে **spirit** শব্দের অনেক কটা অর্থ আছে: যেমন আত্মা, ভূত, মদ ইত্যাদি। **Flesh** অর্থে শরীরও বোঝান যায়, মাংসও। তাই, **The spirit is willing, but the flesh is weak** এই অতিপরিচিত শব্দগুলোর অর্থ যদি করি "মদটা ভালো, কিন্তু মাংসটা খারাপ" তাহলে কাণ্ডজ্ঞানের অসদ্‌ভাবের পরিচয় দেওয়া হয় না, ভাষাজ্ঞানের অসদ্‌ভাবেরও নয়, কিন্তু অনুবাদ হয় না। এই উদাহরণ ভাষার শব্দার্থিক দিক নিয়ে; কিন্তু শব্দার্থইতো ভাষার শেষ কথা নয়, ভাষার সঙ্গে জড়িত আছে জীবনদৃষ্টি, তার সঙ্গে প্রবহমান আছে বহু শত বছরের সংস্কৃতিধারার অন্তর্লীন স্রোত, তার পরতে পরতে গোপন আছে ইতিহাসবিবর্তনের বহু বিচিত্র ধ্বনি। এদের সন্ধান না-রাখলে অনুবাদে হাত দেব কোন সাহসে? সাহিত্যের অনুবাদ আরো দুরূহ, কেননা প্রত্যেক লেখকের ভাষাই তাঁর নিজস্ব ভাষা, ঠিক ঐ ভাষাটি না জানলে তার সাহিত্যপাঠ সম্ভবপর নয়। অনুবাদ তো ভাষান্তর নয় শুধু, অনুবাদ মাত্রই ব্যাখ্যা—এক প্রকারের। ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা বিশেষভাবে অর্জন করার ব্যাপার, যে-অর্জন সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। মূল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করতে গেলে "ডঃ জিভাগো"র অনুবাদে যদি দশ বছর সময় লাগত তাহলে বলবার কিছু থাকত না, ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনুবাদ করতে দশ মাস লাগলে বলতে হবে বেশী লেগেছে। তার কারণ রুশ ভাষায় আমাদের যে-জ্ঞান নেই, ইংরেজী ভাষায় সে-জ্ঞান আছে; তদুপরি অভ্যাস আছে ইংরেজী পাঠের, অভিজ্ঞতা আছে ইংরেজী থেকে অনুবাদের। এক জনের নেই, অনেকের আছে, তাই একে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারি অনায়াসে। অর্থাৎ ইংরেজীর ব্যাপারে একটা মিলিত সঞ্চয় আছে, আমাদের সে-সঞ্চয় কয়েক শ' বছরের শ্রমে গড়ে উঠেছে। শুধু আমাদের নয়, ইংরেজের নিজের যে-সঞ্চয় আছে অন্যান্য ভাষাজ্ঞানের, তারও উত্তরাধিকারী আমরা; ইংরেজী ভাষার সূত্র ধরে। অন্যকোন ভাষার কোন নতুন সঞ্চয় যদি

গড়তে চাই তবে তাতে কল্যাণ আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু কোন নতুন সঞ্চয় এই পুরাতন ভাণ্ডারের স্থান দখল করতে পারবে এমন আশা বৃথা। এই সঞ্চয় এক দিনের নয়, একজনের নয়, একে পরিত্যাগ করতে গেলে শুধু যে মস্তবড় একটা অপব্যয়ই হবে তাই নয়, আমরা ছিটকে দূরে পড়ে যাব যে-পথ দিয়ে সামনে চলছিলাম সেই অভ্যস্ত পথ থেকে।

শিক্ষার ব্যাপারে ভাষার ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। শিক্ষিত মানুষ মানেই সবাক মানুষ, এমন মানুষ যার মুখে ভাষা আছে আত্মপ্রকাশের। আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ও অভ্যাস আত্মবিকাশকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষা যতই অগ্রসর হয় ভাষাজ্ঞানও তত প্রখর হয়—এটাই নিয়ম। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলে কোন কথা নেই। সঙ্কীর্ণমনা বলে প্রসিদ্ধ কিপ-লিঙ একদা প্রশ্ন করেছিলেন, "What does he know of England who only England knows?" সে এক যথার্থ প্রশ্ন সকল ক্ষেত্রে, ভাষা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও। এক ভাষার জ্ঞান অন্য ভাষার জ্ঞানকে পূর্ণ করে। যেমন অন্ধকারের সাহায্যে আলোকে, আলোর সাহায্যে অন্ধকারকে চেনা যায়, ঠিক তেমনি এক ভাষার প্রকাশরীতি, শব্দচয়ন, বাক্যনির্মাণ ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় থাকলে অন্য ভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারার কাজ সহজ হয়। এক ভাষা ব্যবহারের ফলে যে মানসিক অভ্যাস ও নিয়মানুবর্তিতার সৃষ্টি হয় তা অন্য ভাষার ব্যবহারকে সুগম করে। তদুপরি, ভাষা মানুষের মনকে সজাগ ও সতর্ক রাখে, অধিকাংশ সময়ে অধিকাংশ মানুষ চিন্তার সুযোগ পায় না, একেকটি শব্দ, একেকটি বাক্য পারে মানুষের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করতে। চিন্তার শক্তিকে উদ্দীপ্ত রাখা শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্যই দেখি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই একটি দ্বিতীয় ভাষা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে। দ্বিতীয় ভাষা আমাদেরও চাই, আর চাই যদি তবে আমরা ইংরেজীকেই নেব অন্য যে-কোন ভাষার আগে। ইংরেজী আজ আন্তর্জাতিক জগতের প্রধানতম ভাষা, এই যুক্তিতো আছেই, তার চেয়ে বড় যুক্তি হল ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক। ইংরেজীতে পাঠ নিয়ে বাঙলাভাষীর তো বটেই বাঙলা ভাষারও উপকার হয়েছে। অতীতে, পরাধীনতার যুগে হয়েছে; ভবিষ্যতে, স্বাধীনতার কালে হবে না কেন? দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর উপযোগিতা শুধু নৈকট্যের দিক থেকেই নয়, দূরত্বের

দিক থেকে আছে। এই দূরত্ব এমন একটা প্রেক্ষিতের সৃষ্টি করে যেখান থেকে আমরা ভালো করে দেখতে পারি বাঙলা ভাষাকে। যেমন দেখতে পারি যে ইংরেজীর তুলনায় বাঙলায় অধিক প্রবণতা আছে শব্দবাহুল্য ঘটানোর। দেখতে পারি যে, শব্দকে নির্দিষ্ট ও যথার্থ অর্থবহনের জন্য ব্যবহার করা, একটি ধারণা থেকে অন্য ধারণাকে পৃথক করা ইত্যকার বিষয়ে ইংরেজী ভাষা অনেক বেশী সতর্ক, বাঙলা ভাষার তুলনায়। দেখতে পারি যে, বাঙলা অগ্রবর্তী ভাবপ্রবণতা ও ভাবালুতার ক্ষেত্রে। এসবই বিশদের প্রশ্ন, মোটা কথাটা এই যে ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য আমাদের আত্মসমৃদ্ধির জন্য।

আত্মসমৃদ্ধির উপায় হিসেবে কালজয়ী (Classical) সাহিত্যপাঠের যে-বিধান আছে সে-বিধানও নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত। কালজয়ী সাহিত্যপাঠে আমাদের মানসিক ও হৃদয়বৃত্তিক প্রেক্ষিতের সম্প্রসারণ ঘটে, ব্যাপ্তি ও গভীরতা আসে অনুভবের জগতে। সাহিত্যসৃষ্টিকারী মহৎ মানুষেরা আমাদের গৃহবাসী হয়ে ওঠেন। অত্যাসক্তির স্বার্থপরতার জায়গায় গড়ে ওঠে নিরাসক্তির উদারতা। অন্যের সুখ-দুঃখকে আমরা আপন বলে গ্রহণ করতে শিখি। যে-অস্তিত্ব এমনিতে দ্বিমাত্রিক তাতে একটি প্রয়োজনীয় তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হয়। সেই সঙ্গে একটি পরিশীলিত সৌন্দর্যজ্ঞান সৃষ্টি হয় আমাদের ভেতরে। এভাবে চিৎপ্রকর্ষের উৎকর্ষ ঘটতে থাকে, বিনয় আসে আচারে-আচরণে, শৃঙ্খলাবোধ আসে প্রবৃত্তিসমূহকে বেষ্টন করে। মোট কথা, আমরা সংস্কৃতিবান মানুষ হয়ে উঠবার অবকাশ পাই।

কালজয়ী সাহিত্যপাঠ করতে গেলে ইংরেজী ভাষার কাছে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় পুরাতন, এর সাহিত্য নিজেও পুরাতন। ইংরেজী সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যে-দূরত্ব ভূগোলের দূরত্বের চাইতেও বেশী উল্লেখযোগ্য, তাকেও এ-ক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য করা চলে। কেন না, দূরে না গেলে আমরা নিকটকে চিনতে পারি না, স্বদেশকে চিনবার জন্য বিদেশ-ভ্রমণ অত্যাবশ্যক। কেননা, তুলনা থেকেই, বৈপরীত্য দেখেই আমরা আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি। আমরা উষ্ণ দেশের মানুষ, ইংরেজ শীতল দেশের, ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্যে তাই সহনশীলতা বেশী। সেই জন্যই দেখি সেখানে একই সঙ্গে কাজ করছে যুক্তি ও আবেগ, আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি

ও জাগতিক সুখানুসন্ধান। সে-সাহিত্যে মানুষের অবিস্মরণীয় মহত্ত্বের চিত্র যেমন আছে তেমনি আছে কদর্য গ্লানিরও। মানুষ যে অসামান্য প্রাণী এই সত্যের জয়ধ্বনি তার সকল এলাকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। কাউকে বড় হও, মহৎ হও—এই ধরনের উপদেশ দেওয়ার চাইতে তার সামনে মানুষের মহৎ কীর্তি ও সভ্যতার চিত্র তুলে ধরা অনেক বেশী ফলপ্রসূ। কালজয়ী সাহিত্য মানুষের কালজয়ী কীর্তি ও সভ্যতাকে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু করে তোলে, তার ফলে নৈতিক শিক্ষাপ্রদানের কর্তব্যটিও সম্পাদিত হয়। আর এই শিক্ষাদান ও গ্রহণ সম্পন্ন হয় আনন্দের সঙ্গে। আমাদের জীবনে আনন্দের প্রাচুর্য আছে এমন কথা কেউ বলবেন না, তার উপর শিক্ষিত হওয়া মানেই অতৃপ্ত হওয়া। শিক্ষিত মানুষের পক্ষে তাই আনন্দ লাভের প্রয়োজনেও কালজয়ী সাহিত্যপাঠ অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

ইংরেজী যে শুধু প্রাচীনই তাই নয়, একই সঙ্গে নবীনও বটে। তার ভাষা মৃত নয়, যেমন কোন কোন কালজয়ী সাহিত্যের ভাষা মৃত। বরং সে প্রাণবন্ত রূপে জীবন্ত। ইংরেজী ভাষার সাহিত্য বলতে আজ আর শুধু ইংরেজের লেখা সাহিত্য বোঝায় না, ইংরেজীতে আমেরিকানরা লিখেছেন; লিখেছেন আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতবর্ষের লেখকরাও।

দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা যে বাড়বে, এবং সে-বৃদ্ধির যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে এ সত্য সকলেই মানবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির চর্চার কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না। পরাধীন ও দুর্বল জাতির হীন-মন্যতাকে আজ আর বাঁচিয়ে রাখার আবশ্যকতা নেই; আজ সময় ও সুযোগ এসেছে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক যেটা তাকে, অর্থাৎ পুরাতন সম্পর্কের আলোকিত অংশটিকে, আরো বিকশিত করার। যদি তা না করি তবে এক নতুন অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হবে। ইংরেজী ভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আবার সেই ভুল করব যে-ভুল করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুধু পিছিয়ে যান নি, ইংরেজী জানা উর্দুওয়ালা নবাব আবদুল লতিফ ও জিন্নাহ সাহেবদের খপ্পরে পড়েছিলেন, যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হয়েছে অনেক রক্তের দামে ও প্রাণের বিনিময়ে। ভালো বাঙালী হবার জন্যই ভালো করে ইংরেজী পড়া আবশ্যক হবে, যেমনভাবে পড়েছিলেন মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর,

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ বাঙালীরা। ইংরেজের ভয় গেছে, এখন ইংরেজীর ভয় দূর করতে হবে ইংরেজীর জ্ঞানের সাহায্যে। ভয় দূর না হলে চিত্তের স্বাধীনতা আসবে না, চিত্তের স্বাধীনতা ভিন্ন রাষ্ট্রের ও অর্থনীতির স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। আত্মা ও কল্পনাকে ক্ষুধিত-বঞ্চিত রাখার ফল কিছুতেই শুভ হতে পারে না ; ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের যে পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের হাতের সামনে আছে তাকে দূরে ঠেলে দিলে অন্যায় করা হবে, কেননা, দেখা যাবে অভুক্ত আত্মা ও কল্পনা অখাদ্য-কুখাদ্য গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি করছে। বলাবাহুল্য ঐ ভাষার ও সাহিত্যের ভালো অংশকেই নেব, প্রতিক্রিয়াশীল ও খারাপ অংশকে বাদ দিয়ে।

অন্যদিকে ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বর্জন করব এমন কোন আন্দোলনই যদি গড়ে ওঠে তবে তার ফল আত্মঘাতী হবে, কেননা তাতে সম্ভাবনা থাকবে এই রকমের যে আমরা আত্মসমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে দেব এবং চলমান বিশ্ব থেকে ছিটকে দূরে পড়ে যাব। তেমন বিচ্ছিন্নতা কারাবাসের নামান্তর হবে ; তফাৎ থাকবে এই যে কারাবাসকে কারাবাস বলেই জানা থাকে, কিন্তু বিচ্ছিন্নতার কারাবাসকে আমরা সুখকর বলেই কল্পনা করব। এই সুখকল্পনা বিপজ্জনক, কেননা এতে করে আমরা আত্মসন্তুষ্ট হয়ে পড়তে পাড়ি। আত্মসন্তুষ্টি ইতর প্রাণীর গুণ, মানুষের নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইংরেজী কেন, ফরাসী, রুশ বা জার্মান নয় কেন ? এর জবাব আছে ইতিহাসে। অনেক আরবদেশ যেমন ফরাসী ব্যবহার করে, আমরা তেমনি ইংরেজী ব্যবহার করি—ঐতিহাসিক কারণে। তাছাড়া ইংরেজীর সঙ্গে আজ বিরোধ বা বৈরিতার কোন অব-কাশ নেই। বিরোধ বাধে জাগতিক ক্ষেত্রে, অর্থ ও প্রতিপত্তির এলাকায় —যেখানে সম্পদ সীমাবদ্ধ। মানসিক সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে বিরোধের সুযোগ নেই—সেখানে সম্ভাবনা অফুরন্ত। বাঙালী মুসলমান এতকাল বর্জন করে এসেছে, বাংলাদেশে এখন এক নতুন গ্রহণের যুগের প্রবর্তন আবশ্যক। কিন্তু ইংরেজীকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে। সেটি হল উদ্দেশ্য। কোন উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিখব ? নকলের নয়, সৃজনের উদ্দেশ্যে। অনুকরণের জন্য নয়, আবিষ্কারের জন্য। শিখব নিজেদের স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে, সেই স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনে—গ্রাম্যতা, স্বল্পে

সন্তুষ্টি ও সামন্ততান্ত্রিক অন্ধত্বকে বিনষ্ট করবার আবশ্যকতায়। শিখব ব্যাপক ও উদ্দীপ্ত একটি সৃজনশীলতার অংশ হিসাবে, তার বাইরে নয়, তাকে বাদ দিয়ে তো নয়ই। এবং শেখার সময় সংশয়কে সজাগ রাখব, বার বার তাকিয়ে দেখব উদ্দেশ্যের বিচ্যুতি ঘটছে কি না, পুরাতন অন্ধকারাচ্ছন্ন সম্পর্ক আবার কোথাও কোন ভাবে প্রবেশের পথ খোঁজে কি না। সংশয় থাকবে, কিন্তু সন্দেহ থাকবে না, ভয় একেবারেই নয়।

নতুন যুগে ইংরেজী সকল স্তরে সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়াবার প্রয়োজনীয়তা নেই। উচ্চস্তরে অনেকেই ইংরেজী পড়বেন না। গবেষণা যাঁরা করবেন, যাঁরা কাজ করবেন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁরা পড়বেন, আবশ্যক মত। বিশেষ করে ইংরেজী পড়বেন তাঁরা যাঁরা অংশ নেবেন সাহিত্য-সৃষ্টিতে, তার পঠনে ও পাঠনে।

লোকে এতদিন ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হত জাগতিক প্রতিষ্ঠার লোভে, সামাজিক মর্যাদার প্রত্যাশায়, এখন হবে মানবিক কারণে, অন্তরের তাগিদে। অতীতে যেমন করে আমাদের মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে ইংরেজীর পাঠ নিয়ে, ভবিষ্যতেও তেমনি পাবে। তফাত থাকবে এই এতে দুষ্ট অস্বাভাবিকতা থাকবে না, থাকবে না জবরদখলের ক্ষতিকর প্রভাব।

শিক্ষার সঙ্কট

শিক্ষাক্ষেত্রে যে একটা সঙ্কট চলছে এ বিষয়ে দেখা যাচ্ছে সকলেই একমত। এই সঙ্কটটা প্রধানত শিক্ষার সীমানা নিয়ে। সীমানার দুটো দিক : একটি বাইরের, অপরটি ভেতরের। বাইরের দিক থেকে যদি দেখি দেখব যে শিক্ষা সমাজের সকল স্তরে পৌঁছায়নি। আর ভেতরের দিক থেকে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সামান্য, নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

শিক্ষা-বিস্তারের কথা যখন বলব তখন এই সত্যটাকে প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে, দেশে জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে শিক্ষিতের শতকরা হার সে তুলনায় বাড়েনি। এমনিতেই শিক্ষিতের শতকরা হারটা আমাদের দেশে নিষ্করুণভাবে নীচু, জনসংখ্যার অবারণ বৃদ্ধিতে সে হার উপরের দিকে ফুলে ওঠেনি, বরং নীচের দিকেই নেমে গেছে। আজ এই হার বলতে গেলে পৃথিবীর ভেতর নিম্নতম। পৃথিবীর দিকে কারণে-অকারণে আমরা বার বার তাকাই, বিশ্বজনসভায় জাতির মুখোজ্জ্বল হবার সংবাদ নানান সময় ঘোষণা করে থাকি, কিন্তু এই নিম্নতম স্তরে সন্তুষ্ট অবস্থান দিয়ে আমরা উজ্জ্বলতা লাভ করছি কিনা সে-বিষয়ে সকল সময়ে চিন্তিত হই না।

শিক্ষাকে বিস্তৃত করবার উপায় কি? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যে বাড়াতে হবে একথা অতিসহজেই বলা যায়। কিন্তু সংখ্যা কতটা বাড়তে পারে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়তন কতটা হবে? তাতে ছাত্র আসবে সমাজের কোন কোন স্তর থেকে? এই সকল প্রশ্নকে একই সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক। শিক্ষা তো এদেশে ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু। কাজেই ক্রয়ক্ষমতা যাদের আছে তারাই আসবে নগদ মূল্য দিয়ে শিক্ষাকে কিনে নিতে এবং কত লোকের হাতে নগদ মূল্য দেবার মত অর্থ আছে তাই দিয়েই নিরূপিত হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, শিক্ষালয়ের আয়তন। অর্থাৎ কিনা সমাজকে বাদ দিয়ে, সমাজব্যবস্থার বাস্তব চরিত্রকে বিবে-চনার মধ্যে না-রেখে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে আলোচনা করলে তার দ্বারা শুধু কালক্ষেপই হবে, কোন সমাধানে পৌঁছা যাবে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অবিলম্বে। শিক্ষাবিস্তারের এও

একটা উন্নততর পন্থা বটে। কিন্তু ভাষার জোরের চেয়েও টাকার জোর অনেক বেশী। সেই জোর যেখানে নেই সেখানে ভাষাও কাবু হয়ে থাকতে বাধ্য। মাধ্যম যাই হোক না কেন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু থাকলে বিত্তহীনের দীন কুটিরে শিক্ষা কখনো পদার্পণ করবে না। এই সত্যটাকে আমরা যেন ভুলে না যাই।

তাহলে কথা দাঁড়াল এই যে, সমাজে যে দারিদ্র্য অতিউৎকটভাবে মুখ-ব্যাদান করছে তার ভয়াবহতায় শিক্ষা স্বভাবতই আড়ষ্ট, সন্ত্রস্ত হয়ে আছে; ধনবন্টনের যে—বিবেকহীন অসাম্য শিক্ষাবিস্তারের পথ-ঘাটকে নিতান্ত অমসৃণ ও বিঘ্নসঙ্কুল করে রেখেছে তার ফলে শিক্ষা সুযোগপ্রাপ্তদের অতিচেনা ঠিকানা ধরেই শুধু ঘোরাফেরা করছে, তার পক্ষে বাইরে যাবার উপায় নেই, যাওয়াতে উৎসাহও নেই।

শিক্ষার এই অসহায় বন্দীদশার অবসান কিছুতেই হবে না যদি-না সমাজ-সংগঠনে পরিবর্তন আসে, যদি-না দারিদ্র্যের নিপীড়ন অপসৃত হয়, যদি-না অসম ধনবন্টনের দ্বারা তৈরী বিঘ্নসমূহকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়। এই শেষের কাজটাই বেশী জরুরী। দেশের দারিদ্র্যকে দূর করতেই হবে এবং দূর করার জন্য প্রথমেই যা চাই তাহল দেশের জনশক্তিকে ব্যবহার করা, জনশক্তি যাতে বোঝা না হয়ে উৎপাদিকাশক্তিতে পরিণত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সকল মানুষের মিলিত হাত না-লাগলে অভাব ঘুচবার নয়, তা' বৈদেশিক ঋণ আমরা যতই গ্রহণ করি না কেন। হাত মিলবে যখন মন মিলেছে, যখন মানুষে-মানুষে প্রভু-ভৃত্য বা শত্রু-মিত্রের সম্পর্ক ঘুচে গিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কারা করবেন এই কাজ? শিক্ষিতরাই করবেন, বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন তাঁরা করতে যাবেন, কেন তাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন পরি-বর্তন আনতে চাইবেন যাতে তাঁদের এতদিনের সুযোগ-সুবিধেগুলো নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম ঘটে? চাওয়াটা যে স্বাভাবিক নয় সেটা মেনে নেয়া ভালো, তাহলে আমাদের প্রত্যাশার পরিমাপটার একটা মাপজোক হয়। চাইবেন না যে সে আরো এক কারণে: চাওয়ার শিক্ষা তাঁরা পাননি। এইখানে শিক্ষা-সঙ্কটের দ্বিতীয় দিকটার কথা আসে। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষের কথা। গুণের বিচারে আমাদের শিক্ষায় ত্রুটি আছে একথাও আমরা সবাই সমস্বরে বলছি। আমাদের শিক্ষায় ফাঁক আছে ছাত্রেরা নকল করে, শিক্ষকরা ফাঁকি দেন, অভিভাবকরা দায়িত্ব এড়ান—

এসব সবই সত্যি, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দৈন্য এইখানে যে এই শিক্ষা অচল-হই-হই-রকমে চালু সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন তো করতে চায়-ই না, বরঞ্চ পাকে-প্রকারে তাকে সংরক্ষিত করবার কায়দা-কৌশলগুলোই শিক্ষা দেয়। সমাজের যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও তাই-ই। না-হয়ে উপায় নেই, সমাজ-নিরপেক্ষ কোন শিক্ষাব্যবস্থা নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সমাজ ন্যায়বিচার চায় না, চায় মানুষে-মানুষে ভেদরেখাগুলোকে যতটা সম্ভব উঁচু করে রাখতে। এটা অনেককাল ধরে এই সমাজ সম্পর্কে সত্য। ইতিহাসের প্রায় সবটা অংশ জুড়েই এই এলাকাটা বহিরাগতদের করতলগত ছিল। সেইজন্য অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ সময়ে বঞ্চিত থেকেছে। ইতিহাসের অন্ধকারে বঞ্চনাগুলোই শুধু জ্বল জ্বল করে জ্বলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর ন্যায় বিচার ও সাম্যব্যবস্থার কিছু কিছু তপ্ত-শান্ত ধ্বনি সময় সময় শোনা গেছে। কিন্তু সে শুধু ধ্বনিই; ধ্বনিগুলো সত্য হয়ে সমাজের দেহে অস্থিমজ্জায় এখনো মিশে যায়নি। কর্ম-অসমর্থিত ও আন্তরিকতাহীন সদিচ্ছা সমাজ-সংগঠনে কোন বড় রদবদল আনেনি। পরাধীনতার কালে বিদেশী শাসকেরা শিক্ষার যে-ব্যবস্থাটাকে চালু রেখেছিল তার পেছনে অভিপ্রায়টা ছিল চালু সমাজ-ব্যবস্থাটা যাতে সচল থাকে সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। সে-অভিপ্রায়-টাকে এখনো আমরা দূরে নিক্ষেপ করে দিইনি। এখানে-সেখানে ছোটখাটো সংশোধনের দরকার হয় কর, যন্ত্রের যে-সকল অংশ জীর্ণ হয়ে গেছে তাদের পাল্টে নাও যাতে যন্ত্র আরো ক্ষমতাবান হয়ে উঠে। এই কাজটাই চলছে। কিন্তু পুরানো সামাজিক যন্ত্রটাকে বাদ দিয়ে নতুন যন্ত্র চাইব এমন কথার সুযোগ কিংবা প্রশ্রয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোথাও নেই, থাকতে পারে না। তার উপর প্রবল নিষেধাজ্ঞা। আর যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের সমাজব্যবস্থাটা অন্যায় তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও অন্যায় চলছে। যদি ধারণা করি যে, আমাদের সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভ্রান্তিপূর্ণ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাও মনে স্থান দিতে হবে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বিস্তর ভ্রান্তি আছে। যদি আমরা বলি যে, অধিকাংশ মানুষের স্বেদে ও রক্তে অর্জিত সম্পদ যে অল্প কজন ভোগ করবে এই ব্যাপারটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তাহলে না-বলে উপায় কি যে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে দেশের লাভ না হয়ে ক্ষতিই হচ্ছে। সেই অর্থে শিক্ষাবৃদ্ধি অর্থ ক্ষতিকর শক্তির বৃদ্ধি।

শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে শিক্ষাবঞ্চিতের তফাত কি? একটা স্পষ্ট তফাত নিশ্চয়ই এই যে শিক্ষিত মানুষ কৌশল জানেন, তিনি কুশলী। কিন্তু তার চেয়েও বড় তফাত কি এই নয় যে শিক্ষিত মানুষ জীবনের বিভিন্ন দিককে সংলগ্ন করে, একের সঙ্গে অন্যকে সংস্থাপিত করে বিচার করতে জানেন? শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ অন্ধের মত হাতির বড় দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে দেখেন, শিক্ষিত মানুষ সমগ্র প্রাণীটিকে এক সঙ্গে দেখতে পান, প্রাণীদেহের এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের সম্পর্কটাকে তিনি জানেন। অংশগুলোর বিশিষ্ট ও পারস্পরিক উপযোগিতার বিষয়ে তিনি সজ্ঞান। বলাবাহুল্য, এই সংলগ্ন ও সম্পর্কিত করার শিক্ষাকে ভীষণভাবে অবজ্ঞা করা হয় আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায়। ফলে যিনি পদার্থবিজ্ঞান পড়েন তিনি শুধু পদার্থবিজ্ঞানই পড়েন, যিনি সাহিত্যের ছাত্র তিনি শুধু সাহিত্যেরই ছাত্র। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষা ও শাস্ত্রকে সমাজের অবস্থার সঙ্গে, সমাজের দীনতার সঙ্গে এবং দীন অবস্থার প্রতিকারের অনিবার্য প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন না। শিক্ষিত হয়ে আমরা শাস্ত্রজ্ঞ যতটা হই জীবন ও সমাজ বিষয়ে ততটা জ্ঞানবান হইনা, আমাদের শিক্ষিত চক্ষুষ্মানতা একচক্ষু। কৌশল ব্যাপারটা যান্ত্রিক, এবং আমাদের নজর যতটা যন্ত্রের উপর ততটা যন্ত্রের চালকের উপর নয়। সমাজব্যবস্থা ও সমাজ-সংগঠনের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন ছিল। তা হয়নি।

তাই বলে আদর্শের কথা কিছু কম শোনা যায় না। সবচেয়ে বড় আদর্শ বোধ করি প্রচলিতকে নতমস্তকে মান্য জ্ঞান করে এবং তার অন্তবর্তী হয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করা। ঐটেই সাফল্যের পথ, বিবেক-হীনতার অস্ত্র দিয়ে এই পথটা কাটা এবং এই পথেই আমরা সবাই ধাবমান, স্বীয় কীর্তির ধ্বজা ধরে। সাফল্যের উচ্চকন্ঠ-জয়ধ্বনি সর্বত্র। সফল হওয়া মানেই মানুষ হওয়া, মনুষ্যত্বের এই আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার মূলে প্রোথিত। ওদিকে এই মানুষ হবার দুর্বার সাধনায় আমরা যে নিরন্তর অমানুষ হয়ে পড়ছি, সেটাও একটা নির্মম সত্য।

যথার্থ মানুষ আমরা কাকে বলব? কোন্ কোন্ গুণ আমরা প্রত্যাশা করব যথার্থ মানুষের কাছে? বোধ করি বলা যায় যে, আমরা চাইব যে, তাঁর মধ্যে সজীবতা থাকবে, থাকবে সংবেদনশীলতা অর্থাৎ বিবেক, থাকবে সাহস এবং বুদ্ধি। বুদ্ধি সবার আগে নয়, সবার সঙ্গে। অথচ আমাদের

শিক্ষা-ব্যবস্থায় বুদ্ধিকে শুধু শান দেওয়ার কাজটাই চলছে সবচেয়ে বেশী। যথার্থ বুদ্ধি অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু দুষ্ট সমাজে দুষ্টবুদ্ধিই, অর্থাৎ বিবেক-বর্জিত স্বার্থপর বুদ্ধিই, তৎপর বেশী। এই দুষ্ট বুদ্ধিতে শিক্ষিত হওয়া মানেই স্বার্থপর বুদ্ধির ব্যবহারে দক্ষ হওয়া। যে-দেশে অধিকাংশ মানুষ হয় অভুক্ত, নয় অর্ধভুক্ত, সেখানে সজীবতার আশা করা দুরাশা বৈ নয়। সাহ-সের কথা সেখানে বাহুল্য মাত্র। সেখানে সংবেদনশীলতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। অর্থাৎ কিনা এ দেশে বেশীর ভাগ মানুষই মানুষ হবার সুযোগ থেকে মর্মান্তিকভাবে বঞ্চিত। যাদের সুযোগ আছে, যারা নিতান্ত অভুক্ত নয়, বিদ্যালয়ে তারাই আসে শিক্ষিত হবার সোৎসাহ বাসনা নিয়ে। এসে সজীবতাকে হারায় প্রথমে; সাহসকে হারায় প্রায় একই সঙ্গে; বিবেক নিহত হয় তিলে তিলে। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এই হত্যাকাণ্ড চলছে—সজীবতার, সাহসের, বিবেকের। নিরাসক্ত জ্ঞানার্জনের উপর যে-চীনদেশে অসম্ভব গুরুত্ব দেওয়া হত সেই দেশেই গল্প প্রচলিত আছে জ্ঞানীদের রক্ত-মাংসহীনতার। একপাল বন্য প্রাণী একদা ঠিক করেছিল তারা শিকারে বের হবে প্রত্যেকে আলাদা করে, এবং দিনের শেষে একত্র হবে যে যা শিকার করতে পেরেছে তা-ই নিয়ে। যখন রাত নেমেছে তখন জন্তুদের মধ্যে শুধু বাঘই দেখা গেল ফিরেছে শূন্য হাতে। প্রশ্ন করায় সে বলল, প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায়, কেমন করে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বার বার দেখা হয়েছে তার। "প্রত্যুষে দেখা পেলাম এক নবীন ছাত্রের, ভাবলাম, এত কাঁচা মাংসে কি আর আমাদের মন ভরবে। দুপুরে দেখা যাজকের সঙ্গে, ভাবলাম, এ লোক তো বাতাসে ঠাসা আগাগোড়া, দিই একে ছেড়ে। তারপর অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি কাউকে। যখন অন্ধকার হয়ে এসেছে সাক্ষাৎ পেলাম এক পণ্ডিতের। কিন্তু তাকে এনে কি লাভ হত বল? সে-লোক তো শুকনো ও কঠিন, খেতে গেলে বরং ভয় থাকত আমাদের দাঁত ভাঙার।"—এই দাঁত-ভাঙা কাঠিন্যকে শিক্ষার আদর্শ বলে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা আমাদের দেশে আছে, যে কাঠিন্যকে বাঘেও ভয় পায়। কিন্তু ঐ যে নবীন কাঁচা ছাত্র, যাকে দেখে মায়া হয় বাঘের, তাকে বাঘের চেয়েও কঠিন মানসিকতার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিত থাকি, শিউরে উঠি না, উঠলেও বলি এটাই নিয়ম, এটাই শিক্ষার্জনের সর্বজন-স্বীকৃত মহাজন পন্থা। নয়ত বলি, জানি এটা অন্যায় কিন্তু আমার সাধ্য কি একে পাল্টাই।

এই হত্যাকাণ্ডের ফলেই দেখা যাচ্ছে, দেশে শিক্ষাবিস্তারের খবর যদি-বা পাচ্ছি, কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার নতুন উদ্ভাবনা কি সৃজনশীলতার কোন বড় ঘটনা বা শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। বরং উল্টোটা ঘটছে। ক্ষীণবীর্য, হীনসাহস ও ভীরুসংবেদনশীলতার দেশে শিক্ষিত লোক যত তৈরী হচ্ছে, ততই ভিক্ষুক সৃষ্টি হচ্ছে। ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অভাব থাকলে এই বৃত্তিও থাকবেই, কিন্তু তুলনায় যাঁরা সঙ্গতিসম্পন্ন, যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের পক্ষে ভিক্ষুক হওয়াটা দুঃসহ অপরাধ। সমাজ তার সামান্য সম্পদের একটা মোটা অংশ খরচ করছে এই ভিক্ষুকের বোঝা সৃষ্টির কাজে। যেদিন থেকে শিক্ষালাভে নিয়োজিত ছাত্রটি নিজেকে সমাজের আর পাঁচজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশিষ্ট বলে বিবেচনা করতে শেখে, এবং তার উপরে যারা তাদের দিকে নিরলস তাকিয়ে থাকবার অভ্যাস অর্জন করে, সেদিন থেকে এই ভিক্ষুক-প্রবৃত্তির উন্মেষ। পরে এই প্রবৃত্তির শুধু ক্রমাগত অনির্বাণ বিকাশ। এই ভিক্ষুকেরা স্বাবলম্বী নন, এঁরা সৃজন করেন না, সৃজিতের প্রতি লোভ করেন এবং নিজেকে কেবলি হীন জ্ঞান করেন। এদের বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ, বিবেক তত স্থূল। ফলে বিদেশের দৈন্য নিয়ে আমরা অকৃপণ নিন্দাভাষণ উচ্চারণ করি, কিন্তু দেশে যে ঘৃণ্যতম বর্ণবৈষম্যের চেয়েও অপকৃষ্ট ব্যবস্থা বিদ্যমান সে বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করি না। এই ভিক্ষুকের ভিতরে সাহস নেই, তাই ঘরের ও মনের দুয়ার সমানভাবে অর্গলবদ্ধ।

সন্দেহ কি, এই সঙ্কটের অবসান প্রয়োজন। কিন্তু কাজটি করবেন কারা? শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবতন আনবার দায়িত্বটা কি শিক্ষকেরা শক্ত হাতে তুলে নেবেন? নেন যদি তো সে দায়িত্বের পরিমাণ কতটা? এটা একটা বক্র সত্য যে, শিক্ষকরাই সমাজের সবচেয়ে সংরক্ষণশীল অংশ। মুক্তিদাতারাই নানা কারণে সবচেয়ে বেশী আবদ্ধ। তাঁরা যে শিক্ষা দিচ্ছেন সেটাই যে সর্বোৎকৃষ্ট এ-রকম একটা ধারণা তাঁদের মনের মধ্যে প্রশ্রয় না পেয়ে পারে না। একটা মহৎ দায়িত্ব পালন করছি এই অতিপ্রয়োজনীয় সান্ত্বনাটুকু লাভ না করলে শিক্ষকদের চলে না। বিত্তে তাঁরা বঞ্চিত, চিত্তে যদি সন্তুষ্টি না-থাকে, তাহলে তাঁরা চলবেন কিসের অবলম্বনে? তাই তাঁদের অনেকেরই মতে, ব্যবস্থাটা ঠিকই আছে, ছাত্রের যা কর্তব্য সে হল শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে করায়ত্ত করা। করায়ত্ত করার এই কায়দাটা যিনি যত ভালো করে শেখাচ্ছেন, তিনিই তত বড় কৃতী

শিক্ষক। পাঠ্যসূচী ঠিক আছে কিনা, সে-সূচীর দ্বারা ছাত্রের সমাজদৃষ্টি খণ্ডিত হচ্ছে কিনা, এসকল প্রশ্ন তাঁর কাছে অবান্তর। তিনি ভেতরটা চান না, বাইরেরটা চান। ভেতরকে অবহেলা করে বহির্দেশের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি এই কাজটা সমাজের অন্য সকল অংশে জোরেশোরে চলছে—চলছে শিক্ষাক্ষেত্রেও। কাজেই শিক্ষাবিষয়ে চিন্তাপ্রিয় অনেক শিক্ষকের কাছ থেকেই শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন আশা করা যাবে না। তাছাড়া তাঁদের তো চাকরি রক্ষা করার দায়িত্ব আছে। কর্তব্য আছে সফল হওয়ার। যাঁরা পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন, তাঁরাও বলার সাহস অনেক সময় রাখেন না।

অভিভাবকরা একটা কাজ খুব করেন, নিন্দা করেন। সে-নিন্দা শিক্ষা-ব্যবস্থার নয়, পরীক্ষা-ব্যবস্থার। বলা হয়, পরীক্ষা-ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়েছে, ছাত্রদের মধ্যে অসদুপায় অবলম্বনের মহামারি লেগেছে। তা' ঠিক, কিন্তু এই অসৎ পথে চলার শিক্ষাটা বিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে দেওয়া হয় না, এর প্রবণতা ও অভ্যাসটা ছাত্রেরা বাইরে থেকে সঙ্গে নিয়ে আসে, হয়ত তা' বিদ্যালয়ে এসে প্রশ্রয় পায়। অসদুপায়টা কারণ নয়, সেটা লক্ষণ; লক্ষণ সমাজদেহের অভ্যন্তরে ভীষণ এক অসুখের। বস্তুত ছাত্রের পক্ষে অসৎ হবার জন্য গোটা সমাজটাই একটা বিদ্যালয়। অসৎ ব্যবস্থায় প্রতিপালিত ছাত্রটি পরীক্ষা দিতে বসে হঠাৎ করে সৎ হয়ে পড়বে এমন আশার পেছনে যুক্তির প্রশ্রয় নেই। নকল-সমস্যা সমাজবিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা বা সমস্যা নয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সমালোচনা হয় ঠিকই, কিন্তু ওদিকে আবার সমালোচনা হয় না পরীক্ষাব্যবস্থার। পরীক্ষা তো হচ্ছে শুধু মুখস্থ করবার শক্তির, পরীক্ষা হচ্ছে না ছাত্রের বিবেকের, সাহসের, সজীবতার, তার জীবন-ও সমাজ-দৃষ্টির। যদি এই সব বিষয়কে বিচার করে দেখবার ব্যবস্থা থাকত, তবে অসদুপায় অবলম্বনে পার পেতে পারা যেত না। ছাত্রকে তখন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখা হত। আমরা ফাঁকিদেওয়ার শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছি, আবার পরীক্ষার্থী ফাঁকি দিচ্ছে বলে উষ্মা প্রকাশ করছি; এ কাজ ঠিক নয়। তাছাড়া দেশ সাহায্য গ্রহণ করছে বিদেশ থেকে, কেবল গ্রহণ করছে না, কাঙ্গালের মত তাকিয়ে আছে প্রাপ্তি সম্ভাবনার দিকে, সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ছাত্র যদি বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়, ফরেন এইড চেয়ে বসে তবে সেই কাজ ঐতিহ্যবিরোধী কোন কর্ম হবে এমন বিবেচনা করার পেছনে শক্ত যুক্তিই বা কি?

অভিভাবকের দ্বিতীয় অভিযোগ শিক্ষার মান নিয়ে। বলা হয় যে, মান খুব হতাশাব্যঞ্জকভাবে নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়েছে। হয়ত পড়ছে; কিন্তু মান কোথায় নামেনি? কোথায় সে অক্ষুণ্ন আছে? সমাজের সর্বত্র যদি মান নীচু হয়ে হয়ে এসে থাকে, তাহলে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে উঁচু রাখা যাবে কি করে? যাবে কতদিন?

এই দুই-দফা অভিযোগের কোনটাকেই কিন্তু ব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তির আকার ধারণ করতে দেখা যায় না। অথচ সেটাই আবশ্যক ছিল। কেননা শিক্ষাসঙ্কট সমাধানের গোড়ার কথা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের সূত্রগুলো আবার নিহিত আছে সমাজ-দেহের অভ্যন্তরে। সেইখানে, সেই অভ্যন্তরেই আমাদেরকে দৃষ্টি দিতে হবে সর্বাগ্রে। মুক্তির পথ খুঁজি যদি তো খুঁজতে হবে ঐখানেই।

সমাজের প্রত্যাশা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে প্রত্যাশা কি সমাজের? এই প্রশ্নের জবাবে নানান কথার উর্ণনাভ তৈরী করা সম্ভবপর। কিন্তু সমাজের সুবিধাভোগকারী অভিভাবক যারা তাদের প্রত্যাশা একটাই। তারা চায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংরক্ষণশীলতার ঘাঁটি হয়ে উঠুক, তারা চায় যা চালু আছে তাই চালু থাকুক, যার যেখানে জন্ম সে সেইখানেই থাকুক, যে যেমন সুবিধা ভোগ করছে বা করছে না সে তেমনি করুক বা করতে না পারুক। তারা চায় এই চালু রাখার অতি-আবশ্যক কাজে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলো বিশ্বস্ত কর্মচারী সরবরাহ করুক। চাকরির মাপে লোক তৈরী করুক।

এটা ইপ্সিত ছিল বিদেশী শাসকদেরও। তারাও কর্মচারীই চেয়েছিল, কর্মী চায়নি। নব্যশিক্ষিতরা নতুন নতুন কর্মের উদ্ভাবন করে যে-ব্যবস্থাটা নিরুপদ্রবে চলমান থেকে নিয়মিত মুনাফা এনে দিচ্ছে সেই ব্যবস্থাতে উৎপাতের সৃষ্টি করুক এটা তাদের চাইবার কথা নয়; তারা চায়ওনি। বিদেশীরা দেশ ছেড়েছে, তবু দূরে বসে কলকাঠি নাড়াচ্ছে তারাই।

এদিকে কারখানার দেশী চালকেরা যেহেতু আস্থা রাখত না নিজের শক্তিতে, ভুগত যেহেতু হীনমন্যতায়, তাই কারখানার চতুর্দিকে অনেক প্রকার বিধিনিষেধ, সান্ত্রী প্রহরা বসিয়েছে। বিশেষ করে কৃষ্ণদশকে যে অর্ডিন্যান্স তারা চালু করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সংযত রাখবার জন্য তা তাদের মানসিক অবস্থারই নিকটতম প্রতিলিপি। পরে ক্রোধে উন্মত্ত অবস্থায় তারা দৌড়ে গেছে হত্যা করতে শিক্ষকদের। শিক্ষকরা যদি বিপজ্জনক হন সমাজের স্থিতাবস্থার পক্ষে তবে তা তাঁদের কর্মের দরুন যতটা নয়, তাঁদের চিন্তার দরুন তার চেয়ে বেশী। নবীন ছাত্রদের মনে তাঁরা নতুন নতুন ধারণা সংক্রামিত করবেন, সেই সব ধারণা ছাত্রদের উদ্দীপনা ও কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত ও রূপায়িত হয়ে সামাজিক স্থিতি-

শীলতাকে বিপদগ্রস্ত করবে—এটাই ছিল আশঙ্কা। বোধ করি তারা অতিরিক্ত মূল্যায়নই করেছিল শিক্ষকদের।

কিন্তু শুধু বাইরে থেকে নয়, আঘাত এসেছে ভেতর থেকেও। দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষাকে আকর্ষণ করবে এমন জাগতিক শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সব সময় দেয়া হয়নি। ফলে যাঁরা উঁচু সরকারী চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা নির্দ্বিধায় চলে গেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে। অনেকে যাবার চেষ্টা করেছেন, করে ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকতাকে বিধিলিপি হিসাবে মেনে নিয়েছেন। সেই ব্যর্থতার গ্লানিটা থেকে গেছে ভেতরে ভেতরে, যেসকল সুখ ও সুযোগের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলেন লোভ আছে তাদের প্রতি, আছে লোভ চরিতার্থ করতে না-পারার হতাশা। এই শিক্ষক সমাজে কৃষ্ণদশকের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কিন্তু আত্মশক্তিতে আস্থাহীন সরকার যখন নিজের ভিত্তিটাকে চিরস্থায়ী করবার জন্য পারিতোষিকের বন্টন শুরু করলেন মুক্ত হস্তে, তখন তা গ্রহণ করবার মত শিক্ষকের অভাব ঘটেনি মোটেই। বিনিময়ে এঁরা জয়ধ্বনি করেছেন সরকারের। যে-বুনিয়াদি গণতন্ত্র ব্যবস্থা দেশকে সর্বনাশের প্রান্তসীমায় নিয়ে গিয়েছিল এঁরা বলেছেন সেটিই সর্বোত্তম। বলেছেন, এই ব্যবস্থা চিরকাল টিকে থাকবে। সকলে বলেননি, অনেকে চুপ করে থেকেছেন, কেউ কেউ প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদের স্বরগুলোর কোনটিকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে প্রহার করে, কোনটি বা শোনা যায়নি সর্বত্র। প্রবলভাবে শোনা গেছে শুধু প্রশংসার ধ্বনি, সমর্থনের কম্বুকন্ঠ। বুনিয়াদী গণতন্ত্র চিরকাল টিকে থাকবে এই কথাটা বলার সময় ঐ ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে নিষ্পিষ্ট দেশবাসীর প্রতি এমন একটা আত্ম-সন্তুষ্ট অবজ্ঞা ও নির্মম হৃদয়হীনতা প্রকাশ পেয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা চলে নতুন বিজেতাদের পক্ষে যোগদানকারী দেশদ্রোহীর মানসিকতার। সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার প্রচার, ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণে প্রচুর উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে এঁদের ভেতর। এঁরা প্রাপ্য তো পেয়েছেনই, পেয়েছেন পুরস্কারও। কেউ কেউ ক্ষমতার ছিঁটেফোঁটা পেয়ে হঠাৎ খাদ্যপ্রাপ্ত অভুক্তজনের মত উৎসব করেছেন অতিভোজনের। দুষ্ট মুদ্রা যথার্থ মুদ্রার মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল। সব কিছু মিলিয়ে মৃত্যুর ছায়া দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছিল সমগ্র দেশজুড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ছায়া সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল—বলা চলে।

কিন্তু ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছেন পণ্ডিতেরা, হননি সেই অশিক্ষিত সাধারণ মানুষেরা। সাধারণ মানুষ আশা রেখেছিলেন যে, একদিন না একদিন দেশ থেকে অপসৃত হবে মৃত্যুর এই ছায়া, আশা রেখেছিলেন রক্তের প্রবাহে, হৃদ-পিণ্ডের স্পন্দনে, আশা ছাড়া আর কোন আলো ছিল না তাঁদের জীবনে। বুনিয়াদী গণতন্ত্র ব্যবস্থা অনন্তকাল ধরে চলবে এই ভবিষ্যৎ বাণীর প্রচারণা যখন সবচেয়ে বেশী জোরের সঙ্গে চলছিল ঠিক সেই সময়েই পতন ঘটল সরকারের, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সুর ও বাণী বদলে গেছে প্রচারকদের। এত দ্রুত যে প্রায় অবিশ্বাস্য।

পরিবর্তনের জন্য যে আন্দোলন হয় তার সূত্রপাত ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়েই। এটি তাৎপর্যপূর্ণ। যার হবার কথা ছিল সংরক্ষণশীলতার ঘাঁটি সে-ই হয়ে দাঁড়াল পরিবর্তনের সূতিকাগৃহ। আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে ছাত্ররা। কিন্তু আন্দোলনের শিক্ষা শিক্ষকরা দেননি, নবীন অপ্রাণ-ছাত্ররা যে পরি-বর্তন আনতে চেয়েছে সেটা শিক্ষকদের উপদেশ শুনে নয়, বরং বলা যায় শিক্ষকদের উপদেশের বিরুদ্ধেই। পরিবর্তন আনবার আগ্রহ ও অস্থিরতা ছাত্রদের ছিল, কেননা, প্রাণশক্তি ছিল তাদের ভেতরে, যে-প্রাণশক্তিকে সংরক্ষণশীলতার তথাকথিত দুর্গগুলো অবরুদ্ধ রাখতে পারেনি, যে-প্রাণ-শক্তিকে কৃষ্ণ দশক লুপ্ত করে দিতে পারেনি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। পরি-বর্তনের সেই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা।

আসাদুজ্জামানের প্রাণদান ছাত্র-আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের অশান্ত মোহনায় নিয়ে পোঁছে দিয়েছিল। ডঃ শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে শিক্ষিত মানুষ ও সাধারণ মানুষের দূরত্বটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, মানুষের ক্রোধ অগ্ন্যুৎসব হয়ে জ্বলে উঠেছে চতুর্দিক থেকে।

রাজশাহীর মোতিহারে ডঃ জোহা নিহত হয়েছেন, সেই খবরে রাতের অন্ধকারে ঢাকার নাখালপাড়া থেকে সাধারণ মানুষেরা চীৎকার করে বেরিয়ে এসেছেন, সান্ধ্য-আইনকে অমান্য করে, মৃত্যুভয়কে লঙঘন করে। মোতি-হারে-নাখালপাড়ায় বিস্তর দূরত্ব—দূরত্ব শিক্ষার, বিত্তের, জীবনপ্রণালীর। শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত লোকের দুর্গতির জন্য দায়ী—সাধারণ মানুষের এই অভিজ্ঞান না-থাকুক, অনেক বিদ্বান লোক যে সামনাসামনি নিগ্রহের সৃষ্টি করেছেন তাঁদের জীবনে এই অভিজ্ঞতা তো আছে। কিন্তু সেটা খেয়াল রাখেনি কেউ, শিক্ষকের অপমানে নিজের অপমানকে দেখতে

পেয়েছেন তাঁরা। চোখের সামনে একটা পর্দা ঝুলছিল, ডঃ জোহার মৃত্যু এসে আঘাত করেছে সেই পর্দাকে, আঘাত করে ছিন্ন করেছে। নিজেদের জীবনে যে নিষ্পেষণ সহ্য করেছেন তাঁরা, সুযোগ পাননি প্রতিবাদ করবার, হয়ত প্রত্যক্ষও করেননি সেই নিষ্পেষণকে এমন জাজ্জ্বল্যমান, দৃশ্যমানরূপে, প্রত্যক্ষ করেননি সকলে মিলে এক সঙ্গে, সেই নিষ্পেষণের ভয়াবহ চেহারটা হঠাৎ করে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে তাঁরা স্থির থাকতে পারেননি তেমনভাবে যেমনভাবে এতদিন ছিলেন। ডঃ জোহার উপর উৎপীড়নকে তাঁরা নিজেদের উপর উৎপীড়ন হিসেবেই দেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মূল্য যাদের কাছে অত সামান্য তাদের কাছে সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য কি হবে এই নির্মম প্রশ্নের আঘাতে সুপ্ত বিক্ষোভ এক সঙ্গে প্রজ্বলিত হয়ে অদম্য এক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করেছে।

শুধু নিষ্পেষণের সত্যই নয়, আরো কয়েকটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে ডঃ জোহার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ডঃ জোহা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত, সেই অবস্থাতেই মারা গেছেন এবং সেই জন্য মানুষ ক্রুদ্ধ হয়েছে আরো বেশী। রাজনীতিতে শিক্ষকদের অংশ গ্রহণ এ দেশে সহজ ব্যাপার ছিল না। তার একটা কারণ অবশ্যি এই যে, নিষেধাজ্ঞা ছিল সামনে, অংশ গ্রহণ করলে ভয় ছিল শাস্তির। কিন্তু যদি বিধিনিষেধ নাও থাকত, যদি বে-আইনী না হত কাজটি, যদি অপসৃত হত শাস্তির ভয় তাহলেই যে শিক্ষকরা দলে দলে যোগ দিতেন রাজনীতিতে এই আশা নিতান্তই অযথার্থ। কেননা শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্য সক্রিয় কর্মে নয়, সক্রিয় চিন্তায়। ওদিকে রাজনীতির ক্ষেত্র সব সময়েই এত বেশী উপদ্রুত, সংঘাতপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল যে, তার সঙ্গে সংগতিবিধানে সমর্থ হবার কথা নয় শিক্ষকদের। তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি ও পেশাগত অভ্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

শিক্ষাভিমানীরা বলে থাকেন যে, রাজনীতির অঙ্গনটা ভীষণভাবে পঙ্কিল, তার স্পর্শ সকল সময়ে পরিত্যাজ্য। এই কথার ভেতর একটা মস্ত বড় প্রতারণা আছে। যেমন আছে টাকা পয়সা হাতের ময়লা এই প্রচারণায়। রাজনৈতিক ক্ষমতার টক আঙ্গুর যদি মুখের কাছে এসে পড়ে তাহলে মুখ ফিরিয়ে নেবেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা সুপ্রচুর নয়। সেই কৃষ্ণ দশকে মুখ ফিরিয়ে নেননি অনেকেই, নেবেননা আজো। রাজনৈতিক ক্ষমতার তথাকথিত আস্তাকুড়ে যাঁরা বসবাস করার অধিকার

পেয়েছেন, যাঁরা গা মাখিয়েছেন ময়লাতে, তাদের স্পর্শ লাভ করার প্রতিযোগিতায় শিক্ষিত মানুষরা কেউ কম যাননি কারো তুলনায়। বলা হয় যে, রাজনীতির বিশেষ দুর্বলতা এইখানে যে, এতে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের, অসৎ ও বিত্তবানদের, লজ্জাহীন ও বিবেকবর্জিতদেরই রাজত্ব। এই কথায় সত্য আছে হয়ত। এটা অবশ্যি আসল দুর্বলতা নয় আমাদের রাজনীতির। আসল দুর্বলতা অন্যত্র, সে হচ্ছে এই সত্যে যে আমাদের রাজনীতিতে কেউ কেউ রাজা, অন্যরা সকলেই চিরকাল ধরে প্রজা। এই রাজনীতি, রাজার নীতি, প্রজার নয়, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। রাজা বদল হয়েছে রাজধানীতে, প্রজার তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় নি, প্রজার জীবনে যে অন্ধকার আগে ছিল তা পরেও থেকেছে। স্বাধীনতা এই ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনেনি। ক্ষমতা এখনও কেন্দ্রীভূত বিত্তবানদের হাতেই। সাধারণ মানুষের একটি অধিকার আছে, ভোট দেওয়ার, সেই অধিকারও সকল সময় প্রয়োগ করার সুযোগ ঘটেনি, যখন ঘটেছে তখন দেখা গেছে বিত্তবানেরা ভোট ক্রয় করতে এসেছেন, যেমন ভাবে পাটের ব্যবসায়ীরা আসেন পাট কিনতে, এসেছেন প্রতিশ্রুতির ঝকঝকে মুদ্রা নিয়ে। ভোট কেনা-বেচা হয়ে গেছে, ভোট নিয়ে চলে গেছেন মহাজন, দরিদ্র প্রজা বাজারে গিয়ে দেখেছেন প্রতিশ্রুতির ঐ মুদ্রা নকল, ঐ মুদ্রা বাজারে চলে না, ওটা ভাঙ্গিয়ে খাদ্য বা বস্ত্র পাওয়া যায় না।

রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে শিক্ষকদের মানসিক দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। দ্বিধা আছে আরো এক কারণে, যে কারণটা বোঝা যায় জোহা-পরিবারের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের দিকে তাকালে। সে বুনিয়াদ শক্ত ছিল না আদৌ। অনেক দায়িত্ব ছিল এই শিক্ষকের। বৃদ্ধ পিতা-মাতার স্বপ্ন, ভাই-বোনের আশা, স্ত্রীর আকাঙ্খা, সন্তানের ভবিষ্যত সবই জড়িয়ে ছিল ডঃ জোহার চাকরিকে। দায়িত্ব ছিল। ছিল দায়িত্ববোধ। এটা ব্যতিক্রম নয়, উদাহরণ মাত্র। দায়িত্ব ও দায়িত্ববোধের এমন ভার আছে প্রায় সকল শিক্ষকের জীবনেই। সে জীবন কখনোই দুশ্চিন্তামুক্ত নয়।

তাছাড়া নিরাপদও নয়। ডঃ জোহার মৃত্যু এই সত্যটাকে নির্মমভাবে প্রকাশিত করেছে সকলের সামনে। তিনি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না, যুক্ত না থাকলেও নিরাপদ ছিলেন না মোটেই, যেমন নিরাপদ ছিলেন না সেই তরুণী মাতা, যিনি শহীদ হলেন নিজের ঘরে সন্তানের

পরিচর্যা করবার সময়, যেমন ছিলেন না সেই কর্মচারী যিনি প্রাণ ছিলেন বদ্ধ দোকানের ভিতরে বসে। বস্তুত জীবনের মূল্য অতিশয় অকিঞ্চিতকর জনবহুল এই দেশে। পদে পদে সে আমাদের অনুসরণ করছে। করছে যে সেটা যেমন বুঝতে পারি যখন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন, তেমনি বুঝতে পারি যখন গুলিবর্ষণ হয় আন্দোলন-কারীদের উপর তখনো। মাঠের কৃষক যেমন নিহত হয় ঝড়ে, তেমনি পথের কিশোর নিহত হয় গুলীতে। নিরাপত্তাহীনতার এই বিষয়টা খেয়াল করবার সময় বা সুযোগ ঘটে না অধিকাংশ মানুষের জীবনে। যাঁদের ঘটে, অর্থাৎ যাঁদের হাতে বিত্ত আছে কিছু তাঁরা দৌড়ে যাই জীবন-বীমা করতে, ছোটাছুটি করি জায়গা-জমির পিছনে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই আগামীকালের কথা ভেবে। আস্থা নেই সমাজের প্রতি, সমাজব্যবস্থার প্রতি।

ডঃ জোহাকে দিয়ে শুরু, তাঁর পরে আরো অনেক, অনেক শিক্ষক শহীদ হয়েছেন উনিশশ একাত্তুরে। এঁদের অনেকেই রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু বাইরে ছিলেন কি? বাইরে থাকলে রাজনীতির ঘূর্ণিচক্রে নিহত হতেন না। আমরা কেউ বাইরে নই রাজনীতির, মাছের সঙ্গে যেমন পানির সম্পর্ক আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে তেমনি রাজনীতির। রাজ-নীতিকে বাদ দিয়ে অর্থনীতি বা সমাজনীতির ক্ষমতা নেই এক পা অগ্রসর হবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়ে যদি ভাবি নিরসন করব ভিক্ষাবৃত্তির তবে সে সদুদ্দেশ্যের প্রশংসা করা যায় বটে, কিন্তু তাকে বাস্তবধর্মী বলা চলে না। ভিক্ষাবৃত্তির অবসান চাইলে প্রয়োজন তার অবসান ঘটাতে পারে এমন রাজনীতির।

বস্তুত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এই ভেদরেখাগুলি নিতান্ত কৃত্রিম। জীবনকে যেমন টুকরো টুকরো করে কাটা যায় না, কাটলে জীবন, জীবন থাকে না, তেমনি জীবনের এই প্রকাশগুলোকেও পৃথক করা যায় না কিছুতেই, বলা যায় না এখানে এর শেষ ও শুরু। দারিদ্র্য যদি আমাদের প্রধান শত্রু হয় তাহলে আজ সে প্রবেশ করছে সকল দরজা দিয়েই, তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে প্রতিটি প্রবেশ পথে, তা না করে কোন একটি বিন্দুতে লড়লে সে ঢুকে পড়বে অন্য রাস্তা দিয়ে, পরাজয়কে তখন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না কিছুতেই। এই কথাটা ছাত্ররা জানেন, তাই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ কি উচিৎ না এই জিজ্ঞাসাটা

তাঁদের অবান্তর, রাজনীতি জীবনের মতই, অনিবার্য তাতে অংশগ্রহণ। দেশের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা কোন গুণ নয়, দোষ—আমরা তাকে গুণ বলে যতই প্রচার করি না কেন।

সমাজকে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কিছু উপহার দিয়েছে। দিয়েছে বিবেকবান পুরুষ, দিয়েছে হৃদয়হীন দুর্বৃত্ত। সব চেয়ে বেশী দিয়েছে সার্থক ও বিশ্বস্ত কর্মচারী। কিন্তু কর্মচারী সরবরাহের তালিকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবমালা গাঁথতে চাইলে ভুল হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আসাদুজ্জামান ছিলেন, ছিলেন ডঃ জোহা, ছিলেন আবুল বরকত এও কম মূল্যবান নয়, ছিলেন সংখ্যাহীন তরুণেরা যাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে, রক্ত দিয়েছেন অকাতরে। বিশ্ববিদ্যালয় চালু সমাজব্যবস্থাকে সচল রেখেছে এই সংবাদ প্রচার করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বাড়ে না, যথার্থ গৌরব বাড়ে এই সংবাদে যে নিজের সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশ্ব-বিদ্যালয় সমাজপরিবর্তনের আন্দোলনগুলোর জন্য দিয়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয়েছে, বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে, রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে, উনসত্তুরের গণ-আন্দোলনে, একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয় সকলের আগে ছিল। যখন ছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষণ-শীলতার ঘাঁটি হিসেবে কাজ করেনি, কাজ করেছে পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে। উচচচিন্তার সূক্ষ্ম বিলাসী বস্ত্র নির্মাণে তার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, দেখা গেছে সে সাধারণ নিত্যব্যবহার্য বস্ত্রের তন্তুবায় হিসাবেও কাজ করতে পারে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সেই কর্তব্য পালন করেছে যা ছিল সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা। সামাজিক সুবিচারের নিশ্চয়তা দানের কাজে বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হবে এটাই সমাজের সাধারণ মানুষ আশা করেন। এ আশা তারা সাহিত্যিক বা সাংবাদিকদের কাছে ততটা আশা করে না যতটা করেন শিক্ষকদের কাছে। কেননা অন্ধকারের দেশে আলো বিস্তারের একেবারে প্রাথমিক কাজটা শিক্ষকরাই করবেন, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের কাজ পরবর্তী স্তরে। তার চেয়েও বড় কথা বিবেকবান মানুষ শিক্ষকদের মধ্যে না খুঁজলে কোথায় খোঁজা যাবে সে শিক্ষা সাধারণ মানুষ লাভ করেনি এখনো। চালকদের সকল অবরোধ লঙ্ঘন করে বিশ্ব-বিদ্যালয় যে সাধারণ মানুষের জীবনে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে এইখানেই তার বিশেষ গৌরব।

২

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা একটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ছয়টি হয়েছিল; কিন্তু সেই সময়ে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। ছয়গুণ বড় কেউ আশা করবে না, কিন্তু দ্বিগুণও বৃদ্ধি পায়নি। সেকালে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তির দিকে দৃষ্টি না-দিয়ে শীর্ষের দিকে দেওয়াটা রেওয়াজ ছিল। আসলে গোড়ায় গলদ রাখা এবং মাথাকে ভারি করার জাতীয় প্রবণতাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। এবং যে-মানসিকতা থেকে এই প্রবণতার উদ্ভব, শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্যের সৃষ্টি, সেই মানসিকতাও ঐ শিক্ষাব্যবস্থারই অবদান।

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা যে এদেশে প্রবর্তন করা হয়েছিল তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নকল, স্থানীয় ও বশংবদ একটা শ্রেণী তৈরী করা। শুধু ভৃত্য তৈরী করলেই ইংরেজের শাসন, অর্থাৎ শোষণের কাজ চলে যেত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শুধু ভৃত্য নয় ভিক্ষুকও তৈরী হয়েছে। এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যাঁদের ধনসম্পত্তি বাইরে থেকে নয়ন-শোভন, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে যারা সম্পূর্ণ দেউলিয়া। যাঁরা আত্মশক্তিতে আস্থাহীন, এবং প্রভুর প্রসাদভোগে লোলুপ, যাঁদের মধ্যে আত্মসচেতনতা আছে কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ নেই। যাঁরা শ্রমবিমুখ ও সম্পদ উৎপাদনে অসমর্থ। ইংরেজ চায়নি নীচের দিককার শিক্ষা জোরদার হোক, তার কাম্য ছিল চালু শাসনব্যবস্থাটাকে জোরেশোরে চালু রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে তাঁবেদার কিছু লোক তৈরী হোক।

এই উদ্দেশ্য এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন আছে। বলা হয়েছে যে, আলিগড় না থাকলে পাকিস্তান হত না। কথাটা মিথ্যা নয়। মিথ্যা যা তা হল এই দাবী যে আলিগড় না থাকলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের, নিরন্ন কৃষকের, ভীষণ বড় একটা সর্বনাশ হয়ে যেত। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও স্বীকৃত অবদান আছে পাকিস্তান আন্দোলনে, কিন্তু পাকিস্তান যেহেতু শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে সাধারণ মানুষের কল্যাণ বিধানে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ভূমিকার অকুন্ঠ প্রশংসা করা সঙ্গত নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রবলভাবে আন্দোলন করেছে, কিন্তু সে আন্দোলনে প্রতিষ্ঠানগত-

ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রকার সহায়তা করেনি, বরং সক্রিয়ভাবে তার বিরোধিতা করেছে। এখন সময় এসেছে এই পুরাতন উদ্দেশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে পরিত্যাগ করবার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে এখন আমরা কি চাই? চাই পূর্ণ মানুষ, যে মানুষের মনভরা জিজ্ঞাসা, হৃদয়ভরা ভালোবাসা। যে-মানুষ দেশের দারিদ্র্যকে ঘৃণা করবে, যে নিজেকে তো বটেই নিজের সমাজকেও রোগমুক্ত সৌন্দর্যে গরীয়ান করবার জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করবে।

নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হবার জন্য আজ যখন আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন একটা প্রাথমিক কর্তব্য হবে বিশ্ববিদ্যালয় যাতে উল্টানো পিরামিডের শীর্ষে বসে গোড়ায় পুষে-রাখা গলদের উপর পুষ্ট না হয় তার জন্য নীচের স্তরের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ যাতে আরো অনেক অনেক বেশী সুবিস্তৃত হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলে আসবে না, কিন্তু সমাজের সকল স্তর থেকে মানুষ আসবে, যতদিন না সামাজিক স্তরভেদ অবলুপ্ত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হয় তখন দুটো সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টির সুযোগ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কেবল তারাই পাবে যাদের সঙ্গতি আছে পর্যাপ্ত; দুই, যারা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজে ফিরে যাবে তারা নিজেদের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র, এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করবে। এটা গতকালের কথা; আজ আমরা এমন ব্যবস্থা চাইব যাতে করে গ্রামের ছেলে, দরিদ্র ছেলে মেধাগত যোগ্যতা থাকলে অনায়াসে চলে আসতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর একটা উপায় হচ্ছে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদেরকে আরো অনেক বেশী বৃত্তি প্রদান করা। তাদেরকে নানাভাবে নানাদিক দিয়ে সহায়তা ও সমর্থন দান করা। এই ক্ষেত্রে ব্যয়ের অঙ্ক দেখে আতঙ্কিত হওয়া অন্যায় হবে, কেননা এ ব্যয় অপব্যয় নয় এ হচ্ছে পুঁজি-বিনিয়োগ।

হয়ত এর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে উৎপাদনশীল করে তোলা। সৃষ্টি কর, সৃজন কর, উৎপাদন কর—এসব কথা কম বলা হয়নি কখনো। তবু পালে হাওয়া লাগেনি। এর প্রধান কারণ উদ্যমের অভাব। উদ্যম আসবে অনুপ্রেরণা থেকে, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধির কামারশালায় যে-অনুপ্রেরণা তৈরী হয় তার দৌড় সামান্য। অন্যদিকে যে

অনুপ্রেরণা সকলের মিলিত অনুপ্রেরণা, যার সামনের লক্ষ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যার ভেতরে আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সে-অনুপ্রেরণা প্রবল উদ্যমের স্থষ্টি করতে পারে, যেমন করেছিল মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকদের মধ্যে। বলাবাহুল্য, উৎপাদনের জন্য শুধু এক জোড়া হাত-ই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হাতকে পরিচালনা করার মত সক্রিয় ও বলিষ্ঠ হৃদয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষায় শুধু বুদ্ধির অনুশীলনের উপরই যে গুরুত্ব দেওয়া হয় সে কাজটা ভুল, বুদ্ধির সঙ্গে পরিচর্যা প্রয়োজন হৃদয়েরও। এমন শিক্ষিত হৃদয় চাই বাংলাদেশে যে হৃদয় দারিদ্র্যকে ঘৃণা করবে আন্তরিকভাবে, যে হৃদয় শুধু ক্রন্দন করবে না বা ক্রুদ্ধ হবে না, ক্রন্দন ও ক্রোধকে একত্র করে উদ্যত হবে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনকে সম্ভব করে তুলতে।

দারিদ্র্যঅপনোদনে একটা প্রাথমিক অন্তরায় ধনবণ্টনের অসাম্য। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ দেখতে হলে বাংলা দেশে আসতে হবে, পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বৈষম্য দেখতে হলেও এদেশে না এসে উপায় নেই। শতকরা নব্বই জনেরও বেশী মানুষকে আমরা পঙ্গু, অথর্ব ও মানুষ-নামের-অযোগ্য করে রেখেছি। এই অযোগ্যতাই দারিদ্র্যের প্রধানতম উৎস। অথচ শত শত বছর ধরে এই অতিশয় অন্যায় ব্যবস্থাকে আমরা অকম্পিত-হৃদয়ে অবনত-মস্তকে মান্য করে আসছি। মান্য করার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি। সেই অতি পুরাতন অভ্যাসও দীর্ঘদিনের শিক্ষার প্রভাবকে লুপ্ত করে নতুন শিক্ষার প্রবর্তনা একটা কঠিন কাজ। এই কঠিন দায়িত্ব আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটাবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। প্রত্যাশা আরো বেশী করে এই জন্য যে আমরা সকল দিক দিয়ে, অন্ধ-কারের হাতে, সংস্কার, সমাজ, অর্থনীতি—সকলের হাতে নানাভাবে আবদ্ধ। একথা আদৌ সত্য নয় যে মানুষ জন্মে স্বাধীন হয়ে, তারপর পরাধীন হয় ঘটনাগতিকে। উল্টোটাই বরং সত্য, মানুষ জন্মে বন্দী হয়ে, স্বাধীনতা তাকে অর্জন করতে হয় চেষ্টা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে। তদুপরি বাংলা-দেশের মানুষ আমরা আমাদের পেছনের ইতিহাস রাজনৈতিক পরাধীনতার ইতিহাস। এই দেশে স্বাধীনতা আগেও একবার এসেছিল বলে শুনেছিলাম, সেই স্বাধীনতার ব্যর্থতার প্রমাণ পাওয়া গেছে স্বাধীন মন ও চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বটা তাই মোটেই হাল্কা নয়।

কিন্তু মুক্ত মনের সৃষ্টি করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়কেও মুক্ত হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কখনো কোনদিন মুক্ত ছিল না আমাদের দেশে। ইংরেজরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় তখন কলকাতা-লণ্ডনের মধ্যে যে-সকল পত্র বিনিময় ঘটে তার মধ্যে একটা অবিশ্বাস দোদুল্যমান থেকেছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যাতে শুধু সমালোচক ও বিদ্রোহী উৎপাদন না করে তার প্রতিশোধক হিসাবে সেই মডেলের অভ্যন্তরে গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবিশ্বাসের এই উত্তরাধিকার ১৯৭১ পর্যন্ত কায়েম ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় যাতে কায়েমী স্বার্থকে আঘাত করতে না পারে সে-বিষয়ে সর্তকমূলক ব্যবস্থা বরং আরো বেশী জোরদার করা হয়েছিল পাকিস্তানী আমলে। নিজে যে স্বাধীন নয় অন্যকে সে স্বাধীন করবে এ আশা দুরাশা।

কিসের স্বাধীনতা? স্বাধীনতা, প্রধানত জ্ঞান আহরণের ও বিতরণের। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বিতরণ করে, জীবিকার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে। কিন্তু শুধু তা-ই করে না, করলে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় থাকে না, কারিগরি বা পেশাগত শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের ইশারা আছে, বিশ্বের দিকেই তার গতি, নানান দিক থেকে জ্ঞান আহরণ তার কর্তব্য। জ্ঞানের কোন সীমা নেই, জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্রে গণ্ডিটানা বা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে পড়া মৃত্যুরই সমতুল্য। এই আহরণের কাজে শিক্ষককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। বিতরণের আগেই আহরণ চাই।

এ কাজে যেন কোন ভয় না থাকে। ভয় স্বাধীনতার নিকৃষ্টতম শত্রু। ভয় মানুষকে আড়ষ্ট করে, তার তুহিন স্পর্শে সকল উৎসাহ, সব উদ্দীপনার তড়িৎ-মৃত্যু ঘটে। নির্ভয়ে অনুশীলন করার সুযোগ জ্ঞান-আহরণের একেবারে প্রথম শর্ত। জ্ঞান মানে শুধু তথ্যের সমারোহ নয়, পরস্পর সম্পর্কবিহীন তথ্যের অতিরিক্ত ভিড় জ্ঞানের পক্ষে বরং অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে; তথ্য তখনি সত্যিকারের জ্ঞানের বিষয় হয় যখন এক তথ্যের সঙ্গে অন্য তথ্যের সম্পর্কটি আমরা দেখতে পাই, তথ্য যখন তত্ত্বে পরিণত হয়। অর্থাৎ কিনা শুধু তথ্য সংগ্রহের স্বাধীনতা দিলে চলবে না তথ্যকে তত্ত্বে পরিণত করার স্বাধীনতা দেওয়াও প্রয়োজন হবে। এমন কি জ্ঞানও যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বিজ্ঞতার,

যার অর্থ জ্ঞানকে পরীক্ষা করে দেখা, জীবনের বাস্তবিক এলাকায় তার প্রয়োগ-মূল্য নির্ণয় করা। এইখানে আসে সত্যকে প্রকাশ করার অধিকারের কথা। স্বাধীনতা চাই প্রকাশ করবার। জ্ঞান যিনি অর্জন করলেন তিনি যদি অর্জিত জ্ঞানকে প্রকাশ করতে না পারেন তাহলে সে অর্জন তো অর্থহীন। দ্বিতীয়ত, প্রকাশ না করতে পারলে তাঁর মতের সত্যকে পরীক্ষা করে দেখবেন কি করে? অপরীক্ষিত সত্য সত্যই নয়। জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হলে বিরোধের পথেই অগ্রসর হতে হবে, আর কোন পথ নেই। তাই একমতের সঙ্গে অন্য মতের বিরোধ এটা অতিশয় বাঞ্ছনীয়। আর এই বিরোধের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে একপক্ষ মত প্রকাশে ভয় পাচ্ছেন বা অন্য পক্ষ প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যায় আনুকুল্য লাভ করছেন তাহলে সত্যিকারের সত্য যে-মত তা হয়ত বিজয়ী হবে না। এই অবস্থাটা ভয়াবহ; কেননা এতে যে শুধু মিথ্যার জয় হয় তাই নয়, সত্যেরও দেশান্তর ঘটে। আর যে-মিথ্যা সত্যের চেহারা নিয়ে ক্ষমতাবান হয়ে উঠল, তারও সত্যিকার শক্তিলাভ ঘটেনা, কেননা সে তো নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে নেই, বাইরের অবলম্বনটা অপসারিত হওয়া মাত্রই তার পতন ঘটে, অন্যের হাতধরে হাঁটতে পারা পঙ্গু শিশুর মত হয় তার অবস্থা। মত-প্রকাশের স্বাধীনতা আসলে মত-বিতরণেরই স্বাধীনতা। বিতরণের ক্ষেত্রেও ভয় থেকে অব্যাহতি চাই। নিজে যে ভীত অন্যকে সে নির্ভয় করতে পারে না।

আমাদের মত দরিদ্র ও জনাকীর্ণ দেশে এই ভয়ের ভূমিকা স্বভাবতই দুঃশাসন। প্রায় সকল শিক্ষকই চাকরির উপর নির্ভরশীল, কারো কারো পরিবার বড়, অনেকেরই নির্ভরশীলের সংখ্যা আয়ের সংগে সামঞ্জস্যহীন। তাই চাকরির ব্যাপারে যে কোন ঝুঁকি ভদ্রজীবন যাপনের পক্ষেই বড় রকমের হুমকি। সেই জন্য নিজের মত প্রচার করতে গিয়ে চাকরি হারাব এমন বেপরোয়া মনোভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশা করা অযৌক্তিক। চাকরি হারানো পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই, চাকরি হারাতে হতে পারে এই ভয়ই যথেষ্ট, এমনকি উন্নতি হবে না এমন ভয়ও। এই যখন পরিস্থিতি তখন 'ভয় নেই' এমন মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে কাজ হবার নয়, দীর্ঘদিন ধরে মনের অনেক গভীরে যে-অনিশ্চিত ভয়টা নিশ্চিন্তে বসবাস করছে সেটাকে দূর করা প্রয়োজন। ভয়টা অহেতুক নয়, ভয়ের প্রশ্রয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

সর্বত্র। কৃষ্ণ দশকে বিশেষ অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষমতা একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। দেশের অধিকাংশ মানুষকে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছিল এই অজুহাতে যে তারা অশিক্ষিত, অথচ দেশের সব চাইতে শিক্ষিত অংশ যেটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, তাঁদেরকেও শিক্ষক থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক অধিকার অনুশীলন করবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বজ্রাঘাতের এখানেই শেষ নয়, এটা চরমরূপ লাভ করেছে তখন যখন এই ব্যবস্থাটার প্রশংসাপত্র আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই একাংশের হাত দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অবমাননা যে হয়েছে শুধু তাই নয়, সত্যেরও অমর্যাদা ঘটেছে। অতএব শুধু ভয় কেন, বন্ধনও সত্য। তুলনায় ছাত্ররা অনেক বেশী স্বাধীন; জ্ঞানের ক্ষেত্রে নব্য আগন্তুক-দের যে অধিকার প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, প্রবীণদের সে অধিকার দেওয়া হওনি।

মতবিরোধহীন প্রশান্তি শুধু মৃতকল্প দেশেই সম্ভবপর। বিশ্ববিদ্যালয় যদি মতবিরোধহীন হয়ে পড়ে তাহলে মৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। মৃত্যুতো জীবনের উদ্বোধন ঘটাতে পারে না, তাই মৃত প্রতিষ্ঠানে যার মানসিক লালন-পালন তেমন ছাত্রের কাছ থেকে জীবন্ত উৎসাহ প্রত্যাশা করা যাবে না। তাছাড়া, বিদ্যার একটা ভার আছে, সেই ভারে হৃদয়ের সজীবতা ও স্পর্শকাতরতা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। যিনি শিক্ষক তাঁর ভেতরের সজীবতা ও সৃষ্টিশীলতা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শিক্ষক-তার কাজটা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে; এবং যন্ত্র এমনকি যন্ত্রেরও সৃষ্টি করতে পারে না। তাই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক শিক্ষক যেন হৃদয়ের দিক দিয়ে সজীব থাকেন, তাঁর ভেতর সৃষ্টিশীলতা অব্যাহত থাকে। ভয় এই অতি-প্রয়োজনীয় সজীবতা ও সৃষ্টিশীলতাকে নিঃশেষ করে দেবার শক্তি রাখে।

চরিত্রের দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান। অতীতকে সে মর্যাদা দেয়, প্রাচীনকে বিবেচনার মধ্যে রাখে। কামরার দরজা বন্ধ করে তবেই অধ্যাপনা করা সম্ভব হয়, নইলে বাইরের শব্দে শিক্ষকের গলার শব্দ তলিয়ে যায়। তেমনি করে মনের দরজাও সময় সময় বন্ধ করতে হয় নইলে সমসাময়িক কাল ভীষণ কোলাহল করতে থাকে, কালোত্তীর্ণ যে-সমস্ত কথা তারা আর শোনা যায় না। অন্যদিকে আবার দরজা না বন্ধ করে দিলে, নিজের বক্তব্যের উপর আস্থা না থাকলে, শুধু বাইরের

শব্দের জন্য কান পেতে থাকলে বক্তব্য কিছুতেই ছাত্রের কাছে উপস্থিত করা সম্ভব হয় না। এমনিতেই যে-প্রতিষ্ঠান রক্ষণশীল তার বাইরে যদি নিষেধের ও ভয়ের নিশ্ছিদ্র মস্ত এক প্রাচীর তুলে দিই তাহলে বিশ্ব-বিদ্যালয় বদ্ধ খাঁচায় পরিণত হবে। অথবা, উপমা বদলে বলা যায়, বদ্ধ জলাশয়ে—যেখানে জ্ঞানের সচল প্রবাহ নেই, আছে শুধু স্তব্ধতা। সকলেই জানেন বদ্ধ জলাশয় স্বাস্থ্যের পক্ষে অবাঞ্ছিত; তেমন জলাশয় থাকার চাইতে না থাকাই হয়ত বাঞ্ছনীয়।

ভয় সমাজের দিকে থেকেও আছে; স্বাধীনতা দিলে নানান মতের ঝড়ঝাপটায় নির্মাণ কাজের ক্ষতি হবে এমন ভয়। কিন্তু নির্মাণ করবে কে? নির্মাণের জন্য সক্ষম নির্মাতা প্রয়োজন; আর সে কেমন নির্মাতা যার চোখ নেই দেখবার, কান নেই শুনবার? চোখ কান বন্ধ করে কাজ করা চলতে পারে, কিন্তু মাত্র অল্পক্ষণের জন্য; আর কি কাজ করছি সেটা বুঝতে না পারলে অকাজ হবারই আশংকা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করতে চাই, তাহলে তাকে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক সুস্থ সবল মানুষ গড়ে তুলতে, পঙ্গু মানুষ নয়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সৃষ্টিই হবে ইপ্সিত লক্ষ্য, হাতে-তুলে খাওয়ানো নির্বাচিত পথ্যভোজী শিশু সৃষ্টি নয়। জ্ঞানই শক্তি এটা পুরানো কথা, কিন্তু সত্যি কথাও বটে।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার এলাকাটির কথা বিবেচনা করা যাক। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ করার অবাধ স্বাধীনতার কথা বলেছি। ছাত্র নির্বাচনের অধিকারও থাকা দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতে।

শিক্ষক নিয়োগের সময়ে শিক্ষকদের বিচারকেই চূড়ান্ত বিবেচনা করা দরকার। চিকিৎসকের যোগ্যতা বিচার যেমন চিকিৎসকের পক্ষেই করা সহজ, শিল্পকলার ক্ষেত্রে যেমন শিল্পীর জ্ঞান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা হয় না, শিক্ষক-নির্বাচনের কাজেও তেমনি শিক্ষকদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। আর এই যোগ্যতা নির্বাচনের সময় শুধু ডিগ্রি দেখাই যথেষ্ট নয়, শিক্ষকের সজীবতা ও সৃষ্টিশীলতাকেও বিবেচনার মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়, ছাত্রের মনে শিক্ষকের কি চেহারা ধরা পড়েছে সে প্রশ্নটিকেও অবজ্ঞা না করাই ভালো। আর চাই প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার শিক্ষকদের হাতে দেওয়া।

সব মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকা চাই। কিন্তু

স্বায়ত্তশাসনের অর্থ যেন ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ না হয়। দেখতে হবে ক্ষমতার যাতে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, ক্ষমতা যাতে শিক্ষকদের হাতে থাকে। এক বিন্দুতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। ক্ষমতার নিজের মধ্যেই প্রবণতা আছে তার অপব্যবহারের। অভুক্তরা খাদ্য দেখলে চঞ্চল না হয়ে পারেন না, তাই ক্ষমতার চারপাশে ক্ষমতা-হীনদের ভিড় জমে। ফলে কর্তৃপক্ষের তুষ্টি-সাধন যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তুষ্টিসাধনকারীরা একটা শ্রেণী হিসাবেও গড়ে উঠতে পারেন। এর ফলে অধিকাংশ শিক্ষকের মনে অসন্তুষ্টি, হতাশা ও নিরুৎসাহ দেখা দেয়; তাঁরা মনে করেন প্রতিষ্ঠান তাঁদের নয়, মনে করেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়ার চাইতে কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনের কাজে দক্ষতা অর্জনই শ্রেয়। শিক্ষকতার কাজ থেকে ভালোবাসা অন্তর্হিত হতে পারে। আর ভালোবাসাহীন শিক্ষকতা যে কি প্রাণঘাতী তার বর্ণনা তো রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন সেই গল্পে যেখানে খাঁচায়-বদ্ধ পাখীকে হুকুম-পাওয়া পণ্ডিতেরা প্রচণ্ড বিক্রমে বইয়ের শুকনোপাতা ভক্ষণে বাধ্য করে-ছিলেন। সে পাখীর অপমৃত্যু ঘটেছিল। তাছাড়া অসন্তুষ্ট চিত্তে বৈরী-ভাবের উদ্ভব হয়, এবং ক্রোধের চাপা অনুভব বিপজ্জনক; এ-কথাটা প্রাচীন গ্রীকরা বুঝেছিলেন, বুঝে তারা ট্র্যাজেডির নাট্যানুষ্ঠান করতেন, যাতে অনুভবগুলো বিমোক্ষণের পথ পায়। মোটকথা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চাই। দেখতে হবে সিদ্ধান্তগুলো যেন উপর থেকে নীচে না আসে, যেন নীচ থেকেই উপরে ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষকই যেন মর্যাদা পান, যেন মনে করেন এ প্রতিষ্ঠান তাঁরও।

বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ-বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, সমাজের ভিত্তির উপর গড়া গৃহ। তাই, শেষ বিচারে, সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা কতটা, স্বাধীনতা কতখানি তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাকেও নির্ভর করতে হয়। আমরা জনাকীর্ণ পরিবেশে ঠাসাঠাসি বসবাস করি, ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট স্থান ছেড়ে দিতে পারিনা। একে অপরকে সন্দেহ করি। দরিদ্র-দেশে পরমতসহিষ্ণুতা অনেক সময় বিলাসিতা মনে হয়। ধনের দারিদ্র্য মনের দারিদ্র্য সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া উষ্ণ দেশের লোকেরা এমনিতেই অসহিষ্ণু। দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ও পরিবেশের যে-অভাব তার কুফলও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতায় গিয়ে আঘাত করবে বৈকি। মানুষ স্বভাবতই বিশ্বাস-প্রবণ, নতুন ধারণাকে সে সন্দেহের

চোখে দেখে, কেননা নতুন ধারণা আজন্মলালিত প্রিয়ধারণাগুলোকে তছনছ করে দিতে চায়। আমাদের সমাজে শিক্ষার যেহেতু ভীষণ অভাব, তাই অন্ধবিশ্বাস অতিশয় প্রবল। বিশ্বাসীর কাছে সংশয় হচ্ছে অশুভের পতাকাবাহী যেমন দার্শনিক নীটশের কাছে ছিলেন দার্শনিক সক্রেটিস। আমরা অতিনাটকীয় বীরত্বের প্রশংসা করতে রাজী, কিন্তু শান্ত সাহসকে দেখতে পাই না। সর্বোপরি একথা সত্য যে, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে নানান বাধা আছে। শিক্ষকের পক্ষে বক্তব্যটা প্রচ্ছন্ন রেখে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়, যেমন সম্ভব ঔপন্যাসিকের পক্ষে যিনি অন্তরাল গ্রহণ করতে পারেন শিল্পকলার। কিন্তু এমনকি উপন্যাস রচনা ক্ষেত্রেও বিঘ্ন আছে আমাদের দেশে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা স্বল্প না হয়ে উপায় কি।

শিক্ষকের মর্যাদা দানের আপাতমধুর দৃষ্টান্ত অনেক সময় চোখে পড়ে। রাজনীতিতে, হস্তরেখা দর্শনের শিল্পে, 'ঐন্দ্রজালিক' কৌশল প্রদর্শনে, 'প্রফেসার' নামের বিস্তর হাঁক-ডাক কিন্তু সত্যিকারের প্রফেসার হওয়ার চেয়ে শাসনকর্তা হওয়ার বিষয়েই লোকের আগ্রহ বেশী। প্রাথমিক শিক্ষক পিওন হবার জন্য উমেদারী করছেন এমন সংবাদ সর্বজনবিদিত। শিক্ষার সর্বস্তরেই এ ব্যাপারটা সত্য। সবচেয়ে মর্মান্তিক 'ব্রেইন ড্রেন' এইটেই, শিক্ষকের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়া। স্বদেশী চাকরী ছেড়ে যিনি বিদেশী চাকরীতে যান তিনি শুধু নিজেকেই নিয়ে যান এবং তিনি বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে স্বদেশের উপকার করবেন এমন সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেন; কিন্তু শিক্ষক যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য চাকরী খোঁজেন তখন শুধু নিজেকেই নিয়ে যান না, অনেক যোগ্য লোক সৃষ্টির সম্ভাবনাকেও নিয়ে চলে যান।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার যে সকল শব্দ প্রায়ই শোনা যায়, সেগুলোর অধিকাংশই ধ্বনি নয়, প্রতিধ্বনি। ধারণাটা বিদেশী, তার অস্তিত্বটাও। আর ঐ যে শব্দ শোনা যায়, শোনা যায় শব্দের প্রতি সমর্থন তাতে বরং একটা ক্ষতি হবার ভয় থাকে, কেননা তাতে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে যে যার কথা এত শোনা যাচ্ছে সে বুঝি আছেই। আর এও স্মরণ রাখা প্রয়োজন জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না দিয়ে, সে ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি না করে শিক্ষককে পুরস্কৃত করা, তাঁকে পারিতোষিক দেওয়া, এতেও

কোন লাভ নেই, বরং ক্ষতি আছে; কেননা শিক্ষার কাজ শিল্পকর্মের মত, সে কাজ সৃষ্টির কাজ, সেখানে কাজই কাজের পুরস্কার, সেই পুরস্কার না দিয়ে অর্থ পুরস্কার দেওয়া বরং তাঁকে পথবিচ্যুত করার প্রয়াস পাওয়া। উপকথায় সাধকদের প্রলোভন দেখিয়ে সাধনাবিচ্যুত করবার চেষ্টার কথা শোনা যায়, এও প্রায় তেমনি। অর্থের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু অর্থের চেয়েও যা বেশী করে প্রয়োজন সে হল স্বাধীনতা, জ্ঞানের চর্চা করবার সুযোগ ও সুবিধা। সেই সুযোগ সুবিধা আছে এমন কথা বললেই শুধু চলবে না, আছে যে এবিষয়ে মনস্তাত্বিক সম্বিতের সৃষ্টি করতে হবে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষক অনুভব করতে পারেন যে তাঁর স্বাধীনতা আছে।

মতামতের স্বাধীনতাকেও স্তব্ধ করে দিতে যখন আমরা উদ্যত হই তখন কোন ধারণার উপর কাজ করি? আমরা তখন শুধু এই মনে করি না যে আমাদের ধারণা অভ্রান্ত, আমরা এও মনে করি যে অন্যের ধারণা, যে ধারণাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে, সেটা ভ্রান্ত। এ দুটো ভিন্ন জিনিস। এবং নিজের মতের উপর এতটা আস্থা রাখা উচিত কিনা এ কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সমাজের কথা বললাম, সমাজকে সমালোচনা করবার অধিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়কে না-দিলেই নয়। প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা যথেষ্ট নয়, সমাজের ত্রুটি নির্দেশের স্বাধীনতাও প্রয়োজন। এই স্বাধীনতা না দিলে কি হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আছে নাৎসি জার্মানীতে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার নিজের একটা সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, তাতে সুফলও ঘটেছিল, জ্ঞানের বিকাশ চলেছিল কিছুদিন। কিন্তু সমাজের অন্য ব্যাপার চলছিল, রাজনৈতিক জীবনে অন্ধকার ও অন্ধতা গড়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সেসব অন্ধকার ও অন্ধত্বের দিকে তাকায়নি; সমালোচনা করেনি সমাজের; আর সেই না করার খেসারত লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিতে হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতা দেব কি দেব না এ প্রশ্ন আসলে অন্য কয়েকটি প্রশ্ন। সেগুলো হল: যে প্রতিষ্ঠান আমাদের মুক্তি দেবে বলে আশা করছি তাকেই কি বন্ধনজর্জর করে রাখব? সমাজের যে অংশ জ্ঞান ও চিন্তায় সবচেয়ে অগ্রসর বলে ধরে নিয়েছি তাকেই কি নির্বাক করে দেব? যেখানে সমাজদেহের বুদ্ধি ও হৃদয় প্রতিষ্ঠিত সেখানেই কি

নিষেধ ও ভয়ের শাসন চালু রাখব? বিশ্ববিদ্যালয়কে কি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখতে চাই—নাকি মৃত? এই প্রশ্নগুলোর কি জবাব দিই তার উপরে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা নয়, সমাজের ভবিষ্যতও অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। কায়েমী স্বার্থকে বিধ্বস্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে আজ আমরা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি। সমাজতন্ত্র আমাদের জীবনে কোথাও নেই, কোনদিন ছিল না। গণতন্ত্রও তথৈবচ। আমাদের ইতিহাস ভূগোল, সমাজ, মানসিকতা সব কিছুরই প্রবণতা হল গণতন্ত্রের বিরোধী করা। ধর্মনিরপেক্ষতায় আমরা অনভিজ্ঞ। পাকিস্তানের জন্ম ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে হয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনি পাকিস্তান সৃষ্টি যে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এটাও অসত্য নয়। ধর্মান্ধতা ও ধর্ম-নির্ভরতা আমাদের অচেতন-অবচেতন লোকে শিকড় গেড়ে বসে আছে। জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি এর থেকে মুক্তির জন্য, কিন্তু শুধু জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরলে কি বিপর্যয় ঘটতে পারে তার নিদর্শনের জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন নেই, নষ্ট পাকিস্তানের পুষ্ট ইতিহাস তো আমাদের জীবনের বহুপ্রকার ব্যর্থতার মধ্যেই সেই নিদর্শনকে উন্মুক্ত করে রেখে গেছে। নতুন শিক্ষাকে তাই অগ্রসর হতে হবে পুরাতন শিক্ষাকে অবলুপ্ত করে। বাধা আসবে পুরাতন অভ্যাস থেকে, মানসিকতা থেকে, পুরাতন শিক্ষা-সৃষ্ট কায়েমী স্বার্থ থেকে। পাকিস্তান আমলের অন্য সব সময়ে তো বটেই, এমনকি হানাদারদের আত্মসমর্পণের নয়দিন আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষক মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতির নিন্দা করে সভা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই, সেই এলাকাতে যে-এলাকার মাটি ঐ শিক্ষকদেরই বহু সহকর্মীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। আনুপাতিক হারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে হানাদারদের যত সহযোগী ছিল অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে তত ছিল না। আল-বদররা অশিক্ষিত ছিল না, অনেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত।

নতুন মানসিকতা সৃষ্টির কাজটা সহজ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অতিশয় কঠিন ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নতুন মানুষও নতুন মানসিকতা তৈরীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা। অসার্থক শিক্ষালয় থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

হৃদয়ের শিক্ষা চাই

দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-অসামান্য মূল্য দিতে হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ খুঁজব কোথায়? খুঁজতে যদি হয় তবে খুঁজতে হবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হবার যে-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্ভাবনার মধ্যে। অগ্রসর হওয়ার পথে অন্তরায় আছে অনেক, দুস্তর অন্তরায় আছে দারিদ্র্যের ও শোষণের, কিন্তু তাঁর চেয়েও নিকটবর্তী অন্তরায় বোধ করি যথার্থ শিক্ষার অভাব।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে তিনটি: চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করা; সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক সৃষ্টি করা; এবং বিবেকবান ও সৃজনশীল মানুষ সৃষ্টি করা। দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটি পত্তন করা হয়েছিল চাকুরি-জীবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে উপরিপাওনা হিসাবে সংস্কৃতিবান ভদ্রলোকও পাওয়া গেছে কিছু কিছু—চাকুরি এলে ভদ্রতাও আসে, না-এসে পারে না। কিন্তু শিক্ষার তৃতীয় প্রয়োজনীয়তা কতটা মিটবে: বিবেকবান ও সৃজনশীল মানুষ এই ব্যবস্থায় তৈরী হয়েছে কি না, হলে কয়জন হয়েছে—জিজ্ঞাস্য সেটাই।

চাকুরি নয়, ভদ্রলোকও নয়, মানুষ সৃষ্টি করাই যে শিক্ষার মূল কথা হওয়া উচিত এই সত্যটা সকলেই মান্য করেন, কিন্তু ঐ সত্য মান্যকরা আর সত্যকার মানুষ সৃষ্টি করা এক কথা নয়। দারিদ্র্যের যে-হৃদয়হীন বন্ধনে আমরা আটকা পড়েছি তা থেকে মুক্ত হবার জন্য আজ ভীষণভাবে দরকার কারিগরী কৌশলের; দরকার দক্ষ, কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমান মানুষের। এই প্রয়োজনের সত্যটিকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে অবশ্যই; কিন্তু রাখতে গিয়ে খেয়াল রাখা আবশ্যক হবে যাতে মুহূর্তের জন্যও চোখ ফিরিয়ে না নিই অন্য একটি সত্য থেকে। সেটি হল এই যে, কৌশল-জ্ঞান, দক্ষতা, কর্মনিপুণতা এ সকল ব্যাপার চালুকে চালু রাখার ব্যাপার, সৃষ্টিশীলতার ব্যাপার নয়। সৃষ্টি বুদ্ধির একার কাজ নয় কখনো, সৃষ্টিতে মস্ত বড় ভূমিকা হৃদয়ের।

শুষ্ক বুদ্ধির মধ্যে বরং একটা যান্ত্রিকতা আছে। এই কথাটা ডি, এচ, লরেন্স খুব উঁচু গলায় বলে গেছেন। লরেন্সের গলার উচ্চতাটা বাদ দেওয়া যায়, কিন্তু সব বাদছাদ দিয়েও এই সত্যটা অবিচলিত থাকে যে, বুদ্ধির একক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্ভুলতার মধ্যে অসদ্ভাব আছে প্রাণের। বুদ্ধি নির্মম-ভাবে আপন বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধঃ বুদ্ধিকে ব্যবহার করার পৌনঃপুনিক একঘেঁয়েমি থেকে বিরক্তিকর ক্লান্তি আসে, আসে বিষণ্ণতাও। দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড সুন্দর করে বলেছেন, ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন বিরক্তিকর একঘেঁয়েমিতে অতিষ্ঠ হয়ে; আদম যখন দেখল বিরক্ত লাগছে একা একা তখন চাইল সে হাওয়াকে; স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বিরক্ত হল যখন তখন খেল তারা নিষিদ্ধ ফল। সেই থেকে বিরক্তি নিরন্তর তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাদের। বিরক্ত মানুষ মাত্রেই সাক্ষ্য দেবেন, কি ভীষণ এই পিছু-ধাওয়া। বুদ্ধিতেই শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের, কিন্তু শুষ্ক বুদ্ধির বিশুদ্ধ চর্চায় উপাদান আছে বিরক্তির, আর সেই সঙ্গে, একই সঙ্গে, বিষণ্ণতার।

এই বৃত্ত থকে মুক্তির পথ কোথায়? পথ আছে। পথ আছে হৃদয়ের চর্চায়। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা যদি ফল্গুধারার মত এসে লাগে বুদ্ধির গায়ে, তবে শুষ্কবুদ্ধি সৃজনীবুদ্ধিতে পরিণত হয় অনায়াসে। হেগেল মিথ্যে বলেননি যখন বলেছেন যে প্রচণ্ড আবেগ ভিন্ন কোন মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি কোন কালে। একাকী বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি হয় না, হলেও শুধু কঙ্কাল সৃষ্টিই হতে পারে। সেই কঙ্কালে প্রাণ আসে হৃদয় থেকে। প্রাণের মূল্যেই সৃষ্টির মূল্য, কঙ্কালের মূল্যে নয়। যখন আমরা সৃজনশীল হয়ে উঠি তখন বিরক্তি কেটে যায়, তখন ব্যর্থতাবোধের বিষণ্ণতাও আর থাকে না। কিন্তু কি সৃষ্টি করব; সকলেই তো আর শিল্পী নন? আসলে সকলেই শিল্পী, অন্য কিছুর না হোক নিজের জীবনের তো বটেই।

কিন্তু শুধু সৃষ্টি নয়, হৃদয়ের চর্চার মধ্য দিয়ে একাকিত্বের বোধ কেটে যায় মানুষের। এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের মমত্ব যখন গড়ে ওঠে তখন আর আমরা ক্ষুদ্র থাকি না, সামান্য থাকি না—তখন ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, বৃহৎ হয়ে পড়ি। তখন শুধু মানুষ নয়, যুক্ত হই প্রতিপার্শ্বের সঙ্গেও। যখন বুঝি আমরা একা নই তখন হতাশা আসে না সহজে, বিষণ্ণতা আসে না স্বল্পসুযোগে। মানুষ স্বার্থপর প্রাণী; তদুপরি শিক্ষিত মানুষ মানেই

বিচ্ছিন্ন মানুষ, কেননা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। বুদ্ধি যত সূক্ষ্ম হয় মানুষে মানুষে দূরত্বটাও তত প্রবল হয়ে উঠে। (আমরা যখন অসন্তুষ্ট হই কারো ভাবগতিক দেখে তখন দেখা যায় ঠিক চিনেছি বুদ্ধির কাজকে। আমরা বলি "কে বুদ্ধি দিয়েছে শুনি"? বলে চেপে ধরতে চাই বুদ্ধির কুটিলতাকে।) এই বাংলাদেশে মানুষে মানুষে দূরত্ব সৃষ্টি করার কাজে যত কায়দাকৌশল চালু আছে, অন্যকোন কিছু সৃষ্টির কাজে তেমন আছে বলে মনে হয় না। বিচ্ছিন্নতার জায়গায় মিলনকে প্রতিষ্ঠার জন্য, তথা নিঃসঙ্গতার বিষণ্নতা ও হতাশাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য হৃদয়ের পরিচর্যা করা খুব বেশী করে প্রয়োজন।

যাকে আমরা বিবেক বলি তা অশরীরী কোন বস্তু নয়। শোপেন-হাওয়ারের কথাটা বার বার স্মরণযোগ্য, "মানব-হৃদয়ে গভীর রূপে প্রোথিত করুণাই হচ্ছে নৈতিকতার একমাত্র যথার্থ ভিত্তিভূমি।" বিবেকের সত্যি-কারের আশ্রয়কে পাওয়া যাবে না আধিদৈবিক অনুশাসনে অথবা নীতি-জ্ঞানের হট্টগোলে, পাওয়া যাবে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধে। ওয়েগনার ও হিটলার উভয়েই জার্মান ছিলেন, ছিলেন উভয়ে নিরামিশ-ভোজী, কিন্তু একজন যে শিল্পী হলেন অন্যজন নিপীড়নকারী তার কারণ তাঁদের একজনের হৃদয়ে ঐ মমতা ছিল, অন্যজনের হৃদয়ে তা ছিল না। সমাজের মধ্যে যদি সাম্যের প্রতিষ্ঠা চাই আমরা তবে সে-সাম্য আনতে পারব না পুলিশের লাঠির সাহায্যে, তাকে আনতে হবে বিবেকের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল বিবেকের নিয়ন্ত্রণকে সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। এই নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করবার ব্যাপারে উদ্যমশীল হওয়া প্রয়োজন আজ ভীষণভাবে। বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সাহায্যে মানুষকে উত্তেজিত করা কঠিন নয়, হিংসা থেকে হিংস্র হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা; কিন্তু শুধু উত্তেজনা ও হিংসার মধ্য দিয়ে মহৎ কাজ সংগঠিত করা সহজ নয়, এমনকি মহৎ সমাজবিপ্লবও নয়। সমাজ-বিপ্লব কেন চাই? চাই মানুষকে ভালোবাসি বলে। ভালোবাসার কারণে, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এমন বিপ্লব চাই আমরা যার প্লাবনে সব রকমের শোষণ ও অত্যাচার অপসারিত হতে পারে সমাজ থেকে।

সভ্যতার অগ্রগতির কথা ধরা যাক। এই অগ্রগতির জন্য আমাদের প্রতীক্ষা দীর্ঘদিনের। কিন্তু অগ্রগতির অর্থ কি? সভ্যতার অগ্রগতির সুখসুবিধার বস্তুগত উপকরণ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে

মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধের, বিবেকের, তথা হৃদয়ের বিকাশের উপর। হেরডেটস এক বর্বর উপজাতির কথা উল্লেখ করেছেন, যে-উপজাতির লোকেরা নিজেদের পিতা ষাট বছর পার হলে আর দেরী করত না, পাছে তারা সমাজের বোঝা হয়ে পড়ে এই ভয়ে নিজেদের পিতা-মাতাকে নিজেরাই ভক্ষণ করে ফেলত। বিবেক ও নীতিজ্ঞানের এই স্তর আমরা পার হয়ে এসেছি বলেই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু কতটা এসেছি? যতটা এসেছি সভ্যতার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতিও ঠিক ততটাই। সমাজের বোঝা—এই বোধ কি এখনও চালু নেই? সমাজের বোঝা যারা তাদের নীরবে নিঃশব্দে ভক্ষণ করার কাজ কি এখনো চলছে না সমাজে? চোখের সামনে একটা লোক গাড়ীচাপা পড়লে আমরা হৈ হৈ করি, চালককে ধরে এনে শাস্তি দেই, কিন্তু সমাজের গাড়ী চালু রাখতে বিস্তর লোক চাপা পড়ছে অহরহ; তফাৎ এই যে হৈ-চৈ-টা হচ্ছে না, তফাৎ এই যে চালকদের প্রহার না করে আমরা সমাজের মাথায় তুলে বসাচ্ছি। সভ্যতা প্রতিদিন পরীক্ষা দিচ্ছে—দিচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য-বোধের মধ্যে, পরীক্ষা দিচ্ছে সাধারণ, সুযোগবঞ্চিত মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত অবিচারে।

লাভ-লোকসানের চেয়ে ভালোমন্দের প্রশ্নকে বড় করে দেখার মধ্যে বিবেকের পরিচয় আছে। তবু নীতিবোধ জিনিসটা দেখতে যতটা সরল আসলে ততটা নয়। বৃদ্ধ পিতামাতার মাংস ভক্ষণ করাটা যদি নীতি হয় তবে সেই নীতিবোধ না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়—নিঃসন্দেহে। তাই ভালো-মন্দের প্রখর জ্ঞান আছে—এই খবরটা যথেষ্ট নয়, খবর করতে হবে কোন-টাকে ভালো জ্ঞান করা হচ্ছে, আর কোনটাকে মন্দ তারও। নীতির নৈতিক উৎকর্ষও স্বতঃসিদ্ধ কিছু নয়, একটি বিচার্য প্রশ্ন বটে। সমাজের নেতৃত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁদের প্রধান শক্তি হবে নৈতিক শক্তি। এই সত্যটিকে পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে নৈতিক শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তির যদি ক্ষমতা থাকত শাসন করবার তাহলে মানুষের ইতিহাসে নিপীড়ন-কারীরা পরাভূত হত না বার বার।

বিবেকের তো বটেই, হৃদয়ের চর্চা উদ্বোধন ঘটায় সেই সকল মানবিক গুণেরও যুগযুগান্তের পরীক্ষায় যারা টিকে আছে, যাদের কথা সেই কন-ফুসিয়াসের কাল থেকে মানুষ বলে বলে আসছে, বলে বলে ক্লান্ত হয়নি। উদ্বোধন ঘটে সততার, ঔদার্যের, মহানুভবতার। ঘটে সামাজিক শিষ্টা-

চারের। শিষ্টাচার ব্যাপারটা হৃদয়ের ব্যাপার নয়। সামাজিকতার ব্যাপার, অধিকাংশ সময় ব্যাপার আনুষ্ঠানিকতার, কখনো কখনো স্বার্থ-বুদ্ধির। অধিকসজ্জিতা মেয়েদের প্রসাধনের মত সামাজিক শিষ্টাচার বেশীর ভাগ সময়ই প্রাণকে উন্মোচিত করে না, প্রাণের অভাবকেই শুধু ঢেকে চেপে রাখে। শিষ্টাচারী মাত্রেই বিনয়ী—এমন কোন কথা নেই, শিষ্টাচার দুর্বিনয়কে আচ্ছাদিত করে; প্রতারণার উদ্দেশ্যে। সেই জন্যে শিষ্টাচারে বিশেষভাবে প্রয়োজন হৃদয়ের স্পর্শের। ভদ্রতা যাতে সত্যি-কারের ভদ্রতা হয়, বিনয়ের প্রকাশ যাতে বিনয় হয় যথার্থ, অপরের প্রতি সম্মান যাতে আত্মিক কারণেই ঘটে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির কারণের পরিবর্তে—তার জন্য উষ্ণ হৃদয়ের তাপ অত্যাবশ্যক।

সৌন্দর্যজ্ঞান—সুন্দরকে চিনবার ক্ষমতা, জীবনকে, এবং জীবনের জন্য সমাজকে, সুন্দর করবার আগ্রহ—জীবনের একটি মূল্যবান সম্পদ। এই জ্ঞানেরও বিকাশ সম্ভব হৃদয়ের পরিকর্ষণার মধ্য দিয়ে।

সরল হৃদয়ের অভ্যন্তরে জীবনদায়িনী ক্ষমতা আছে বলেই টলষ্টয় বার বার বলেছেন কৃষকের জীবনে ফিরে যাবার কথা। গন্তব্যের এমন সরল স্থিরনির্দিষ্টতাকে সন্দেহের চোখে দেখবার অবকাশ হয়ত বা আছে, কিন্তু অবকাশ নেই টলষ্টয়ের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যকে সন্দেহ করবার। শুষ্ক বা স্বার্থ-বুদ্ধিসর্বস্বতার ভেতর জীবন নেই, জীবন নেই সেখানে যেখানে বিত্তের প্রাচুর্য আছে কিন্তু সম্পদ নেই চিত্তের, যেখানে ক্ষমতা আছে কিন্তু সুখ নেই। আনন্দহীনতা শিক্ষা দেওয়া কিছুতেই উদ্দেশ্য হতে পারে না শিক্ষার। আনন্দের মধ্য দিয়ে আনন্দবৃদ্ধিকারক শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

২

প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা কি বুদ্ধির অথবা জাগতিক উন্নতির দিক দিয়ে এতটা এগিয়ে গেছি যে হৃদয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হব? এগিয়ে নিশ্চয়ই যাইনি, কিন্তু উন্নতির লক্ষ্য যখন স্থির করছি তখন নিশ্চয়ই খেয়াল রাখতে হবে যাতে লক্ষ্যপথে সামগ্রিক উন্নতির পূর্ণ চিত্রটি থাকে, ভারসাম্যের অভাব যেন কিছুতেই না ঘটে। প্রশ্ন এও হতে পারে যে, হৃদয়ের দেশ বলে প্রসিদ্ধি যে-দেশের সে-দেশে হৃদয়চর্চার কথা এত জোর দিয়ে কেন বলা? এর জবাব কিছুটা বিস্তৃত করে দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে, লোকশ্রুতি যাই হোক আমাদের দেশ মাত্রাতিরিক্ত রূপে হৃদয়বান এমন দাবী করা যাবে না। কেননা সামাজিক নিষ্ঠুরতার কোন অভাব নেই এদেশে, অভাব নেই মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের। ওদিকে শত শত বছর ধরে যেভাবে আমরা দারিদ্র্যকে সহ্য করে আসছি সেই সহ্যশক্তির ভেতর হৃদয়ের ইচ্ছাশক্তির অভাবটা বড় বেশী প্রকট।

বাঙলা নাটকে বাস্তবতা সৃষ্টির সমস্যার কথা বলতে গিয়ে মধুসূদন মন্তব্য করেছিলেন, "আমরা বাস্তবকে ভুলিয়া পরীর রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর।" বাস্তবে এই অবজ্ঞা ও স্বপ্নে এই বিভোরতা শুধু আমাদের সাহিত্যের নাটকে নয়, জীবনের নাটকেও সত্য। এই অর্থে আমরা হৃদয়বান বটে। কিন্তু এ হৃদয় কোন হৃদয়? নিশ্চয়ই শিক্ষিত, মার্জিত, পরিশীলিত হৃদয় নয়। অকারণ ভাবাবেগ, অতিরিক্ত অন্যমনস্কতা বা উদাসীনতা—এরা হৃদয়ের অশিক্ষার লক্ষণ, অন্য কিছুর নয়। প্লীহা রোগীর অতিকায় প্লীহা যেমন স্বাস্থ্যের প্রমাণ দেয় না, অকারণে উত্তেজিত বা অহেতুক অস্থিরহৃদয় তেমনি দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। শিক্ষার যে তৃতীয় উদ্দেশ্যের কথা বলেছি তার অন্তর্গত একটি দায়িত্ব হল মানুষকে তার পুরাতন বন্ধন থেকে মুক্ত কবা। যে-হৃদয় পুষ্ট নয়, সে-হৃদয় পুষ্ট করে শুধু বন্ধনকে। বন্ধন কিসের? বন্ধন কুসংস্কারের, অন্ধবিশ্বাসের, বন্ধন ভয়ের। আবদ্ধ হৃদয় পঙ্গু হয়ে পড়ে, আপনা থেকেই। আশঙ্কা থাকে আবদ্ধ অবস্থাতেই তার স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে হঠাৎ একদিন। অশিক্ষিত হৃদয় অতি সহজে উত্তেজিত হয়—প্রচণ্ডরূপে। তার অশ্রুপাতে সৃজনের উপাদানেরা ভিজে ভিজে ওঠে, ফলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টিতে। অশিক্ষিত হৃদয় ক্রীড়নক হয়ে পড়ে অন্যের হাতের, প্রবল কোন বায়ুপ্রবাহের আয়োজন ঘটলে সে মাথা নুইয়ে দেয়, এপাশে ওপাশে। পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকাই যদি, পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের দিকেও—দেখব কত সহজে প্রতারিত হয়েছে আমাদের হৃদয়, স্বীয়স্বার্থসিদ্ধকারী মানুষদের হাতে। হৃদয়কে তাই শক্ত হতে জানতে হবে, কোমল হতে জানার সঙ্গে সঙ্গে। ভাগ্যপরিবর্তনের দুর্বার ইচ্ছাশক্তির উৎসমুখ একটাই, শিক্ষিত হৃদয়। অশিক্ষার কর্দমে ক্ষতি আছে, লাভ নেই।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি চাই, চাই ভাগ্যপরিবর্তনের *বিপুল প্রবল উদ্যম, আর সেই জন্যই হৃদয়ের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চাই বুদ্ধির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, যাতে করে অনুভব ও ধারণা,* আবেগ ও জ্ঞান,

কল্পনা ও বুদ্ধি একত্র কাজ করতে পারে, যাতে করে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সুবর্ণসংযোগে আমরা নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারি সবল ও সমর্থ পদক্ষেপে। পানির প্রবল স্রোতকে বশ করে যেমন আমরা বিদ্যুৎ-শক্তি এনেছি, তেমনি করে আবেগ থেকে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা আনতে হবে, নইলে বন্যা আসবে দুর্গতিকে মাথায় নিয়ে।

তুকভিল আমেরিকার গণতন্ত্রের উপর তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় আলোচনার স্বাধীনতা যত ছিল, চিত্তের স্বাধীনতা তত ছিল না। আলোচনার স্বাধীনতা ও চিত্তের স্বাধীনতা এক বস্তু নয়। ঠিক তেমনি বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তি ও হৃদয়ের বয়ঃপ্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। বুদ্ধিতে পক্ক মানুষ আবেগের দুর্বলতায় শিশুর মত আচরণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক রমোন্যাসের যন্ত্রদানবদের উদাহরণ নেয়া যায়। বুদ্ধিতে তারা টসটসে পাকা, কিন্তু যেহেতু হৃদয় নেই ভেতরে তাই তারা নিতান্তই অমানুষ। তুকভিল দেখিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক আমেরিকায় আমেরিকার সমালোচনা সহ্য করবার শক্তির অভাব ছিল, অথচ ফরাসী দেশের অভিজাতশ্রেণী তাদের নিজেদের উপর লেখা ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক নাটক উপভোগ করতে পারত অতি সহজে। এবং কারণ এই যে, অভিজাত-শ্রেণী অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল না হৃদয়ের দিক থেকে। উত্তেজনার মধ্যে ধৈর্য, ভয়ের মধ্যে সাহস, বিপর্যয়ের মধ্যে বিজ্ঞতা বজায় রাখার শিক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, বুদ্ধির নয়।

তথাকথিত আদর্শবাদের আমরা বিস্তর প্রশংসা করি, কিন্তু এই আদর্শ-বাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার যদি থাকে (এবং আমাদের প্রচলিত আদর্শবাদের মধ্যে অবশ্যই আছে) তবে সেই আদর্শবাদে হৃদয়ের উপকার হয় না, অপকার ভিন্ন। আমাদের দেশে হৃদয়কে অবজ্ঞা করবার অভ্যাস অতিশয় পুরাতন। শুধু অবজ্ঞা নয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই ব্যবস্থা আছে অতিশৈশবে আমাদের হৃদয়কে ক্ষীণপ্রাণ করবার। শিশুকে আমরা প্রায় কখনোই শিশু হিসাবে বিবেচনা করি না। শিশু যাতে শৈশবে শিশু থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দার্শনিক রুশো দিয়েছেন, পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছে, আমরা পারিনি। শিশুর জগৎ কাঁচের চেয়েও ভঙ্গুর। এই অতিভঙ্গুর জগতের উপর সমাজ ও সংসারের দোর্দণ্ডপ্রতাপেরা এমন বিক্রমে ও নিষ্ঠুরতায় ঘা দিতে থাকে যে জগৎটা ভেঙে খান খান হয়ে যায় অচিরে, আনন্দ ও কল্পনার মূল্যবান

উপকরণগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে এখানে সেখানে। শত শত বছরের বঞ্চনা ও দুর্গতির বোঝা শিশুর দুর্বল হৃদয়ের উপর চেপে বসে—দয়ামায়া না করে। পিতামাতার দুর্বহ দুঃখ সংসারের দুঃসহ বীভৎসতা, চারপাশের মর্মভেদী ক্রন্দন—এইসবের শক্ত বোঝা বইতে গিয়ে সামান্য শিশুর ছোট্ট হৃদয়টি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। হৃদয়ের বাকি জীবনটা কাটে পঙ্গুত্বের ভেতরই। জীবন মানে তখন ক্ষয়রোগীর মত ধুকতে থাকা, ধুকতে ধুকতে অকালমৃত্যুর দিকে এগুতে থাকা, যতটা পারা যায় বিলম্বিত করা অন্তিম মুহূর্তের আগমনকে। হৃদয়হীন সংসার হৃদ্‌রোগের খোঁজও করে না। অথচ হৃদ্‌রোগই আসল রোগ, ব্যক্তির জীবনে যেমন সমাজের জীবনেও তেমনি। সংসারে যাদের অনেক আছে তাদের সন্তানেরা আদর-যত্ন যথেষ্ট পায়, দেহের খাদ্য পায় প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু সেখানেও শিশুর শৈশব মারা যায় শৈশবেই, দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্কদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার চাপে সেখানেও শিশু তার সারল্যকে রক্ষা করতে পারছে না কোনমতেই। বাস্তুহারা শিশু আশ্রয় খুঁজছে বয়স্কদের স্বাস্থ্যহীন জগতে।

ফলে প্রায় কোন শিশুই শিশু থাকে না শৈশবে; বয়স্ক মানুষের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সংস্করণ হয়ে ওঠে, প্রাপ্তবয়স্কের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা, ঘৃণা ও ভয় তার ভেতরটাকে লোলচর্ম বৃদ্ধে পরিণত করে। বয়স যখন বাড়ে তখন এই নিরীহ ও অপমানিত শৈশব স্বভাবতই বড় রকমের প্রতিশোধ নেয়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের জীবনের নানান জায়গায় হানা দিয়ে সে যখন তখন যা তা উৎপাত উপদ্রবের সৃষ্টি করে। এই জন্যই বয়স্ক শিশুর এত বেশী প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে। যতই চেষ্টা করুক শিক্ষাব্যবস্থা কিছুতেই পরিণত, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তৈরী করে উঠতে পারে না। গলদ থেকে যায় একেবারে গোড়াতেই। নাজুক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তির উপর উচ্চ-শিক্ষার যে নিতান্ত নড়বড়ে ব্যবস্থাটি আমরা গড়ে তুলেছি তা খুব একটা কাজে লাগে না; তার চেয়েও বড় কথা সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার সব মহল ঘুরে এসেও প্রাণের খোঁজ পাওয়া যায় না।

বয়ঃপ্রাপ্তির পরও আমাদের শৈশব অক্ষুণ্ণ থাকবার আরো একটি প্রমাণ আছে, আছে স্বর্গকে পেছনে দেখার রোগের মধ্যে। শিশু যেমন বার বার খেলা ফেলে কেঁদে ওঠে, কারণে-অকারণে আমরাও তেমনি ফিরে ফিরে যেতে চাই অতীতের স্বর্গে, শুধু যেতে চাই না একে অপরকে জোর প্ররোচনা দিই যাবার জন্য সেই গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা মাছের

পশ্চাদ্‌স্বর্গে। আমরা ঐতিহ্যের বড়াই করি, জাত্যাভিমানের বড় বড় ধ্বনি তুলি, আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করি। স্বর্গকে যদি দেখতেই হয় তবে দেখতে হবে সামনে, সেই স্বর্গকে যে-স্বর্গ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না, যাকে তৈরী করে নিতে হয় স্বকীয় শ্রম ও স্বেদের বিনিময়ে।

আমরা ভাবছি আমাদের অভাব নেই হৃদয়ের, তাই হৃদয়ের অভাব আমাদের ঘুচতে চায় না। তাছাড়া হৃদয় যেটুকু আছে সেটুকুও যেহেতু অপরিশীলিত ও রুগ্ন তাই হৃদয়ের শিক্ষা প্রয়োজন বিশেষভাবে। আমরা কথায় বলি 'বিদ্যাবুদ্ধি', বুদ্ধির বিদ্যাতো দরকারই, তার চেয়েও বেশী দরকার আমাদের হৃদয়ের বিদ্যা। এই বিদ্যা দানের জন্য যোগ্য শিক্ষক চাই।

একাত্তুরের গণহত্যা যখন চলছিল প্রবল বিক্রমে তখন পাঞ্জাবী দস্যুদের সমর্থক লোকদের বলতে শুনেছি শিক্ষকরাই নাকি আসল শয়তান, তারাই ভুল পথে চালিয়েছে ছাত্রদের, ভুল পথে অর্থ যথার্থ পথে। তাঁরা বলেছেন, বিজ্ঞানের শিক্ষকদের উপর তত রাগ নেই সামরিক কর্তৃপক্ষের, যত আছে কলাশাস্ত্রের শিক্ষকদের উপর। কেননা কলাবিভাগীয় শিক্ষকরা হট্টগোল করে বেশী, বড় বড় কথার তারাই প্রধান সওদাগর। অর্থাৎ কিনা তাঁরা বিবেকের কথা বলেন, তাঁরা পরিচর্যা করেন সংবেদনশীল হৃদয়ের। যদিও নিরীহ তাঁরা আপাত, জাগতিক-বিচারে-অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের পঠন-পাঠনে লিপ্ত, তবু তাঁরাই, ঐ বাহুল্যেরাই, ভীষণ শত্রু ভেতরে ভেতরে। এই কথাটা কোন একজন মানুষের কথা নয়, এটা সব অত্যাচারী মানুষের ভয়ের কথা—আসলে।

কিন্তু শিক্ষকদের ঢালাই প্রশংসা খুবই অযথার্থ। শিক্ষকদের ভেতর দুষ্টবুদ্ধির লোকের অভাব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে যত তাঁবেদার ছিলেন শতকরা হিসাবে অন্য কোন ব্যবসায় কি পেশায় তত ছিল না বলেই মনে হয়। শিক্ষকরা ভুল তথ্য শিখিয়েছেন বিদ্যালয়ে, শান্তি কমিটিতে নাম লিখিয়েছেন বিদ্যালয়ের বাইরে। যাঁরা তাঁবেদার ছিলেন না তাঁরাও ভীত ছিলেন ভীষণভাবে। নিজেদের বিবেককে নিয়ে যাঁরা ভীত-বিহ্বল বিবেকের শিক্ষক হিসাবে তাঁরা অবশ্যই ব্যর্থ।

ব্যর্থতার একটা কারণ নিরাপত্তাবোধের অভাব। অন্য কারণ আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। তাঁদের অভাব যত তার চেয়ে বেশী অভাববোধ। লোকের আস্থা নেই তাঁদের শিক্ষার প্রতি; তাঁরা শিক্ষা দেন সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা, বাইরে দেখা যায় অসৎপন্থীদের জয়জয়কার। তাঁদের নিজেদেরও

আস্থা নেই নিজেদের উপর। এমন কি যে ত্রুটিবহুল শিক্ষা তাঁরা প্রদান করেন সেই শিক্ষাব্যবস্থাতেও তাঁদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নেই। শিক্ষককে তাই তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসনে। শুধু শিক্ষাব্যবস্থাতে নয়, সমাজব্যবস্থাতেও। আমাদের সমাজে নেতৃত্ব ও মর্যাদা কাদের? আর যাদেরই হোক শিক্ষকদের নয়। শিক্ষককে সামাজিক নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসনে আনা আবশ্যক আজ বিশেষভাবে।

শিক্ষা তো শুধু বিদ্যালয়ের ব্যাপার নয়, ব্যাপার পরিবার ও সমাজেরও। সমাজই শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে সবকিছুকে। শিক্ষক যখন পড়াতে বাধ্য হন যে, রাজনীতি মহাপাপ, তখন দেখা যায় যে সমাজে কল্যাণকর পরিবর্তন যা আসছে তা ঐ মহাপাপের পথ ধরেই। শিক্ষা ও সমাজের মাঝখানে এই রকমের ফাঁক থাকলে সেই ফাঁকে শিক্ষাদানের সদুদ্দেশ্য তলিয়ে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে আবার এও সত্য যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য সমাজের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া আবশ্যক। সমাজ যদি মানুষে মানুষে অসাম্য শেখায় তাহলে বিদ্যালয়ে সাম্যের শিক্ষা পত্তনের আগে প্রয়োজন হবে সামাজিক কুশিক্ষার দুষ্ট চারা উপড়ে ফেলা। এটা একটা অতিরিক্ত কর্তব্য। চারুকলা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে একবার তাঁর দায়িত্বের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, ছাত্রদের আঁকতে শেখানোর আগে তাঁর কাজ হয় যে-ভুল আঁকা তারা বাইরে থেকে শিখেছে সেটা ভুলতে শেখানো। এই দায়িত্বটা সকল শিক্ষকেরই। সমাজ প্রতিনিয়ত ভুল শিক্ষা দিচ্ছে, বিশেষ করে হৃদয়কে—শিক্ষা দিচ্ছে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, ভীতি।

আমরা বলি শিক্ষকরা আদর্শ নাগরিক তৈরী করবেন। কথাটার তাৎপর্য বিবেচনা করে দেখবার মত। আদর্শ নাগরিক বলতে আমরা বুঝি যোগ্য, দক্ষ, প্রশংসাভাজন মানুষ। অর্থাৎ কিনা এমন মানুষ যার সঙ্গে সমাজের কোন বিরোধ বাধবে না, সমাজের ব্যবস্থাটাকে যে মেনে নেবে, মেনে নিয়ে খারাপ স্কুলের ভালো ছাত্রের মত দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে। তাই একথা বলা দরকার যে এটা পর্যাপ্ত নয়। আমরা শুধু আদর্শ নাগরিক চাই না, চাই উপযুক্ত মানুষও। (মানুষ কথাটা বাঙলায় খুব চালু। আমরা বলি ভালো মানুষ, ছেলে মানুষ, বড় মানুষ, মেয়ে মানুষ। মানুষ মানুষ বলার এই হাঁকডাকে বোঝা যায় মানুষের বড়ই অভাব এই দেশে। যখন

বলি কাজের মানুষ—অর্থাৎ গৃহভৃত্য—তখন কাজের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় না, পায় না শ্রমের তথাকথিত মর্যাদায় মর্যাদাবান হবার লোভ। একথা তর্কাতীত যে আমরা শ্রমবিমুখ। **Result** ও **fruit**-এর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না ; দুটোই ফল, আপন স্বভাবে ফলেছে তারা, এখন আমাদের দায়িত্ব শুধু নীচ থেকে সত্বর কুড়িয়ে নেয়া।) মানুষের অভাব বলেই শুধু নাগরিক দিয়ে কাজ হবে না। এমন মানুষ চাই যার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সুশিক্ষা ঘটেছে হৃদয়ের, যার জ্ঞান আছে আর আছে প্রয়োজন হলে সাহস—একা দাঁড়াবার।

মস্তিষ্কের কথা, বুদ্ধির কথা অনেক শোনা গেছে, আরো শোনা যাবে, যাবেই ; সেই জন্যই অবহেলিত ও অশিক্ষায় জর্জরিত হৃদয়ের কথা বলতে হবে, জোর দিয়ে।

পরিশিষ্ট ঃ

হৃদয়ের শিক্ষা যে সত্যি সত্যি কী কঠিন তার প্রমাণ যত্রতত্র মিলবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লেখক বাঙলা সাহিত্যে অনেক নেই, হৃদয়কে শিক্ষিত করবার মত উপাদান তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

"লেখকের কথা"য় লিখেছেন মানিক, "এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরানো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সাহিত্য বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক হলে, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিংস্র মানুষের হাতে মারণাস্ত্রই তুলে দেবেন।" বুদ্ধি ও হৃদয় যে পরস্পর পরিপূরক, অসম্পূর্ণ যে তারা একে বাদ দিয়ে অপরকে—সেই সত্য অবজ্ঞাত হয়নি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে তথা রচনাবলীতে। কিন্তু মানিক আরো বলেছেন, "লেখক কে? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান।" এখানে বোঝা যায় ভাবালু হয়ে উঠেছেন, লেখককে যে দেখছেন পিতা হিসাবে, গুরু হিসাবে সেই দেখায় প্রশ্রয় পাচ্ছে সামন্তবাদী শিক্ষা, বলা যায় কুসংস্কার ; যে লেখক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন তাঁর হৃদয়ও সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি সামন্তবাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা থেকে। এ শিক্ষা না-কাটলে নতুন শিক্ষা আসে না।

আমার বন্ধুদের কয়েকজন

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল গিয়াসউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের অধ্যাপক। অনেক আগে থেকে বন্ধু, সেই স্কুল থেকে। খুব স্পষ্ট মনে আছে পার্টিশনের পর ঢাকায় এসে কোনমতে ভর্তি হয়েছি সেন্ট গ্রেগরীস স্কুলে, ভীষণ সঙ্কোচের সঙ্গে একেবারে পেছনের বেঞ্চে এক কোণায় বসেছি প্রায় গা-ঢাকা দিয়ে। প্রথম ঘন্টাতেই পাদ্রী আমেরিকান সাহেব এলেন ইংরেজী পড়াতে। সেই পড়ানোর সময় প্রথম সারিতে একেবারে শিক্ষকের টেবিলের সঙ্গের জায়গাটাতে অনেক বইয়ের একটা সমাবেশ নিয়ে বসেছে যে ছাত্রটি, তার সঙ্গে শিক্ষক ব্রাদার লরেঞ্জোর কথা চলছে থেকে থেকে। **The Cloister and the Hearth** পাঠ্য ছিল, সেই উপন্যাসের নায়ক জেরাল্ড কি করে দরজা দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছিল সেটা পড়াবার সময় ব্রাদার লরেঞ্জো বললেন, 'দরজা'। দেখি সেই ছেলেটি, গিয়াসউদ্দীন, উঠে দাঁড়িয়েছে, বলছে, 'ব্রাদার, ওটি দরজা নয়, দরওয়াজা'। আমেরিকান শিক্ষক তো বটেই, আমি, এবং ক্লাসের প্রায় সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলাম। দরজাকে দরজা জেনে নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে যে দরওয়াজা আসলে তা তো জানি নি। একটা হৈ হৈ উঠল ক্লাসে, এবং বলাবাহুল্য দরওয়াজা গ্রাহ্য হল না মোটেই, সে প্রায় দৌড়ে পালাল, দরজাই বহাল হয়ে রইল, যেমন আগে ছিল।

আমি অনেক কথা ভুলে গেছি স্কুলের, কিন্তু তাড়া-খাওয়ার দরওয়াজাকে মনে আছে আমার, গিয়াসউদ্দীনের কারণে। জোর গলায় কথা বলত গিয়াসউদ্দীন, প্রয়োজন হলে একলা উঠে দাঁড়াত, প্রয়োজন হলে ভোটে হারত। স্কুল পার হয়ে কলেজে এলাম, কলেজ পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। গিয়াসউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে চলল, চলল গিয়াসউদ্দীনের গলা। আমরা বলতাম **RCA sound system**। তারও একটা ইতিহাস আছে। আমাদের ঐ ক্লাসেরই এক ছাত্রের পারিবারিক মালিকানায় নতুন সিনেমা হল হচ্ছিল ঢাকায়, নাগরমহল যার নাম। সে বলত নতুন সাউণ্ড সিস্টেম থাকবে

তাদের হলে, RCA sound system। আমরা দেখলাম এই নামই উপযুক্ত নাম গিয়াসউদ্দীনের। কেউ কেউ বলত the Voice।

সেই Voice কোনদিন থামেনি। স্কুলে নয়, কলেজে নয়, নয় সাবসিডিয়ারি ক্লাসে। গিয়াস ইতিহাসে ভর্তি হয়েছিল, আমি ইংরেজীতে। কিন্তু একই সাবসিডিয়ারি ছিল আমাদের। সাবসিডিয়ারি ক্লাসে শুনতাম সেই পুরাতন গলা, পরিচিত গলা, গিয়াসউদ্দীনের গলা, বাজছে সমানে, যেমন বাজত স্কুলে, কলেজে। পলিটিক্যাল সায়েন্সে মিঃ জুবেরি ছিলেন একজন অধ্যাপক, তিনি ক্লাসে এসে গিয়াসকে না দেখলে বলতেন 'Where is my friend Ghyas?'। গিয়াসকে উচ্চারণ করতেন 'গায়য়াস' বলে। আমরাও সেই নামে ডাকতাম কখনো। কখনো বলতাম গাইসব্রেক্ট, সেই স্কুলে-পড়া ইংরেজী উপন্যাসের চরিত্রের নাম দিয়ে। তারপর সহকর্মী হয়েছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানেও দেখেছি ক্লাবে, সভায়, সমিতির বৈঠকে উঠে দাঁড়াচ্ছে গিয়াসউদ্দীন, একলা, নির্ভয়, যা সত্য জানে বলছে। আমরা কথা বলি, অনেক সময়ে, প্রায় সময়ে, অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে, গিয়াসউদ্দীন বলতো যাকে সত্য বলে মনে করত তার দিকে তাকিয়ে। ঐখানেই তফাৎ। নইলে গলার জোর আরো অনেকের ছিল, কিন্তু বক্তব্যের জোর গিয়াসউদ্দীনের মধ্যে যত দেখেছি, তত খুব কম দেখেছি আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে।

জয়নুল আবেদিনের মধ্যে দেখেছি পরে, যিনি বয়সে বড় ছিলেন, কিন্তু বন্ধু ছিলেন আমার। যিনি স্বাধীনতার জন্য সব কিছু দেব— ছোট্ট করে বলেছিলেন একদিন আমায়, সেই ভীষণ অন্ধকারের দিনে, বলে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য, যিনি স্বাধীনতার ফলশ্রুতি দেখবার জন্য স্বাধীনতার পর অনেক দিন বেঁচে থাকেননি, যিনি অনবরত ভাবতেন দেশের কথা, যিনি হৃদয়বান ছিলেন, গিয়াসউদ্দীনের মতই। আমি গিয়াউদ্দীনের হৃদয় দেখেছি হানাদারদের গণহত্যার দিনগুলোতে। আমরা নিজেদের নিয়ে বিব্রত ছিলাম, গিয়াসউদ্দীন বিব্রত ছিল নিহত শিক্ষক কর্মচারীদের পরিবার নিয়ে। কাকে কি ভাবে সাহায্য করা যায় সেই কথা ভাবত। আমি যে নিরাপদে নেই সেই কথাটা গিয়াসউদ্দীন আমাকে বলেছে, কিন্তু নিজেই কথাটা ভাবেনি। ভাবেনি বলেই একবার হানাদাররা তাকে ধরে নিয়ে যেতে পেরেছিল। পরের বার নিয়ে গেল আল-বদরেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

ছিল সেই দলে। নিয়ে গেল কিন্তু আর ফেরত দিল না। স্কুলে থাকতে স্কাউট ছিল গিয়াসউদ্দীন, 'প্রস্তুত থেকো' শ্লোগান আঁটা দেখেছি তার কাঁধে; অন্যের জন্য প্রস্তুত ছিল সে, অন্যকে সাহায্য করবার জন্য, ছিল না নিজের জন্য।

কিন্তু গিয়াসউদ্দীন নিষ্ঠুরও ছিল। সত্য বলত এবং এইজন্য তাকে ভয় পেতাম। আমাদের মতামত আগে থেকে জানা থাকত আমাদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে, আমাদের মতামত পূর্বনির্ধারিত ছিল। গিয়াসউদ্দীনের ছিল না, গিয়াসউদ্দীন প্রত্যেকটা প্রশ্নকে যুক্তির আলো দিয়ে বিচার করতে চাইত। একাত্তুরের মার্চে বৃটিশ হাই কমিশনারের কাছে প্রতিবাদ করতে গেছেন শিক্ষকরা। পাকিস্তানী উড়োজাহাজ বাংলাদেশে আসার পথে তেল নিচ্ছে ইংরেজদের আয়ত্তাধীন একটা দ্বীপ থেকে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তরুণ ইংরেজ কর্মচারী বললেন 'না, তেল দেওয়া হচ্ছে না।' আরো বললেন, 'আমরা পাকিস্তানের ইন্টারনাল ম্যাটারে নাক গলাতে যাব না কিছুতেই। 'কিন্তু', গিয়াসউদ্দীন বলল, 'পাকিস্তান যদি বলে তোমরা তেল সরবরাহ করতে সম্মত না-হয়ে পাকিস্তানের ইন্টারন্যাল ম্যাটারে হস্তক্ষেপ করছ, তবে?' শুনে অফিসারটি কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল, যেমন আমরা প্রায়ই যেতাম। আমাদের মাথায় ঐ প্রশ্নটা আসত না কিছুতেই, যেটা গিয়াসউদ্দীনের মাথায় এসেছিল। এলেও আমরা চেপে যেতাম, ভয় পেতাম, কথাটা বলে দিলে অফিসারটি যদি বলে বসে, হ্যাঁ, তাই তো, ঠিক কথা তো, এটা জানানো দরকার হাই কমিশনারকে। আমরা ভীত থাকতাম, সর্বদাই ভয় পেতাম, গিয়াস-উদ্দীন পেত না, সে নির্ভয় ছিল। সেই জন্যই মুক্তি-সংগ্রামের দিন-গুলোতে আমরা যখন পরস্পর আশা দিতাম পরস্পরকে, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির উৎসাহবর্ধক চিত্র তৈরী করতাম পরস্পরের জন্য, তখন গিয়াসউদ্দীন যদি এসে পড়ত কখনো তবে আমরা চুপ করে যেতাম, নিজেদেরকে মনে হত যেন একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। চুপ করতে হত কেননা গিয়াউদ্দীন যদি শুনত আলোচনা তবে হয়ত জিজ্ঞাসা করত আমাদের সংবাদের ভিত্তি কি, হয়ত তার জিজ্ঞাসায় আসল সত্যের কঙ্কালটা হৈ হৈ করে বেরিয়ে আসত আমাদের অনেক যত্নে-সাজানো চিত্রের ভেতর থেকে। বাংলাদেশের মুক্তির ব্যাপারে গিয়াসের আগ্রহ আমাদের চেয়ে কম ছিল না, কিন্তু গিয়াস আমাদের মত

ছেলেমানুষ ছিল না। এক সঙ্গে পড়েছি, তবু এই কারণে গিয়াসউদ্দীনকে অনেক বড় মনে হত আমার চেয়ে। সব সময়ে।

একবার দেখা হয়েছিল লণ্ডন শহরে। শীত তখন পড়েই গেছে বলা যায়। দেখি গায়ে সাদা ফ্ল্যানেলের পাজামা-পাঞ্জাবী পরে তার উপর গরাদের চাদর চাপিয়ে দিব্যি হেঁটে চলেছে আমাদের গিয়াসউদ্দীন। আমি নিশ্চিন্ত হলাম গিয়াসউদ্দীন পাল্টায়নি।

আমি সকল সময়েই নিশ্চিন্ত ছিলাম গিয়াসউদ্দীন পাল্টাবে না। নিশ্চিন্ত ছিলাম গিয়াউদ্দীনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমার মধ্যে নেই। দরজাকে দরওয়াজা বলে জানলে আমরা বড় জোর পেছনের বেঞ্চে বসে ফিসফিস করে আলাপ করি। একেবারে সামনের বেঞ্চে বসে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করিনা।

সেই জন্যই গিয়াসউদ্দীন চলে গেল। আমরা রইলাম।

২

জোরে জোরে কথা বলতেন রাশীদুল হাসান। তাঁর সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয় আমার ১৯৬৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে, তখন কথার তুবড়ি ছুটছিল শুনতে পাচ্ছিলাম, সরকারের মুখ থেকে। উন্নতির কথা, মহান দশকের কথা। রাশীদুল হাসান ক্ষুব্ধ হতেন সেই সব কথা শুনে শুনে এবং ক্ষোভের কথাটা স্পষ্ট করে জোরে জোরে বলতেন। তারপর দেখতে দেখতে অন্য এক শব্দ এল দেশে, প্রথমে ধীরে ধীরে, প্রায় অলক্ষ্যে, তারপর বাড়ল সেই শব্দ, ধীরে ধীরেই বাড়ল তারপর হঠাৎ এক সময়ে অতিপ্রচণ্ড হয়ে উঠল সেই শব্দ। প্রতিবাদের শব্দ, শব্দ প্রতিরোধের, বিক্ষোভের।

সেই শব্দের মধ্যে রাশীদুল হাসানের সঙ্গে আমার পরিচয়। অল্প কিছুদিনের পরিচয়, তবু মনে হয়েছে দীর্ঘকালের। আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন কিছু, অভিজ্ঞতা ছিল বেশী, মাদ্রাসায় পড়েছেন জীবনের শুরুতে, ইংরেজী সাহিত্য পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর সময়ের এবং তাঁর আগের কালের, কারো কারো মধ্যে শিক্ষার এই বিরোধ দেখেছি আমি। মাদ্রাসা থেকে এসেছেন, পরে শিক্ষা পেয়েছেন অত্যাধুনিক। তাঁদের আচার-আচরণে কথায়-বার্তায় পছন্দ-অপছন্দে সাহেব-সুবোর ভাব দেখেছি, কিন্তু ভেতরে কোন এক অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থেকেছে একজন গোঁড়া সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ, যে সুযোগ পেলেই মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে, মুখ বাড়িয়ে প্রকাশ করেছে তার অন্ধকারকে, কুসংস্কারকে। রাশীদুল হাসান আগে

কেমন ছিলেন জানি না, যখন আমার সঙ্গে পরিচয়, দেখেছি পুরাতন শিক্ষার ছাপ মুছে গেছে তাঁর উপর থেকে। তিনি দুই কৃত্রিমতার মাঝখানে পড়েননি, নিজের যত্নে বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর এক ভালবাসা দিয়ে একটা সুসংহত জীবন গড়ে তুলেছেন।

সেই যখন ঝড় উঠল উনসত্তুরে, তখন রাশীদুল হাসান দৈনিক সংবাদপত্র জমিয়ে রাখা শুরু করলেন। বললেন, বাঁধিয়ে রাখবেন, নাম দেবেন 'একটি মহাজাগরণ।'

মহাজাগরণের কাগজ জমে উঠেছিল তাঁর ঘরে, মহাজাগরণের বিক্ষোভ জমে উঠেছিল তাঁর মনে। কিন্তু শুধু কাগজ জমাননি, সেই সময়ে কবিতা লিখেছেন রাশীদুল হাসান। 'কালরাত্রে ঘুম হচ্ছিল না, একটা কবিতা লিখেছি। শুনবেন?' আমি শুনেছি। আর যখন কবিতা পড়েছেন তিনি, আমি দেখেছি তাঁর কবিতায় অবগুন্ঠন নেই, অন্তরাল নেই কোন প্রকারের। কবিতার ভাব এমন উদার, প্রকাশ এমন অকৃপণ যে আমি অস্বস্তি বোধ করেছি। মনে হয়েছে যে, যে-আমি জটিলতায়-কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত সে হঠাৎ যেন অনুভব উপলব্ধির একটা অকৃপণ অবারণ জগতের মধ্যে প্রবেশ করেছি, যে-জগতের রীতি-নীতিতে আমার অভ্যাস নেই, তার আদব-কায়দা আমি ভুলে গেছি। আমরা লুকাতে, ছাপাতে, ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত; আমরা আন্তরিক হতে ভয় পাই। রাশীদুল হাসান পাননি। নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে ধারণার সঙ্গে তিনি অনায়াসে এক হয়ে যেতেন, কোন ফাঁক বা ফাঁকি থাকত না দুয়ের মধ্যে।

যখন দুর্যোগ এসেছিল বাংলাদেশের জীবনে, তখন তাঁর ভীষণ ভয়াবহতার মধ্যেও দেখেছি তিনি আশা হারাননি। স্বাধীনতা আসছে, আসবে—একথায় অটুট বিশ্বাস রাখতেন। বিদেশী বেতারে যে-খবর আমিও শুনেছি, ঠিক সেই খবরই যখন দ্বিতীয় বার শুনেছি তাঁর মুখে, দেখেছি খবরটা বদলে গেছে তাঁর বিশ্বাসের কারণে, তাঁর প্রত্যয়ের মিশ্রণে। অথবা মুক্তিবাহিনীর যে দুঃসাহসিক কর্মের কথা শুনেছি কিন্তু যাকে বিশ্বাস করতে সাহস করিনি, তার কথা তিনি যখন বলেছেন, মনে হয়েছে, না, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

'মানুষের মনুষ্যত্বের উপর আস্থা হারাচ্ছি'—এই রকমের কথাও বলেছেন রাশীদুল হাসান, একই প্রত্যয়ের সঙ্গে। 'আমি হারাইনি'—পরিহাসচ্ছলে বলেছি হয়ত।' 'কেন? কেন?'—জিজ্ঞেস করেছেন;

যেন গোপন কোন সত্য আছে আমার কাছে। 'আপনাকে দেখে'-- আমি বলেছি। 'ও, তাই বলুন, ঠাট্টা করছেন।' বলে হেসেছেন হো হো করে। তা ঠাট্টা কিছু ছিল বটে, পরিহাস করে হাল্কা করেই বলেছি কথাটা। কিন্তু মূল কথাটাই মিথ্যা ছিল না। মানুষের উপর আস্থা আসত রাশীদুল হাসানকে দেখে।

কেউকেটা তিনি ছিলেন না কেউ। অনেক দেরীতে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে। ছাত্র-জীবনে দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছিল পার্টিশনের কারণে, কর্মজীবনে আবার ফিরে গিয়েছিলেন পশ্চিম বঙ্গে। আবার এসেছেন ১৯৬৫-র যুদ্ধের পর। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্ন দেখিনি মনের মধ্যে কোথাও।

দেশ ছেড়ে এসেছিলেন বলে এখানে আশ্রয় ছিল না বলতে গেলে। ২৭শে মার্চের পর আমরা অনেকেই নানান জায়গায় থেকেছি, অন্তত ঐটুকু সুযোগ ছিল, আজ এখানে কাল ওখানে করবার। রাশীদুল হাসানের ঐটুকুও ছিল না। বাইরে থাকবার মত জায়গার অভাব ছিল তাঁর, তাঁকে তাই ফিরে আসতে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই। 'সামান্য মানুষ আমি, আমাকে কেন ধরবে?' তিনি বলতেন। কিন্তু তিনি জানতেন না তিনি অসামান্য ছিলেন বাঙলা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার কারণে। মিলিটারি তাঁকে অসামান্য বলেই জানত। তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল প্রথমে একবার। শক্তিমত্ত ছিল যখন মিলিটারি, তখন তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল, তাদের পরাজয় অত্যাসন্ন, তখন আবার তাঁর খোঁজ পড়ল। আবার তাঁকে নিয়ে গেল। এবার আর তিনি ফিরে এলেন না।

৩

দ্বিতীয় বার যখন গেলেন রাশীদুল হাসান—একা গেলেন না। সঙ্গে গেলেন তাঁর বন্ধু আনোয়ার পাশা। একই ফ্ল্যাটে ছিলেন দুজন। দুজন দুজনকে বোধ করি শেষ বার দেখেন যখন তাঁদেরকে এক সঙ্গে ধরে নিয়ে যায় বাসা থেকে। তারপর নাকি চোখ বেঁধে দিয়েছিল তাঁদের। হয়তো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা—সেই শেষ মুহূর্তে, যখন তাঁদেরকে গুলি করা হয়।

আগেও তাঁরা পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকতেন। একই এলাকার মানুষ, একই কলেজে চাকরি করেছেন। একই সঙ্গে পালিয়েছিলেন ২৭শে মার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছেড়ে একই বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন দুই বন্ধু, একই সঙ্গে ফিরেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই। তারপর একই ফ্ল্যাট থেকে ধরে নিয়ে গেল দুজনকে। শেষ পর্যন্ত একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে দুই বন্ধুর। অভিন্ন যাত্রার যাত্রীদের।

আনোয়ার পাশা ও রাশীদুল হাসানের মধ্যে পার্থক্যও ছিল, যেমন মানুষে-মানুষে সব সময়েই থাকে। একজন বাঙলা সাহিত্য পড়াতেন, অন্যজন ইংরেজী। আনোয়ার পাশা গল্প লিখতেন, তাঁর প্রকাশিত বই ছিল, বইয়ের পরিকল্পনা ছিল, ছিল সাহিত্যিক খ্যাতি। তিনি কথা বলতেন আস্তে আস্তে, উত্তেজিত হতেন কম। কিন্তু দুজনে অভিন্ন ছিলেন বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসায়, মমতায়।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় রাশীদুল হাসানের মাধ্যমে। যেহেতু তিনি লিখতেন, এবং আমি সেই সময় সম্পাদনা করতাম একটি পত্রিকার, তাই আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি একে অপরের। তারপর আমাকে আকর্ষণ করেছে তাঁর আন্তরিকতা। এই অধিকৃত দেশে থাকাটা উচিত তো নয়ই, নিরাপদও নয় মোটেই। এই কথাটা সেই দুঃসময়ে প্রতি-নিয়ত বলতেন। অনেকেই বলতেন, কিন্তু যখন আনোয়ার পাশা বলতেন, সে-কথার অন্য একটা অর্থ থাকত, তাঁর শান্ত অনুত্তেজিত আন্তরিকতার জন্য।

শোনা যাচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সই সংগ্রহের চেষ্টা হবে একটা, হানাদারদের সমর্থনে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সই করে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই, চট্টগ্রামেও। এবার বোধ হয় ঢাকার পালা। ঢাকারই গুরুত্ব বেশী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই হত্যাকাণ্ড হয়েছে সর্বাধিক, তাতে বদনাম হয়েছে বিস্তর। তাই প্রায় নিশ্চিত আশঙ্কা ছিল বিবৃতি হাতে লোক আসবে সামনে। এলে কি করা যাবে কথা হচ্ছিল তাই নিয়ে। 'আমি ভাই দেব না সই'—ছোট্ট করে বলেছেন আনোয়ার পাশা; কিন্তু যেন বলেছেন চূড়ান্ত করে, এমন করে যাতে আমরা চুপ করে গেছি সকলে, যেন মীমাংসা হয়ে গেছে প্রশ্নের। আমরা ভাবছিলাম অন্যভাবে, আমরা ভাবছিলাম কি করে দূরে থাকা যায় সই-সংগ্রাহকদের কাছ থেকে, চোখে না পড়লে যদি বেঁচে যাওয়া যায় কোন-

মতে। আনোয়ার পাশা কাছেই ছিলেন, বাইরে আশ্রয় ছিল না দীর্ঘ দিনের। তিনি ফিরে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে তাঁকে। কিন্তু তিনি মীমাংসা করে ফেলেছেন প্রশ্নের, তিনি সই দেবেন না বিবৃতিতে। উত্তেজিত হলে এক কথা ছিল, মনে করা যেত রাগের মাথায় বলেছেন। কিন্তু কোন উত্তেজনা ছিল না তাঁর কথায়, তিনি শান্তভাবে স্থির করেছেন। জীবন ও মৃত্যুর সেই ভীষণ দোদুল্যমানতার মধ্যে ঐ রকম করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। আনোয়ার পাশার পক্ষে ছিল।

দেশ ছেড়ে যাবার কথা আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। 'গিয়ে আমার ওখানে থাকবেন'—আনোয়ার পাশা বলেছেন; এমনভাবে বলেছেন যে, মনে হয়েছে শুধু সীমান্তটুকু পার হওয়া বাকি, পার হতে পারলে আর কোন সমস্যা নেই, আনোয়ার পাশা আছেন, তাঁদের বাড়ি আছে পশ্চিম বঙ্গে।

কিন্তু এই বাংলাদেশে আমরা তো তাঁদেরকে আশ্রয় দিতে পারিনি, না আনোয়ার পাশাকে, না রাশীদুল হাসানকে, যাঁরা পশ্চিম বঙ্গ থেকে এসেছিলেন। আসলে আমরাও নিরাশ্রয় ছিলাম, আমরা প্রত্যেকেই, এমনকি হানাদারদের দোসরেরাও। শুনেছি দালাল মন্ত্রীদের একজনের পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল আনোয়ার পাশার বাসাতে—ঠিক সেই সময়টিতেই যখন আনোয়ার পাশা ও রাশীদুল হাসানকে ধরে নিয়ে যায় আল-বদরের লোকেরা। যখন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে আমাদের আশ্রয় জুটবে বাংলাদেশেই, তখন ঠিক সেই সময়েই উদ্বাস্তু আনোয়ার পাশা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে।

আশ্রয় তো আমরা দিতে পারিনি জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকেও। এই দেশেই জন্মেছিলেন, এই দেশেরই মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু পাকিস্তানের তেইশ বছর নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলেই জেনে এসেছেন। অথচ যখন বিলেতে ছিলেন, তখন চমৎকার সুযোগ ছিল স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে একটি মাত্র সন্তানকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবার। সে-কথা,

তিনি ভেবেছেন কিনা জানি না, আমি ভেবেছি; আমি ভেবেছি যে, আমি যদি তিনি হতাম, তাহলে ১৯৬৫-তে যা দেখেছি, তারপর আর এখানে ফিরে আসতাম না। কিন্তু তিনি এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁর স্ত্রী ফিরে এসেছেন তাঁর স্কুলে। ফিরে এসেছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বে বাঁধা পড়বার জন্য। তাঁর মা থাকতেন কলকাতায়, তিনি বার বার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই পারেননি কলকাতায় গিয়ে মাকে দেখতে, যে মা দ্রুত তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছিলেন।

জ্যোতির্ময় বাবু আমার শিক্ষক ছিলেন, জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় অনেক বড় ছিলেন আমার থেকে, কিন্তু সব দূরত্ব অতি অনায়াসে পার হয়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন আমাদের সঙ্গে, তাঁর সকল ছাত্রের সঙ্গে। আলোচনায়, তর্কে, শুভেচ্ছায় তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন।

জীবনে তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। বস্তুকে, তত্ত্বকে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে চাইতেন। জানতে চাইতেন একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য কোথায়, প্রত্যেকের বিশিষ্টতা কোনখানে এবং তাঁর সঙ্গে তর্ক হত নানা বিষয়ে। অনেক সময় উত্তেজনার বশে তর্কের প্ররোচনায় এমন কথা বলতাম, পরে ঠাণ্ডা মাথায় সে-সব কথায় হয়ত আমি নিজেই আস্থা রাখতাম না। কিন্তু দেখেছি জ্যোতির্ময় বাবু সেইসব কথারও দাম দিতেন। বলতেন, 'শুনেছ, ও বলছে এই কথা, আমি বলছি এই....তোমার কি মত?' যাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, তাঁর সঙ্গে আবার নতুন করে আলোচনা শুরু করতেন বিষয়টি নিয়ে। এই যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা, এই পরমত-সহিষ্ণুতা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। অথচ হৃদয়ের অভাব ছিল না তাঁর মধ্যে। ছিল না বলেই তিনি শিক্ষক হয়েও বন্ধু ছিলেন আমাদের।

ডক্টর আবুল খায়ের আমার বন্ধু ছিলেন বলতে পারব না। কিন্তু নিকটের মানুষ ছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে। যেমন ছিলেন ডাক্তার মোর্তজা।

কিন্তু আমাকে আরো অনেকের কথাই বলতে হত বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের কথা বলতে গিয়ে। সন্তোষ ভট্টাচার্যের কথা। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কথা। মুনীর চৌধুরীর কথা। যাঁরা আমাদের জীবনেরই অংশ ছিলেন। বিশেষ করে মুনীর চৌধুরী, যাঁর বিষয় আমি অন্যত্র লিখেছি।

কিন্তু তাঁরা কেউই লেখার বিষয়বস্তু হবেন এটা আমি ভাবিনি। আমরা কেউই ভাবিনি। তাঁরা জীবনের মত সত্য ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে কল্পনার অবকাশ ছিল না। এই শিক্ষকদের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তার সম্পদ হারিয়েছে, হারিয়েছে তার বৈচিত্র্য। কিন্তু আমরা, আমরা যারা সঙ্গী ছিলাম তাঁদের, তারা সামান্য হয়ে পড়েছি, যতটা সামান্য ছিলাম তার চেয়েও বেশী।

———